শিপ্রা দত্ত

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

প্রকাশক :
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার
ডি. এম লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণি,
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিত কুমার সামুই
বাণীশ্রী-প্রিণ্টার্স
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

খোকা (কল্যাণ),

অনুজ হয়েও মৃত্যুতে অগ্রজ হলি।

তোর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই স্নেহাঞ্জলি অর্পণ করলাম—

"সুতারা, আমি চাকরী ছেড়ে দেবো ভাবছি। আজকের দিনে হাজার হাজার দেশবাসী যখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য স্কুল, কলেজ, কোর্ট, সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে কারাবরণ করছে, তখন সরকারী পদস্থ অফিসারের পদ আঁকড়িয়ে বসে থাকা আমি লজ্জাজনক মনে করি। তাই ভাবছি আমিও পদত্যাগ পত্র দেব। এ বিষয়ে তোমার কি পরামর্শ ?"—জিজ্ঞাসা করলেন সমরবাবু।

"তোমার যুক্তি অকাট্য। আজ যদি কেবলমাত্র আমরা দুজনই হ'তাম, তবে আমি নিজেই ঘৃণিত এই পদ ত্যাগ করতে তোমাকে অনুরোধ করতাম। কিন্তু আজ যে আমাদের পোষ্য অনেক। তোমার ভাগ্নে রবি ও কবি, ভাইপো হিমাংশু, তত্নপরি আমাদের মৃন্ময় ও তন্ময়। এতজনের ভবিষ্যৎ আমাদের অদৃষ্টের সঙ্গে জড়িত। আজ তো নিজেদের খেয়াল খুসী মত বা আদর্শ রক্ষা করবার জন্য এসব নাবালকদের ভাসিয়ে দেওয়া যায় না। এরা যে পরগাছার মত আমাদের আশ্রয় করেই আপন আপন ভাগ্য তৈরী করবার জন্য উদ্যোগী হচ্ছে। এসব অনাথদের কোথায় তুমি ভাসিয়ে দেবে? পিতৃমাতৃহীন রবি ও কবি তো আমাদের ছাড়া কাউকে জানে না। মাতৃহীন হিমাংশুই বা কার মুখাপেক্ষী হবে ? বিশেষ করে তোমার দাদা এখন কর্মশক্তিহীন।

এরা যে সবাই তোমার রক্তের অংশীদার। মৃন্ময় ও তন্ময়ের জন্য তোমার যে কর্ত্তব্য—এদের কারোরই তার চেয়ে কম অধিকার তোমার উপর নেই। হয় তো আজ তুমি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলে। এই আন্দোলন হয়ত বেশীদিন টিকলো না। তারপর সবাই হয়ত তাদের পুরাণো কাজে ফিরে যাবে। কিন্তু তুমি যদি একবার চাকরী

ছাড়ো---তবে তা চিরদিনের মতই ছাড়তে হবে। তাই, যা কিছু করবে, ভাল করে চিন্তা করে করো" উত্তর দিলেন সুতারা।

চিন্তিত মুখে সমরবাবু বল্লেম "তুমি ঠিকই বলেছো, সুতারা। কিন্তু আজকের দিনে জেলা শাসকের পদে বৃটিশ প্রভুর হুকুমে দেশের ছেলেদের উপর অত্যাচার চালানে বা এই ঘৃণ্য কাজের পিছনে মদৎ দেওয়া যে কত পীড়াদায়ক—তা হয়ত তোমরা উপলব্ধি কর'তে পার না। কিন্তু এই চাকরীতে থাকতে হলেই,—আমাকে বৃটিশ সরকারের হুকুম পালন করতেই হবে।"

"তোমার মত কোমল হৃদয়ের ও স্বদেশ প্রেমিকের এই পদ নেওয়াই ভুল হয়েছিল। স্বদেশী ছেলেদের উপর অত্যাচার করতে যে তোমার কত কষ্ট হয়—তা আমি জানি। বিবেকের বিরুদ্ধে যেদিনই কোন কাজ তোমাকে করতে হয় সেইদিনই রাত্রে তোমার ঘুম হয় না। তুমি বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে অথবা পায়চারী করে রাত কাটাও তা আমি জানি।"

"আজ বার বার মনে হচ্ছে পরাধীন চাকরী করবার মনোবৃত্তি আমার নয়—তবু এ ভুল পথে যখন পা দিয়েছি—জীবন মধ্যাহ্নে সে পথ হ'তে ফিরে যাবার পথ আর নেই। কিন্তু এমনি হতভাগ্য আমার যে মৃন্ময় ও রবি স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ছে। এরা অহিংস পথে যাচ্ছে না। যোগ দিয়েছে টেরোরিষ্ট পার্টিতে। একদিন নিজের সন্তান ও ভাগ্নের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়ত আমাকেই হ'তে হবে। তাই ভাবছি ওদের দুজনকে দেশের এই বিদ্রোহের আগুন থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য অন্য কোন দূর দেশে পাঠিয়ে দেবো।"

"এই বিদ্রোহের বহ্নি শিখা তো প্রাত দেশে দেশেই দেখা দিয়েছে। এই সন্ত্রাসবাদী দল থেকে কোথায় তুমি এদের আড়াল করে রাখবে? চোখের সামনে রয়েছে তবু দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছে দেখছি। অভিভাবকহীন ভাবে বিদেশে পাঠালে তারা

তো আরও অবাধ স্বাধীনতা পাবে। যেটুকু শাসন এখানে আছে—অন্যত্র তো তাও থাকবে না। হয়'ত পরিণামে বেচারীদের অদৃষ্টে নিগ্রহ আরও বাড়বে।"

"কিন্তু এখানে থেকে তারা যদি স্বদেশী দলে থাকে—তবে আমাকেই যে তাদের উপর পীড়ন চালাতে হবে। তাই সুতারা, আমাকে দূরে এদের সরিয়ে দিতেই হবে।

শুনেছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেব বিশ্বভারতীর আদর্শ আমাদের প্রাচীন গুরুগৃহের আদর্শ অনুকরণে। হয়ত সেই সুন্দর পরিবেশ, কবিগুরুর সান্নিধ্য এদের মনের গতি ফিবিয়ে দিতে পারে। এদের এই কৈশোব মনে তেমন কিছু গভীর ভাবে রেখাপাত করতে পারে না। এরা জল বুদ্বুদের মতই জলের উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে যায়। তাই পবিবেশের প্রভাবে হয়ত এদের মনের কোমল বৃত্তিগুলি নূতন ভাবে ফুটে উঠবে। স্বাদেশিকতার এই হানাহানি, মারামারির প্রভাবকে উত্তীর্ণ করে কবি মানসের স্পর্শ হয়ত মনের পরতে পরতে নূতন ভাবধারার ছায়াপাত করবে। তারা এক নূতন পথের সন্ধান পাবে। আনন্দের ঝর্ণা ধারায় তারা নূতনের ইঙ্গিত দেখবে, দেশে আনবে নূতনের ইসাবা, নব আদর্শ, কৃষ্টি, সংস্কৃতির করবে সমন্বয়। গুরুদেবের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। তাই আমার মনে হয়—মৃন্ময় ও রবিকে গুরুদেবের শান্তিনিকেতনে পাঠালে ভাল হবে।"

"কবি গুরুর এই আশ্রমের জনপ্রিয়তা ও আদর্শেব কথা এখন পত্রিকাতেও পড়ি। সেই ভাল। আশ্রমের আর দশটি ছাত্র ও আশ্রমিক শিক্ষকদের প্রভাবে হয়ত এরা ভুলে যাবে এখানকাব অগ্নি মন্ত্রের দীক্ষা। আমরাও নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারবো।"

"দেশের অবস্থা ক্রমেই যে রকম জটিল হয়ে উঠছে, গান্ধীজির অহিংসা সংগ্রাম বোধ হয় ব্যর্থ হবে। দেশের একদলের অহিংস সংগ্রামে আস্থা নেই। তাই গান্ধীজি সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখার ফরমান জারি করার পর বিক্ষুব্ধ একদল যুবক অহিংস পথ হতে সরে

দাঁড়িয়েছে। তাদের মত ও পথ ভিন্ন। তারা জীবন পণ করে সত্যাগ্রহ নেবে ছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার যুব সম্প্রদায়ের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। পরন্তু তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দ্বিগুণ, উৎসাহ, উদ্দীপনা। তাই এরা বেছে নিয়েছে সন্ত্রাসের পথ।

কোন দেশের স্বাধীনতা ভিক্ষা করে বা অহিংস পথে আসেনি। আসতে পারে না—এই এদের অভিমত। তাই আজ দিকে দিকে সন্ত্রাসবাদী দলের সাজ সাজ রব শোনা যাচ্ছে। এই দলে গিয়ে যদি মৃন্ময় বা রবি পড়ে, তবে আমি ওদের কোন প্রকারেই রক্ষা করতে পারবো না। পরন্তু এদের এই বিদ্রোহের অপরাধে আমার চাকরীটাও যাবে।"

খানিকক্ষণ মৌন থেকে সমরবাবু বল্লেন "অবশ্য চাকরীটা গেলে একদিকে ভালই হবে। এভাবে দেশের ছেলেদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তরায় না হয়ে—আমার চাকরীটা গেলে ভালই হয়। স্বাধীন কোন একটা কাজ করবো, যাতে থাকবে না কোন বাধা বাধ্যকতা। স্বাধীন মন নিয়ে, স্বাধীন চিন্তা নিয়ে স্বাভাবিক মানুষের মত বাঁচতে পারবো। কিন্তু আজ আমার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন কোন প্রভুর নির্দ্দেশ মত পরিচালিত হচ্ছে। তাই স্বেচ্ছায় কোথাও একটি পদক্ষেপ ফেলার উপায় নেই। নিজের বিবেককে পর্য্যন্ত বিকিয়ে দিতে হয়েছে। বিবেকের বিরুদ্ধে করতে হচ্ছে নিত্যি কত কাজ। যে কাজের প্রতিক্রিয়ায় আমার শান্তি ও নিদ্রা টুটে গেছে। তাই বিবেকের বিরুদ্ধে যেদিন স্বদেশী ছেলেদের উপর অত্যাচার করতে হয়—সেদিন 'ইনসোমিনিয়া' রোগীর মত সারারাত বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়। সুতরাং, তোমরা জান না—আমি নিজের বিবেকের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছি অহোরাত্র। তোমরা যখন গভীর নিদ্রা সুখ ভোগ কর, আমি তখন আকাশের তারা গুণে নানা চিন্তার জাল বুনে রাত্রি কাটাই। এ যে কি কষ্ট—তা কি করে তোমরা বুঝবে?

কিন্তু কর্ত্তব্যের খাতিরে আজ পদত্যাগ করতে পারছি না। তাছাড়া স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে গেলে, হয়ত আমার পিছনেই বৃটিশ সরকারের 'স্পাই' লাগবে। এ যেন 'জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।' নিষ্কৃতি কোন রকমেই নেই। একমাত্র ভগবান সদয় হয়ে তুলে যদি নেন।"

"এ সময় আমিও তোমাব কোন সাহায্য কবতে পারছি না। হয়ত আমি আরও একটু শিক্ষিতা হলে কিছুটা সাহায্য তোমাকে করতে পাবতাম। তোমাব আর্থিক দুশ্চিন্তার হাত হতে কিছুটা সোয়াস্তি পেতে। কিন্তু আমি যে কোন প্রকাবেই তোমাব কোন কাজে আসতে পারলাম না।"

"সে কথা বলছ কেন সুতারা? তোমাব মত সুগৃহিনী কদাচিৎ পাওয়া যায়। তুমি ছিলে বলে পিতৃমাতৃহীন রবি, কবি ও হিমাংশু মার অভাব বোধ করে না। কয়টি মেয়ে এমনভাবে অপরেব সন্তানকে নিজেব সন্তানতুল্য স্নেহ যত্নে মানুষ কবে? যে নিঃস্বার্থ অপত্য স্নেহ এই মাতৃহীনেরা তোমার কাছে পাচ্ছে, এতেই এদের ভবিষ্যৎ সুন্দর ভাবে গড়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে। নতুবা এরা সবাই যে স্রোতেব মুখে আগাছার মত ভেসে যেতো। যেমন যাচ্ছে পাশের বাড়ীব রায় বাহাদুব সীতেশ ব'বুব নাতিরা। মাতৃস্নেহ যে সন্তানের কাছে কি স্বর্গীয় জিনিষ তা অনেকেই বোঝেন না বলেই স্নেহহীন শুষ্ক মরুজীবন বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উগ্র হিংস্র উশৃঙ্খল স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। আমি তোমাব কাছে কৃতজ্ঞ।"

"আমি তো বিশেষ কিছু করিনি। যা অতি স্বাভাবিক তাই করে যাচ্ছি। তুমি কেন এভাবে বলছ? আমি তো আমার কর্ত্তব্য করছি।"

"কিন্তু ঘরে ঘরে যদি সব মেয়েরা এই কর্ত্তব্য পালন করত—তবে বাংলা দেশ সত্যি সত্যিই সোণার বাংলায় পরিণত হতো। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরা তা পারে না বলেই তো সংসারে এত আগুন জ্বলে, ভাইয়ে ভাইয়ে লাঠালাঠি চলে। একটু স্বার্থ ত্যাগ

করলেই যে অপার শান্তি ও সুখ লাভ করা যায়, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আমরা তা ভুলে গিয়ে গৃহে গৃহে দাবাগ্নি জ্বালাই।"

"খেতে চল,বাত বেশী হয়ে গেলে তোমার আবার হজম হবে না।"

"ছেলেরা সব বাসায় ফিরেছে?"

"তোমার ভয়ে তারা তাড়াতাড়িই বাসায় ফেরে। বাসাতেই হয়ত ওদের মজলিশ বসেছে। কবি ও তন্ময় অবশ্য ওদের আসরে সব সময় থাকে না। কবি ভবিষ্যতে তোমার কবিই হবে। রাতদিন বসে বসে সে কেবল কবিতাই লেখে। আর তন্ময় যে কিসে এত তন্ময় হয়ে থাকে জানি না। জানি না ভবিষ্যতে সে কি হতে চায়?"

"আমাদের শাসন এরা এখনও মেনে চলছে। কতদিন এভাবে চলবে তা জানি না। দিন কাল যা হচ্ছে ক্রমশঃ। আমাদের যুগ নেই যে পিতৃমাতৃবাক্যকে গুরুবাক্য মনে করে পালন করবে। ছেলেদের গতিবিধির দিকে তুমি সর্বদা নজর রেখো। আমাকে তো তারা মনে মনে অশ্রদ্ধাই করে বৃটিশের গোলামী করছি বলে। অবশ্য মুখ ফুটে তা প্রকাশ করতে সাহস পায় না বোধ হয়।"

"তুমি ওদের ভুল বুঝেছো। তারা জানে তুমি বিবেকের বিরুদ্ধে একমাত্র কর্ত্তব্যের খাতিরে এ চাকরী করছ। তাই তুমি অন্যান্য জেলা শাসকের মত অত্যাচারী হয়ে আরও উন্নতি করতে পারছ না তোমার পদে। আমি অলক্ষ্যে ওদের এ ধরণের আলাপ আলোচনা শুনেছি। সুতরাং তোমার প্রতি তাদের বা তাদের দলের সবার অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে।

তুমি রাশভারী কড়া জেলা শাসক বলে বাইরে তোমার যে নাম আছে—তারই প্রভাবে এরাও তোমাকে এড়িয়ে চলে। কারণ, তারা জানে কোন রকম অন্যায় তোমার নজরে পড়লে তারা অব্যাহতি পাবে না।"

একটা পোড়ো বাড়ী। চারিদিকে জঙ্গলে ভর্ত্তি। বাড়ীটাও অতি প্রাচীন। জানালা দরজা কিছুই নেই। প্রাচীন বাড়ীর প্রাচীনত্বই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে এর সর্বাঙ্গে। ভদ্রতার শেষ আবরণটুকুও যেন কে কেড়ে নিয়েছে। তাই পোড়ো বাড়ীর নগ্নতা আরও প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। লাল ইটগুলি যেন সমস্ত আব্রু ছিন্ন করে—সবার সামনে নিজেকে তুলে ধরেছে। কোথাও এতটুকু সিমেণ্টের আস্তর অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই ইটের গা ভেদকরে যত্র তত্র অশ্বত্থ গাছের শিকর গজিয়েছে। জঙ্গলী পায়রারা মনের সুখে এই পোড়ো বাড়ীতে নিজেদের নিরাপদ আস্তানা খুঁজে নিয়েছে। অতি প্রাচীন বাড়ী বলেই—আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—সব গাত্রাবরণ ধ্বসে যাওয়া সত্ত্বেও। প্রতিটি কক্ষের উঁচু ছাদ। কোন এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের বাগান বাড়ী নাকি ছিল। লক্ষ্মীর বিমুখতার সঙ্গে বিত্ত যেমন চলে গেছে,—তেমনি ক্ষমতাও আর নেই। তাই যে বাগান বাড়ী একদিন নাচ গানের জলসায় মুখরিত হয়ে থাকতো—সেই বাড়ী আজ পশু পক্ষীর আশ্রয় স্থলে পরিণত হয়েছে। অপদার্থ উত্তর পুরুষের অযোগ্যতায় গৃহের যেমন সংস্কার সম্ভব হয়নি, তেমনি এ বাড়ী বিক্রি করারও ব্যবস্থা হয়নি। কারণ, 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'—শরিকের তো অভাব নেই। তাই আজ প্রাচীনত্ব প্রমাণ করবার জন্য জীর্ণ দেহে লাল ইটের গায়ে স্থানে স্থানে শেওলার প্রলেপ বুলানো রয়েছে। কোথাও কোথাও ভাঙ্গা ইট যেন দাঁত বের করে রয়েছে। অশ্বত্থ গাছের পরগাছা যেন বার্দ্ধক্যের জটাজাল।

সবাই জানে আজ—এটা বাগান বাড়ী। কার বাগান বাড়ী ছিল? কালের স্রোতে সেই নামও যেন নির্মূল হয়ে গেছে। বাগান বলতে যা বুঝায় আজ আর তা নেই। আছে কেবল অতি প্রাচীন আম, জাম, বেল, নারকেল, পেয়ারা ইত্যাদি কিছু ফলের গাছ।

বেশীর ভাগ গাছই গৃহের মতই এত প্রাচীন যে—কোন ফল আর তাতে ফলে না। কেবল কাক ও নানা পাখী নীড় বেঁধেছে তাদের শাখায় শাখায়। তাছাড়া আরও নানা বন্য গাছের আগাছায় বাগান বাড়ীর বাড়ীটি ঢাকা পড়ে গেছে। বাইরের থেকে কেবল ঘন জঙ্গলের দূর্ভেদ্য ভেদ করে দুঃসাহসিক স্বদেশী ছেলের দল ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে সাহস করে না। নানা সাপ ও কীট পতঙ্গের ভয়ে অন্যান্য ছেলেরাও সতর্কতার সঙ্গে এই বাগান বাড়ীর গণ্ডি পরিহার করে চলে। তাছাড়া পোড়ো বাড়ীতে ভূতের বাসা—এমন একটা কিংবদন্তীতেও বাগান বাড়ীর নির্জ্জনতা ভঙ্গ করতে কিশোরদল বা যুবকদল সাহস করে না।

কিন্তু এরূপ নির্জ্জন স্থানই স্বদেশী ছেলেদের কাছে স্বর্গরাজ্য। ভূত প্রেত, বাঘ, ভল্লুক, সাপ খোপ কিছুকেই তারা ভয় পায় না। তাই সবার চোখের অলক্ষ্যে এখানেই চলে তাদের গোপন সভা। এখানেই তারা শঙ্করদাব কাছ থেকে বিদ্রোহের পাঠ নেয়। শোনে স্বাদেশিকতার নানা কথা। লোকালয় হতে বেশ খানিকটা দূরে এই বাগান বাড়ী। তাই এখানে তারা নিশ্চিন্তে অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করে। এখানে চলে তাদের গোপন পরামর্শ, নানা বিদ্রোহ অভিযানের প্রস্তুতি।

সুতারা ও সমরবাবুর আলোচনার কিছুদিন পর, একদিন এই গোপন বৈঠকে এসে বিষণ্ন মুখে মৃন্ময় ও রবি শঙ্করদাকে জানালো পড়বার জন্য তাদের শান্তিনিকেতনে পাঠানো হচ্ছে।

কিশোর বালকদ্বয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সৌম্য মূর্তি শঙ্করদা বল্লেন "তার জন্য অত গোম্‌রা মুখ করেছিস্ কেন? ভালই তো শান্তি-নিকেতনে গুরুদেবের আশ্রমে থেকে পড়বার সুযোগ পাচ্ছিস্। কয়-জনের ভাগ্যে এমন সৌভাগ্য ঘটে? আমায় যদি তোদের বয়সে কেউ শান্তিনিকেতনে পাঠাতেন, আমি তবে খুসী হয়ে সবাইকে চিনেবাদাম খাইয়ে দিতাম! গুরুদেবকে দেখবার সৌভাগ্যও তো কম নয়। সমস্ত বিশ্ব যাঁকে শ্রদ্ধা করে, তাঁরই কোলে যেয়ে তোরা থাকবি। আমাদের

কপাল খারাপ। আমাদের যুগে গুরুদেবের শান্তিনিকেতনও ছিল না। আর যদি বা থাকতো গরীব বাপের ছেলে হয়ে জন্মে ছিলাম। সুতরাং সুযোগ থাকলেও সামর্থ্যে কুলাতো না। তোদের কত সৌভাগ্য জেলা শাসকের পুত্র ও ভাগ্নে হয়ে জন্মেছিস্।"

দলের অন্যতম ছেলে তপন বলে উঠল "ভাগ্য নয়, শঙ্করদা। বলুন দুর্ভার্গ্য। যে বৃটিশ আমাদের পরাধীন করে রেখে আমাদের উপর রাজত্ব করছে, সেই বৃটিশের গোলামী করা কি দুর্ভাগ্য নয়?"

শঙ্করদা ক্রুদ্ধ স্বরে উত্তর দিলেন "ছিঃ, তপন, তোর থেকে আমি এমন কথা আশা করিনি। গৌরব তো নিশ্চয়ই। বৃটিশরা কেবল আমাদের পরাধীনই করেনি, শাসন চক্রের বিশিষ্ট পদগুলিও তাদেরই সমগোত্রদের দ্বারা পূর্ণ করেছে। সমরবাবুর মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভারতীয় মাত্র—সেই সব শাসন পরিচালনায় স্থান পেয়েছেন। এই যোগ্যতার গৌরব কি কম? কোটি কোটি ভারতবাসী আমরা রয়েছি, —কিন্তু চেয়ে দেখ সমরবাবুদের মত কয়জন যোগ্য ব্যক্তি বৃটিশদের মত সমযোগ্যতা নিয়ে তাদের পাশে একই আসনে বসবার সম্মান পেয়েছে? এটা শুধু মৃন্ময়, রবির গৌরব নয়। বাঙ্গালী হিসাবে আমরাও এতে গৌরবান্বিত। এই ভাবেই তো নিজেদের যোগ্যতা দেখিয়ে এক এক করে ওদের থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে সমস্ত পদ।

তপন, মানী গুণী লোককে শ্রদ্ধা করতে, মান্য করতে কখনও ভুলিস্ না। মনে রাখিস্ এঁরা আজ ঐ আসনে বসেছেন বলেই তো এই পথে এগিয়ে আসবার সাহস আমাদের হয়েছে। দেশকে কেবল স্বাধীন করলেই হবে না। দেখতে হবে তা পরিচালনা করবার মত যোগ্য ব্যক্তি আছে কিনা।

তাছাড়া সমরবাবু একজন জেলা শাসক হয়েও তাঁর মধ্যে এতটুকু দাস্য মনোভাব নেই। পরন্তু তাঁর আচার ব্যবহারে সর্বত্রই স্বাদেশিকতার রূপ ফুটে উঠেছে। এমন লোকদের সম্বন্ধে কোন রকম বিদ্রূপ বা অশ্রদ্ধার কথা শুনলে আমি পার্টির থেকে তাকে বিদায় দেব।

কোন রকম উশৃঙ্খলতা, প্রগল্ভতাকে আমি প্রশ্রয় দেব না।”

তপন নত মস্তকে নম্র স্বরে বল্লে “আমায় ক্ষমা করুন শঙ্করদা। আমি ভুল বুঝেছিলাম। ভেবেছিলাম বৃটিশের সঙ্গে সঙ্গে যেসব দেশীয় লোকেরা উচ্চপদে আছেন—তাঁরাও আমাদের শত্রু।”

রবি ও মৃন্ময়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের হাত ধরে তপন বলে “আমার অপরাধ হয়েছে। আমি দুঃখিত। আমার এতদিন একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল। শঙ্করদা আজ সেই ধারণা বদ্‌লে দিয়েছেন। তোরা আমায় মাপ করিস্।“

শঙ্করদা হৃষ্ট মনে বল্লেন “হ্যাঁ, এইভাবে নিজের ত্রুটি সংশোধন করবি। একটা কথা তোরা সব সময় মনে রাখিস্—আমরা কেউই দিগ্‌গজ নই। আমাদের জানবার, শুনবার, বুঝবার অনেক আছে। এই পৃথিবীটাই হ’ল শিক্ষাক্ষেত্র। সুতরাং কোন জ্ঞান নিয়েই কারো দম্ভ করা উচিত নয়।

যাক্, মৃন্ময়, তোরা মন খারাপ করে আছিস্ কেন বল’ত ?”

মৃন্ময় বিষণ্ন স্বরে বল্লে “ওখানে গেলে তো আমরা আর আপনার স্বদেশী পার্টিতে থাকতে পারবো না। আপনারা কি করছেন—না করছেন কিছুই জানতে পারবো না। দেশের সেবা করবার সুযোগও আমরা হারাবো।”

ওদের কথা শুনে শঙ্করদা তাঁর দিলখোলা হৃদয়ে উচ্চহাস্যে কক্ষ প্রকম্পিত করে বল্লেন “দূর, বোকা ছেলের দল। তোরা কি মনে করেছিস্ আমাদের কাজ কেবল এই বাগান বাড়ীতেই সীমাবদ্ধ। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে রয়েছে আমাদের শাখা, প্রশাখা। ওখানেও পাবি আমাদেরই মত আরও কত দাদা। তাঁরা আমাদের থেকেও বেশী জানেন, পড়েন, শোনেন অনেক বেশী। আমরা তো তাদেরই নির্দ্দেশে এখানে চলি। আমরা একটা বিরাট নদীর বিভিন্ন শাখা মাত্র। তোরা এবার সেই অতল নদীর সঙ্গেই সংযোগ স্থাপন করবি। সুযোগ তোদের আরও ভাল হল।

ওখানে তোদের চিরদা আছেন। তিনি শান্তিনিকেতনের কাছেই থাকেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। তোদের কোন ভয় বা চিন্তা সেই। কেবল অতি সাবধানে চল্‌বি। একটা কথা মনে রাখবি—দেশের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে আত্মোন্নতিব জন্য লেখাপড়াতেও তোদের মন দিতে হবে। ওখানে তোবা কত দেশ বিদেশের ছেলেদেব সংস্রবে আসবি। তাদের থেকে শিখ্‌বি কত কি। তেমনি তোদের থেকেও যেন তারা অন্ততঃ কিছু গ্রহণ করতে পারে সর্বদা সেই দিকে নজর রাখবি।

গুরুদেবের আশ্রম শুনেছি অনেকটা প্রাচীন আশ্রমের পরিকল্পনায় করা হয়েছে। যেটুকু পারবি তাঁর থেকে গ্রহণ করবি। কি অমূল্য সুযোগ যে তোরা পাচ্ছিস আজ তা উপলব্ধি না করলেও একদিন করবি। তখন যেন ফেলে আসা শান্তিনিকেতনের জীবনের জন্য আপশোষ করতে না হয়।

সৎ অসৎ সর্বত্রই এই দুটো দল পাবি। অতি কৌশলে অসৎ সঙ্গ পরিহার কবে চলবি। এসব অসৎ ছেলেদের সমালোচনাও করিস্ না বা উপদেশ দিতে গিয়ে নিজেদেব ক্ষতি কবিস্ না। কেবল অতি সতর্কতার সঙ্গে এদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলবি। বাবার অর্থ সার্থক করিস্। তোরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হবি। তবেই তো স্বাধীন দেশের দায়িত্ব নিতে পারবি। নতুবা কেবল দেশ স্বাধীন হলেই তো চলবে না। নিজেদের অযোগ্যতার অক্ষমতার জন্য হয়ত বৃটিশের পরিবর্ত্তে অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্র এসে আবার আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করবে। তাই এখন হতে তোরা প্রত্যেকে যেমন দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন পণ করেছিস্,—তেমনি আত্মোন্নতির ব্রতও তোরা নে। কেউ যেন না বলে স্বদেশী ছেলের দল ফেল করা মূর্খ, বখাটে ছেলের দল। সবাই যেন বলে চরিত্রে, ব্যবহারে, জ্ঞানে, বিদ্যায় স্বদেশী ছেলেরা এক একটি রত্ন। বিদেশে গিয়ে প্রতিকূল আবহাওয়ায় ভেসে যাস্ না। চেষ্টা করিস্ পার্টির সুনাম বজায় রাখতে।"

৩

কয়েক বছর পর।

"মৃন্ময় ও রবির চিঠি অনেক দিন পাই না। হ্যারে হিমাংশু, তোদের কাছে কি ওদের কোন চিঠি এসেছে?" সুতারা জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমার কাছে কিছু দিন আগে বড়দার একটা চিঠি এসেছিল। খুড়ীমা, তোমরা যে ভয়ে ওদের দূরে সরিয়ে দিলে,—ফল কিন্তু কিছুই হল না। ওখানেও সেই একই দলে তারা পড়েছে। আমার কাছে যে চিঠি তারা লেখে, অহিংস পথে যে কোন সংগ্রামই হতে পারে না —তারই বিশদ যুক্তি। ওরা আমাকেও ওদের দলে টানতে চায়।"

"কিন্তু সে যাক্· আমাদের কাছে কেন চিঠি দিচ্ছে না? শারীরিক ভাল আছে তো?"

"ওখানেই তো বেঁধেছে যত গোল। বন্দুক চালানো শিখতে গিয়ে বড়দা জখম হয়েছে। রবি ছোরা খেলা শিখতে গিয়ে একটা আঙ্গুলের বেশ খানিকটা কেটে ফেলেছে। কর্ত্তৃপক্ষ ওদের দলের খবর জানতে পেরে গেছে। সেই শাস্তি স্বরূপ তাদের কারো সাথে যোগাযোগ সাময়িক কালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। আমি এ খবর ওদের দলের একটি ছেলের থেকে জানতে পেরেছি। পড়াশুনায় ও ব্যবহারে তারা ভাল বলে এই প্রথম অপরাধে আশ্রম হ'তে বিতাড়িত করেনি। তবে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে—এর পরেও যদি তারা আশ্রমের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে কোন রাজ-নৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তবে তাদের আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

"এই ভয়ই আমি করেছিলাম। তোর কাকাবাবুকেও এ সম্বন্ধে বলেছিলাম। সমস্ত দেশেই বিদ্রোহের দাবানল জ্বলছে।

যেখানেই ওদের পাঠানো যাবে—আগুনের হল্‌কা ওদের গায়ে লাগবেই। কিন্তু উনি মনে করেছিলেন কবির শান্তিনিকেতনে এই বহ্নিশিখা ঢুকতে পারবে না। তাই তিনি নিরাপদ স্থান মনে করেই ওদের ঐখানে পাঠালেন—আমাদের দৃষ্টির আড়ালে।"

কাকাবাবু ভুল করেননি খুড়ীমা। আশ্রমের পরিবেশে সত্যি কোন রাজনৈতিক পঙ্কিলতা নেই। বড়দা ও রবি আশ্রমের বাইরে ওদের পার্টির সঙ্গে মিলে কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে বছরের পর বছর কাজ করছিল। হয়ত এই আঘাতে আহত না হলে—কোন দিনই কর্তৃপক্ষ তা জানতে পারত না।"

"তুই এত খবর কার কাছে পেলি? সেই বা এত খবর জানলো কি করে? মৃন্ময়, রবি বাড়ীতে চিঠি লিখে কোন কথা জানায়নি—ওরা কি করে এসব লিখেছে? ছেলে দুটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ওদের এখানেই নিয়ে আসবো। এখানে তবু তোর কাকাবাবুর ভয়ে বেশী দূর এগুতে পারবে না। ওখানে এরপর ওদের রেখে আর সোয়াস্তি নেই।"

"এখানে আসলেও মনে কর না, ওরা তোমার বাধ্য ছেলের মত ঐ দল ছেড়ে দেবে। এখানে থাকতে ওদের মনে স্বদেশ প্রেমের যে বীজ বপন করা হয়েছিল, ওখানে নানা স্বাধীন দেশেব ছেলেদের সংস্পর্শে তা'তে জল সিঞ্চিত হয়ে সেই বীজ মহীরুহতে পরিণত হয়েছে। তাই আজ মা, বাবা—সবার বড় তাদের কাছে দেশ। এই দেশকে স্বাধীন করবার জন্য তারা যেন পাগল হয়ে গেছে। কোন বিপদকেই আর বিপদ মনে করে না। এমন কি তাদের প্রাণের থেকেও দেশের মুক্তিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

"তবু চোখের সামনে থাকলে হয়ত তোর কাকাবাবুর ভয়ে পিস্তল, ছোরা ছুড়তে যেয়ে জখম হবে না। আমার মন ওদের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। ওদের চোখের সাম্‌নে আনতে না পারলে শান্তি ও সোয়াস্তি আর পাব না।"

"সেটাই ভাল খুড়ীমা। কিন্তু ওরা যে অগ্নিযুগের এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গে তোমার গৃহ পুড়ে যাবে না তো? কাকাবাবুর চাকরীটা যাবে না তো?"

"কি হবে জানি না। তবে এইটুকু জানি কোন কিছুর মোহেই তোর কাকাবাবু অন্যায়কে সমর্থন করবেন না। এবং ঘর পোড়া যাবার ভয়ে মা হয়ে আমিও আমার সন্তানদের ত্যাগ করতে পারবো না। পৃথিবীর বুকে কত অনাচার, অবিচার হচ্ছে। ধরিত্রী নীরবে সব সহ্য করে তাঁর সব সন্তানকেই রক্ষ করছেন—স্থান দিচ্ছেন তাঁর বুকে। তাই সন্তানের অপরাধের সম্ভাবনায় অ মি তো তোদের আর ত্যাগ করতে পারি না।"

"ধন্য তোমরা মাতৃজাতি। শুধু ত্যাগ নয়। সন্তানকে রক্ষা করতে হয়ত তোমরা বিষও পান কবতে পার। তোমরা যে অনেক কিছু পার। তোমাদের ধৈর্য্য অসীম--তার বহু প্রমাণই তো স্বাধীনতা সংগ্রামীর মা-রা দেখাচ্ছেন। কত অত্যাচার, অনাচার তোমরা নীরবে সহ্য করছ - তবু সন্তানের গায়ে অমঙ্গলের স্পর্শ লাগতে দিচ্ছ না। সন্তানের দোষ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বৃটিশ শাসকের কাছে নির্য্যাতিত হচ্ছ—তবু সন্তানকে রক্ষা করবার তোমাদের কি অদম্য প্রচেষ্টা। কেবল নিজের সন্তান নয়—পরের সন্তানের মা হয়ে তোমরা ক্লেশ সহ্য করছ। তোমাদের এই সহযোগীতা না পেলে কখনই বিদ্রোহী ছেলের দল বিদ্রোহের বিষাণ বাজাতে পারত না। সমগ্র পৃথিবীতেই বিদ্রোহের ইতিহাসে তোমাদের ভূমিকা কিছু কম নয়। তোমাদের সাহচর্য্যই তো যুগে যুগে দেশে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করেছে।

ভেবেছিলাম কাকাবাবু সরকারী পদস্থ চাকুরে -হয়ত তাঁরই জন্য তুমি সন্তানদের এই কাজ অনুমোদন করবে না। কিন্তু এখন আমার ভুল বুঝতে পারছি।"

"আমার সঙ্কট তোরা বুঝবি না। একদিকে স্বামীর চাকরী।

অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ছেলেদের অস্ত্র ধারণ। কোনটাই তুচ্ছ নয়। কিন্তু একটির জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে পারবো না। ত্রিশঙ্কুর মত ভগবান আমাকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। তিনিই আমাকে যথা সময়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি উপলক্ষ্য মাত্র তিনি নিয়ন্তা।"

"কিন্তু কাকাবাবু? তাঁর দায়িত্ব যে আরও বড়। জেলা শাসক তিনি। বিদ্রোহীদের শাসন করবার দায়িত্ব যে তাঁরই হাতে। নিজের গৃহে যেখানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে, – বাইরের বিদ্রোহের আগুন তিনি নিভাবেন কি করে?"

"সমস্যা যেমন তাঁর বেশী, সমাধানের উপায়ও তিনি জানেন তেমনি। তাছাড়া যিনি তাঁকে এই অগ্নি পরীক্ষায় ফেলছেন,— তিনিই উপায় দেখিয়ে দেবেন এই বিশ্বাস আমার আছে।

তবু নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য তো তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে বন্ধ করতে বলতে পারেন না বা এই সংগ্রামে অংশ নেওয়ার অপরাধে সন্তানদের প্রতি বিরূপ হতে পারেন না। তবে ওদেরই উচিত তার অবস্থা উপলব্ধি করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিয়ে তাঁকে অপদস্থ না করে পরোক্ষে বিদ্রোহীদের সহায়তা করা। কিন্তু মৃন্ময়রা কি অতশত বিবেচনা করে কাজ করবে? তা তারা করতে পারে না।

এই বয়সটাই যে কিছু একটা করবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। সৎ সঙ্গী পেলে তা সুপথে চালিত হয়। অসৎ সঙ্গে তা কুপথে যায়। জানি না ভবিতব্য কি লিখেছে আমাদের অদৃষ্টে।"

৪

কয়েক বছর পরে।

পাহাড়ের মাথায় সূর্যের শেষ রশ্মি রেখা দুষ্টু ছেলের মত উঁকি দিচ্ছে। পশ্চিমাকাশে গোধূলির আবির আকাশের মুখ রক্ত রাঙা করে দিয়েছে। কর্মক্লান্ত পথিক দিনান্তের কাজ শেষে ফিরছে যার যার গৃহাভিমুখে,- যেখানে গেলে সারা দিনের ক্লান্তি শ্রান্তি ভুলে যাবে—সন্তানদের হাস্য মুখর মুখ দেখে, স্ত্রীর পরিচর্যায়, মার স্নেহের স্পর্শে। পাখীরা সরবে দল বেঁধে চলেছে নীড়ে। দিনান্তের বেচাকেনা শেষ করে গ্রাম্য চাষীরা শব্জীর খালি ঝুড়ি মাথায় করে সারি বেঁধে মনের আনন্দে গান গেয়ে চলেছে সহরতলীর পথে। মেছোনীরাও খালি মাছের চুপ্‌ড়ি মাথায় নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে হাট হতে ফিরে যাচ্ছে। অফিস ফেরৎ বাবুরা ফিরছে গৃহে। ক্রীড়ারত ছেলেরা পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে ফিরছে যে যার বাড়ীতে।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যার ধূসর শাড়ী কে যেন বিছিয়ে দিল প্রকৃতির বুকে। সন্ধ্যা সমাগমের সাথে সাথে সর্বত্র নেবে আসছে লোক বিরলতা, নিস্তব্ধতা। কোলাহল মুখর মফঃস্বল শহরের বুকে নেবে আসছে শান্ত পরিবেশ। গৃহে গৃহে তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে উঠ্‌ছে। শঙ্খধ্বনি ও কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনিতে সন্ধ্যাকে স্বাগত জানাবার

আভাস ধ্বনিত হচ্ছে। গৃহে গৃহে পড়ুয়ার দল কেউ বা সরবে, কেউ বা নীরবে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেছে।

রাজপথে পথচারীদের চলাচল ক্রমেই কমে আসছে। সারাদিন অবিশ্রান্ত যাত্রী ও যানবাহনের ভার বয়ে পরিশ্রান্ত পথও যেন সন্ধ্যার সাথে সাথে ঝিমিয়ে পড়ছে। সর্বত্রই একটা স্তব্ধতা বিরাজ করছে। রাস্তার দুই পাশে ঝাউ গাছগুলি হতে শির্ শিরে হাওয়া ও স্থানে স্থানে ল্যাম্প পোষ্টগুলি হতে ক্ষীণ আলো রশ্মি রাজপথের সূচিভেদ্য অন্ধকার দূর করবার জন্য যেন প্রদীপ জ্বালিয়ে পথচারীর জন্য অপেক্ষা করছে। আকাশের কোলে সবে কয়েকটি তারা মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। অমাবস্যা রাত।

রবি এমন সময় উস্কখুস্ক চুলে বাসায় ফিরে সুতারাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে বলে "মামীমা, আমি একটা খুব অন্যায় করে ফেলেছি।"

রবির উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, শুষ্ক মুখ, অবিন্যস্ত চুলের দিকে দৃষ্টি রেখে সুতারা উৎকন্ঠিত হয়ে নিম্ন সুরে প্রশ্ন করেন "কি করেছিস্? আমার কাছে সব খুলে বল। তোর বিপদ যে আমারও বিপদ। কিছু গোপন করিসনে। খুলে বল কোথায় কি অনাসৃষ্টি করে এসেছিস্।"

"আমি ইন্‌স্‌পেক্টার প্রবোধ রায়কে রিভলভার দিয়ে হত্যা করে এসেছি। ফাঁসির জন্য আমি তৈরী। কিন্তু মামার হয়ত এজন্য লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতে হবে। হয়ত চাকরীটাও যাবে। আমি কি কৃতঘ্ন। তোমরা যারা আবাল্য নিজেদের সন্তান তুল্য আমাকে মানুষ করে তুলেছো, সেই আমি কিনা দেশদ্রোহীকে হত্যা করবার আগে— তোমাদের পরিণামের কথা একবার চিন্তা করলাম না।"

উৎকন্ঠিত স্বরে ভয়ার্ত্ত চোখে সুতারা বল্লেন "চুপ, চুপ, কাক পক্ষীও যেন একথা না জানে। আমাদের কথা ভগবান চিন্তা করবেন। তুই একথা কারো কাছে প্রকাশ করিস্ না জীবন গেলেও। তোর রিভলভারটা তাড়াতাড়ি আমাকে দে। আমি তা সরিয়ে ফেলি। তোর মামা তোকে বাঁচাবেন।"

মৃদু বেদনা জড়িত হাস্যে রবি উত্তর দিলে "মামীমা, তুমি স্নেহান্ধ হয়ে তোমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে মনে করছ। কিন্তু তা সম্ভব নয়। হয়ত এতক্ষণে পুলিশে খবর চলে গেছে। প্রবোধ রায় এখনও সম্পূর্ণ মারা যায়নি। তবে মরণাপন্ন। আমার সঙ্গে আগে তার তর্কাতর্কি হয়েছিল। সুতরাং সে আমাকে চিনে। নাম সে নিশ্চয়ই বলে দেবে।"

"তা হোক্। তবু তুই তাড়াতাড়ি রিভলভারটা আমাকে দে। আমি কূয়োর মধ্যে তা ফেলে দিয়ে আসি।"

"ওটা সঙ্গে আনিনি। ওখানেই ফেলে এসেছি।"

"বেশ করেছিস্। তুই এখন ঘর থেকে বের হোস্ না। পুলিশ যদি জিজ্ঞেস করে বলিস্ বিকেল হতে তুই বাসাতেই ছিলি -শরীর ভাল নয় বলে। আমার মাথা খাস্ রবি। আমার কথা রাখিস্। কখনও স্বীকার করিস্ না। তুই স্বীকার না করলে তোর শাস্তি হতে পারে না।" সুতারা আবেগ জড়িত স্বরে রবির মাথায় হাত রেখে বলেন "লক্ষ্মী ছেলে আমার। কখনও তোদের মিথ্যে বলতে শিখাইনি, মিথ্যাকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছি। কিন্তু আজ তোকে অনুনয় করছি, —সত্যি বলিস্ নে। যুধিষ্ঠিরকেও একদিন ঘটনার ফেরে একটি মিথ্যে দ্রোণাচার্যকে বলতে হয়েছিল। প্রাণ যেখানে সঙ্কটের মুখে, সেখানে মিথ্যে বল্লে কোন অপরাধ হবে না। আমি তোর মাতৃ স্থানীয়া— আমার কথা রাখিস্।"

"আচ্ছা, তোমার কথাই রাখবো। কিন্তু তবু পারবে না এই বিপদ হতে আমাকে রক্ষা করতে।"

এমন সময় বাইরে হুইসেল ও বুটের মশ্‌মশ্ শব্দ শোনা গেল। সুতারা বল্লেন "ঐ বোধ হয় পুলিশ এসেছে। তুই শুয়ে পড়্ রবি। চুলটা একটু আঁচড়িয়ে নে, চোখে মুখের চেহারা স্বাভাবিক করবার চেষ্টা কর" —বলে তিনি ঘর হতে বেড়িয়ে গেলেন।

সময় সংক্ষেপ। রবির সমস্ত স্নায়ুগুলি যেন শিথিল হয়ে

গিয়েছে। দৈহিক ও মানসিক সত্ত্বাগুলি যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কি এক গুরুভার পাষাণের মত বুকে চেপে রয়েছে। কিন্তু অধিকক্ষণ এই অদ্ভুত জীবনমৃত অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। তাই রবি মনের ও দেহের সব রকম অবসাদ দূর করে—এক রকম জোর করেই অভিনয় করবার জন্য নিজেকে যথা সম্ভব তৈরী করে তুল্‌লে।

পুলিশে বাড়ী ঘেরাও করে ফেল্‌লো। একজন আই, বি, র লোক, পুলিশ ইনস্‌পেক্টার ও একজন কনেষ্টবল সমরবাবুর সঙ্গে দেখা করবার অভিপ্রায় জানালো। সমববাবু পুলিশ ইনস্‌পেক্টারকে ডেকে বিরক্তপূর্ণ মুখে প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার? আমার বাড়ী কেন ঘেরাও করেছেন –কি হয়েছে?"

"স্যাব মাপ কববেন। সময় এত সংক্ষেপ যে আপনার অনুমতি নেবার অবকাশ পেলাম না। খুনী আসামী আপনার বাড়ীতেই প্রবেশ করেছে।"

উৎকণ্ঠিত স্বরে সমরবাবু বল্লেন "আমার বাড়ীতে খুনী আসামী ঢুকবে কি করে? গেটে আমার দাড়োয়ান রয়েছে। তাছাড়া আমি জানতে পাবলাম না, আর আপনারা জানলেন! কে সে খুনী? কাকে খুন করেছে?"

"আপনার ভাগ্নে রবি! খুন হয়েছে পুলিশ ইনস্‌পেক্টার প্রবোধ রায়।"

"আমার ভাগ্নে ববি! এ অবিশ্বাস্য। তার মন এত কোমল যে একটা পশু পাখীকে কখনও মারতে দেখলে, তার চোখে জল আসে। কাউকে মারতে দেখলে সে ব্যাকুল হয়ে উঠে। আমার অন্য ছেলেরা এত কোমল স্বভাবাপন্ন নয়। তাই বলছি—এ ঘটনা যেমন আশ্চর্য্যজনক, তেমনি অবিশ্বাস্য।"

"কিন্তু স্যার, আহত ব্যক্তি নিজেই যে তাব নাম করেছে।"

"হয়ত কোন কারণে রবির প্রতি তার আক্রোশ ছিল। তাই

প্রকৃত আততায়ীকে অন্ধকারে চিনতে না পেরে—রবির নাম দিয়েছে। যাক্ আমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছি, তিনি এ সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা। কিন্তু কোথায় এই ঘটনাটা ঘটেছে ?"

"পলটন ময়দানে।"

"সাক্ষী আছে কেউ ?"

"এখনও কোন সাক্ষী পাইনি। একমাত্র আহতের নিজস্ব জবানবন্দী ছাড়া।"

"আপনারা পাশের ঘরে গিয়ে বসুন। আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে আগে কথা বলতে চাই। কারণ রবি তার কোন কথাই তার মামীমার কাছে গোপন রাখে না। তাই জানতে চাই যথার্থ ব্যাপারটা কি ঘটেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেল টিপে ছোক্‌রা চাকরকে দিয়ে মাকে সাহেব একবার জরুরী দরকারে ডেকে পাঠিয়েছেন—বলে পাঠালেন।"

সুতারা যথাসম্ভব স্বাভাবিক মুখে এসে বল্লেন "আমায় ডেকেছো ? কি দরকার ?"

"রবি আজ বিকেলে কয়টার সময় বের হয়েছিল ? সে কি ফিরেছে ? তার সঙ্গে কি তোমার কোন কথা হয়েছে ?"

"রবি তো অফিস হ'তে ফিরে মাথা ধরেছে বলে আজ বিকেলে বেরই হয়নি। তার সঙ্গে কি কথা হয়েছে ? রবির কথার কি অন্ত আছে। প্রিভেনটিভ্ অফিসার হয়েছে, কিন্তু এখনও সেই ছেলে মানষী যায়নি। ছেলেবেলার মত অফিসে কি হল ? কে কি বল্ল—সবই বলে। কত মজার মজার গল্প। তা হঠাৎ রবির খোঁজ করছ কেন ? বাড়ীর চারপাশে এত পুলিশই বা কেন ?"

"সে সব পরে বলব। এখন পুলিশ ইনস্পেক্টারের সঙ্গে কথা শেষ করি।" সমরবাবুর কথার ইঙ্গিতে, সুতারা অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

সমরবাবু পুলিশ ইনস্পেক্টারকে ডেকে পাঠালেন। পুলিশ

ইনস্পেক্টার রাঘব ঘোষাল সমরবাবুর তলবে তাঁর কক্ষে পুনরায় প্রবেশ করল। যদিও রাঘব ঘোষালকে এমন জায়গায় বসতে দেওয়া হয়েছিল যে সমরবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হয়েছে তা সব শুনতে পেয়েছে।

সমরবাবু বল্লেন "আমি যা খবর পেলাম রবি তো আজ বিকালে বাসার থেকে বের হয়নি। যাক্ তর্ক নিষ্প্রয়োজন। আপনাদের উপর যে আদেশ আছে-- তাই করুন। আপনারা কি আমার বাড়ী সার্চ্চ করতে চান?"

"আমাদের অপরাধ নেবেন না, স্যার। আপনি তো জানেন আমরা হুকুমের চাকর মাত্র। আমাদের উপর আপনার বাড়ী সার্চ্চ ও আপনার ছেলে মৃণ্ময়বাবু ও রবিবাবুকে গ্রেপ্তার করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

"অপরাধ তো রবির বিরুদ্ধে সাজান হয়েছে। কিন্তু মৃণ্ময়কে নিয়ে আবার টানাটানি কেন? বেচারী ছুটিতে এখানে এসেই দেখছি বিপদে পড়ল।"

"মৃণ্ময়বাবুর বিরুদ্ধেও পুলিশ রিপোর্ট তেমন সুবিধার নয়। তাই কর্ত্তৃপক্ষ মনে করছেন হয়ত এ ব্যপারে তিনি কিছু হদিস দিতে পারবেন। অবশ্য হিমাংশু বাবুর রিপোর্টও ভাল নয়। তবে তিনি যখন এখানে নেই। তখন তাঁর বিরুদ্ধে আর কোন চার্জ সম্ভব হয়নি।"

সমরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্লেন "বুঝলাম না আমার বাড়ীর ছেলেদের উপর সরকারের এত শ্যেন দৃষ্টি কেন? অপরাধ সাজানো হয়েছে একজনের বিরুদ্ধে, কিন্তু গ্রেপ্তারের আদেশ তিনজনকে। যাক্ আপনারা আর দেরী না করে আপনাদের কর্ত্তব্য করে যান্। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার কিছু কর্ত্তব্য আছে।"

তিনি পার্শ্বস্থিত দণ্ডায়মান প্রাইভেট সেক্রেটারীকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন "এই তিনজনের বডি সার্চ্চ করে কোন আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য

কোন প্রকার আপত্তি জনক কাগজপত্র থাকলে তা আমার কাছে জমা দিয়ে যান্। ফিরবার পথে আপনাদের জিনিষ আপনারা নিয়ে যাবেন।"

রাঘব ঘোষাল তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সমরবাবুর বাড়ী সার্চ্চ করে কোন কিছুই পাননি। একমাত্র সমরবাবুর নিজস্ব আগ্নেয়াস্ত্র ব্যতীত দ্বিতীয় অন্য কোন অস্ত্র বা আপত্তিজনক কাগজও পাননি। তবু তারা রবিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। মৃণ্ময় তখন বাসায় ছিল না। তাই সে ফিরলে তাকে থানায় হাজির হবার নির্দ্দেশ দিয়ে যায়।

রবি যাবার সময় মামা ও মামীমাকে প্রণাম করল। সমরবাবু বল্লেন "তুই চিন্তা করিস্ না। আমি তোকে জামিনে আনবার ব্যবস্থা এখনই করছি। প্রাইভেট সেক্রেটারী সুসময়বাবু এখুনি থানায় যাবেন এজন্য।"

৫

রবিকে গ্রেপ্তার করে নিযে গেলে বাড়ীতে একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। মৃণ্ময় এম, এ ও 'ল পড়ে। ছুটিতে সে মার কাছে এসেছিল। তাকেও থানায় ছুটতে হল—বৃটিশ শাসকের পরোয়ানায়।

রবি বি, এ পাশ করে প্রিভেনটিভ্ অফিসার হয়েছিল। তন্ময় ও কবি স্থানীয় কলেজে বি, এস, সি পড়ে। হিমাংশু বি, এস, সি পাশ করে ল্যাবরটরী এ্যাসিস্‌টেণ্ট হয়েছে কলকাতার একটা বড় ফার্মে।

মৃণ্ময়কে জামিনে ছেড়েছে। কিন্তু রবিকে মামলা শেষ না হওয়া পর্যান্ত ছাড়া হলো না। শুধু তাই নয়। সমরবাবুকেও রবির মামলা চলাকালীন অন্য কোথাও বদ্‌লী করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি শারীরিক ও মানসিক কারণে দীর্ঘ এক বছরের ছুটি নিয়ে ঐ জায়গাতেই থাকলেন।

সুতারা সমরবাবুর কাছে সত্য যা তা প্রকাশ করেননি। রবির পক্ষ সমর্থন করবার জন্য কয়েকজন বরেণ্য নেতা এগিয়ে এলেন। সমরবাবুকে কিছুই বিশেষ করতে হয়নি। তবে তিনি যে রাজরোষে পড়বেন—তা তিনি জানেন। এইজন্য তাঁর পাওনা দীর্ঘ কালের ছুটি নিয়ে তিনি কর্মস্থলেই থেকে গেলেন। এবং স্বেচ্ছায় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করলেন। সমরবাবু অবসর গ্রহণের পত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর হয়ে গেল। কিন্তু জীবনের অনেক সময়ই পড়ে আছে। এই দীর্ঘ সময় তিনি কি করে কাটাবেন? বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব এখনও তাঁর ঘাড়ে। এই চিন্তায় এক রাত্রিতেই তাঁর মাথার কুঞ্চিত কাল কেশগুচ্ছ সাদা হয়ে গেল।

সুতারা সমরবাবুর অবস্থা দেখে বল্লেন "তুমি এত চিন্তা করছ

কেন? ছেলেরা এখন বড় হয়েছে। তাদের দায়িত্ব তারা নিতে পারবে। আমার তোমাব খরচ—তোমার পেন্‌শনের টাকা হতেই কুলিয়ে যাবে।"

"তা হয় না, সুতারা। ওদের পড়াশুনা একটি বছরের জন্যও আমি বন্ধ করে দিতে পারি না। আমার বিবেক তবে ওদের কাছে অপরাধী থেকে যাবে সারা জীবন। ভাবছি ওকালতি করব। কিন্তু এখানে তো তা সম্ভব নয়। একমাত্র হাইকোর্ট ছাড়া অন্যত্র আমার প্র্যাক্‌টিশ করবার ইচ্ছে নাই। কখনও মনে হচ্ছে,—স্বাধীন কিছু ব্যবসা করি মণিমোহনের অংশীদার হয়ে। কিছু একটা আমাকে করতেই হবে। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে। এভাবে পেন্‌শনের মুষ্টিমেয় টাকার উপর নির্ভর করে বসে থাকতে আমি পারি না।"

"আজই মৃণ্ময় ও হিমাংশুর চিঠি এসেছে। পড়ে দেখ, তারা কি লিখেছে"। বলে সুতারা চিঠি দু'খানা সমরবাবুর হাতে দিলেন।

শ্রীচরণেষু খুড়ীমা,

আজকের পত্রিকায় পড়লাম কাকাবাবু চাকরী হ'তে অবসর নিয়েছেন। পড়ে কি যে আনন্দ হল। কারণ এর পর তাঁর পক্ষে সম্মান নিয়ে চাকরী করা সম্ভব নয়। তিনি যেন চাকরী ছেড়ে কোন প্রকার মানসিক অশান্তি ভোগ না করেন।

আমি এই চাকরীটা ছাড়া আরও গোটাকয়েক টিউশুনি কর'ব ভাবছি। এবং সেই টাকায় আমার এখানকার খরচ চালাবো। আমার পুরো মাইনাটা কবি ও তন্ময়ের পড়ার খরচ বাবদ পাঠাবো স্থির করেছি। আশা করি তোমরা আপত্তি করবে না।

সারা জীবন তোমাদের স্নেহের দান দুই হাতে গ্রহণ করেছি। প্রতিদান দেবার সুযোগ কখনও পাইনি। এমন কি আজ এক বছর চাকরী করছি, কিন্তু তোমরা আমার রোজগারের একটি পয়সাও গ্রহণ করে আমাকে ঋণমুক্ত হবার সুযোগ দিলে না। অবশ্য তোমাদের স্নেহের ঋণশোধ জন্ম জন্মেও করা সম্ভব নয়। কেবল আমি নই।

আমার বৃদ্ধ পিতাকেও তুমি যে আদর যত্নে তোমার কাছে রেখে আমাকে চিন্তামুক্ত করছো—তা জীবনে ভুলবো না।

তবু আজ কবি ও তন্ময়ের পড়ার খরচটা দেবার অনুমতি যদি দাও তবে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। আমার এ প্রস্তাবকে ধৃষ্টতা মনে করো না। এটাকে আমার আবদার মনে কবো। আমি তো তোমারই ছেলে, খুড়ীমা। তবে আমাকে তোমাদের এইটুকু সেবা করবার অধিকার এ সময়ে কেন দেবে না?

কাকাবাবুকে সর্বদা উৎফুল্ল রাখতে চেষ্টা করো। জানি ববি মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর আহার নিদ্রা সব বন্ধ থাকবে। তিনি যে আমাদের কত স্নেহ কবেন, -তাতো আমরা জানি। কিন্তু আমাদেব কর্মফলেই তিনি এই বয়সে এত চিন্তাক্রান্ত হয়েছেন।

আমি জানতাম আমাদের জন্য তাঁকে একদিন চাকবী ছাড়তে হবে। কিন্তু এ ভাবে ছাড়তে হবে তা কখনও কল্পনা করিনি। তবে পত্রিকায় ববির 'কেস্' সম্বন্ধে যে খবব পড়ছি, তা'তে মনে হচ্ছে রবিব বিরুদ্ধে মামলা টিক্‌বে না।

পত্রপাঠ তোমাদেব কুশল সংবাদ জানাবে। বিশেষ কবে কাকাবাবুব খবব। ববি কেমন আছে? আমার আবেদন যেন মঞ্জুর হয়—এই প্রার্থনা কবি। তোমরা আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জেনো। বাবাকেও জানিও। কবি ও তন্ময়কে ভালবাসা জানিও।

ইতি

তোমাদের স্নেহধন্য হিমাংশু।

হিমাংশুর চিঠি পড়া শেষ হ'তেই মৃণ্ময়েব চিঠি খুলে সমববাবু খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় চিঠিখানা পড়তে সুরু করলেন।

শ্রীচরণেষু মা,

আজকের পত্রিকায় বাবার অবসব নেবাব খববটা পড়লাম। বাবাকে ঐ পদ হতে অবসর নেবার জন্য অনুবোধ জানাবার স্পর্দ্ধা

আমার মনে জেগেছিল বেশ কিছুদিন হতে। কিন্তু যতদিন নিজের অক্ষমতার গ্লানি দূর করতে না পারি—ততদিন তাঁর কাছে এ ধরণের কোন অনুরোধ জানানোর ধৃষ্টতাও প্রকাশ করতে পারি না। এই কারণেই নীরব ছিলাম।

কিন্তু আজ তিনি স্বেচ্ছায় আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করেছেন দেখে--কি যে আনন্দ হচ্ছে মনে। কিন্তু বাবা হয়ত সংসার চালাবার চিন্তার জন্য, বিশেষ করে কবি ও তন্ময়ের পড়ার খরচের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বেন। তাই আমি স্থির করেছি একটা কলেজে লেকচারার পদে চাকরী করবো। ও সন্ধ্যায় 'ল পড়বো। এতে আমার পড়াও বন্ধ হবে না। পরন্তু নিজের খরচ চালিয়ে কবি ও তন্ময়ের জন্য কিছু কিছু মাসে মাসে পাঠাতে পারবো। তাছাড়া সুযোগ পেলে আরও ১।১ টা টিউশুনিও নিতে পারবো। এতে আমার কোন কষ্ট হবে না। কিন্তু হয়ত বাবার চিন্তার কিছু লাঘব হবে।

বাবাকে আমাদের জন্য এতটা বিব্রত হতে হচ্ছে দেখে খুবই লজ্জিত। সুতরাং এই অবস্থায় বাবার কোন প্রকার সাহায্যে যদি আসতে পারি, তবে নিজেকে ধন্য মনে করবো। জানি বাবাকে হয়ত নানা ভাবে নিপীড়ণ সহ্য করতে হবে রবির জন্য। কিন্তু তাঁর মত স্বাধীনচেতা লোক কখনও লাঞ্ছনা সহ্য করে---বিদেশীর দেওয়া পরাধীন চাকরীর শৃঙ্খল বেশীদিন পরে থাকতে পারবেন না। দেশের নেতৃবর্গ যে উপযাচক হয়ে রবির মামলা চালাচ্ছেন এজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। রবির জয় অনিবার্য। তবু দূর্ভোগ হতে মুক্তি নেই।

ওখানকার সব খবরাখবর দিও। জেঠামণি, বাবা ও তুমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জেনো। অন্যান্যদের স্নেহাশীষ জানিও।

ইতি

তোমাদের স্নেহের মৃন্ময়

চিঠি দুটো পড়া হলে সমরবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন "অদৃষ্টের পরিহাস একেই বলে। নতুবা এইসব বাচ্চা ছেলেরা আজ আমার চিন্তা লাঘব করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে কেন? জীবনে কোনদিনও ভাবিনি যে এমন দিন আমার জীবনে আসবে। বিশেষ করে রবির মত কোমল হৃদয়ের ছেলের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ—এতো কেবল আশ্চর্য্যই নয়,—অবিশ্বাস্যও। মৃন্ময় সম্বন্ধে হলেও হয়ত আমি একথা অবিশ্বাস করতাম না।"

"কিন্তু রবি তো সন্ত্রাসবাদী দলে ছিল,—একথা তো তুমি জানতে। সে তো অহিংস পথের পথিক ছিল না।"

"তা জানি। কিন্তু মনে মনে একটা আদর্শকে সমর্থন করা এবং নিজে হাতে নাতে তা করা তো এক নয়। তাছাড়া রবি তো আমাদের বড় দয়ালু ছেলে।"

"তা বটে. কিন্তু রবির মধ্যে যে একনিষ্ঠতা, স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেম আছে—তা আমাদের অন্য কোন ছেলের মধ্যে নেই। এই প্রকৃতির ছেলেরা যখন কোন অন্যায় দেখে, অন্যায়কারীকে সাজা দিতে পশ্চাদপদ হয় না।

যাক্ কবি এসে আজ আমাকে বল্লে মামীমা, সেজদার জন্য মামাকে চাকরী ছেড়ে দিতে হ'ল। আমি ভাবছি, এবার পড়াশুনা বন্ধ করে কোন চাকরীতে ঢুকে পড়ব। সায়েন্স এর ছাত্রদের চাকরীর অভাব নেই। নাই বা রইল আমার ডিগ্রীর ছাপ।'

উত্তরে আমি ধমক্ দিয়ে বলেছি 'এসব জ্যাঠামো বাদ দিয়ে পড়াশুনায় মন দে। তোর মামার জন্য যদি সত্যি তোর দুঃখ হয়ে থাকে, তবে ভাল করে পাস করে বের হও।

তন্ময় এসে বল্লে, মা, আমি এখানে একটা চাকরী পেয়েছি। ভাবছি এবার পরীক্ষাটা ড্রপ করব। বাবার দুশ্চিন্তা কিছুটা কমবে। কবি পড়া চালিয়ে যাক্। ওর পড়ার খরচ আমি দেব।

তন্ময়কেও ধমক দিয়ে বল্লাম 'বাবার জন্য যথার্থই যদি তোর

দুঃখ হয়ে থাকে, তবে ভাল করে পড়ে পাশ কর্। লেখা পড়া বাদ দিয়ে এখুনি চাকরী নিবি, চাকরী হতে অবসর নিচ্ছেন বলে কি এতই অক্ষম হয়েছেন উনি? তোদের থেকে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা তাঁর অনেক বেশী। তোদের সম্বন্ধেও তোদের থেকে তাঁর চিন্তা বেশী। সুতরাং এসব চিন্তা বাদ দিয়ে, পড়াশুনায় মন দে, যাতে ভাল করে পাশ করে তাঁর অর্থ ব্যয় সার্থক করতে পারিস্।

ছেলেরা সবাই তোমাকে সাহায্য করবার জন্য উন্মুখ। হয়ত এটা ভগবানেরই আশীর্বাদ। এরা তোমাকে ভুল না বুঝে, তোমার কাজের অহেতুক সমালোচনা না করে—তোমার কাজে সবাই সন্তুষ্ট।"

"সবই তো বুঝলাম, সুতাবা। ছেলে আমাদের কোনটিও খারাপ নয়। ভগবান এক একটি হীরের টুক্‌রো আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমরা স্নেহে আদরে শাসনে এদের যদি যথাযথ ভাবে মানুষ করতে পারি,— তবেই হয়ত ভগবানের এই দান সার্থক হবে। আর যদি আমাদের অক্ষমতায় এরা উশৃঙ্খল হয়ে উঠে, বিপথে যায়—তবে এজন্য তারা দায়ী নয়। দোষী আমরাই।"

"রবিই বিপথে গিয়ে সব শান্তির বিঘ্ন ঘটালো।"

"না, তারা, তুমি ভুল করছ। রবি বিপথে যায়নি। রবি আমাদের গৌরব। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যদি তার জীবন যায়, তবে আমি মনে করব সে ভাগ্যবান্। আমরা কাপুরুষ। তাই রবির মত এত দুঃসাহসিক কাজ করতে পারিনি।

রবির মন কত উদার। কত সরল। রবির গানের গলাটাও ভারী মিষ্টি। এখনও যেন তার গলায় মুকুন্দ দাসের সেই সব গান আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

"রাম রহিম না জুদা কর ভাই,
মনটা খাঁটি রাখ জী,
দেশের কথা ভাব ভাইরে,
দেশ আমাদের মাতাজী।

হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে,
তফাৎ কেন কর জী
দু' ভাইয়েতে দু' ঘর বেঁধে
করি একই দেশে বসতি।"

গানটা সে কেবল গান হিসেবেই গাইত না। সত্যি তার মধ্যে আমি দেখেছি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রতিবিম্ব। তার হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের বন্ধুর সঙ্গেই সমান সৌহার্দ্দ্য।

তার আর একটা গান আমার কানে এখনও যেন বাজছে।

"ওরে বি-এ, এম-এ পাশ করে
নোক্‌রী যদি নাহি মিলে
ভাবনা কেন? কিসের ভয়? মিশে যাওনা
চাষার দলে
খেটে পরে খামার কর, শক্ত করে
লাঙ্গল ধর,
দু'দিন পরে দেখতে পাবি—
ঘুচে গেছে হাহাকার।"

ভাগ্যিস বি-এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে রবির চাকরীটা জুটে গিয়েছিল। নতুবা হয়তো সে সত্যি লাঙ্গল ধরতো। রবিকে বিশ্বাস নেই। তার মনে, মুখে, হাতে একই চিন্তা ধারার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। বাহ্যিক আড়ম্বর বা লোক লৌকিকতার সে ধার ধারে না। হয়ত অন্য ছেলেরা বি-এ পাশ করে এমন কিছু করবার কথা চিন্তা করতে পারত না। কিন্তু রবিকে কোন প্রকারেই আট্‌কানো হ'য়ত যেতো না। সে হয়'ত তার দেশে ফিরে গিয়ে চাষবাসই সুরু ক'রত।

কিন্তু রবির মত এমন কোমল স্বভাবের ছেলে কেন এমন কাজ

করতে গেল জানি না। ভাবতেই মনটা আমার খারাপ হয়ে যায়। যাক্ তুমি মৃন্ময়, হিমাংশুকে লিখে দিও—ওদের আর এই বয়েসে টিউশুনির বোঝা ঘাড়ে নিতে হবে না। ভগবানে বিশ্বাস রেখে তারা যেন তাদের অভিষ্ট পথে এগিয়ে যায়। দেখি সরকারী কাজ ছেড়ে আমি রোজগারের নূতন কোন পথ বেছে নিতে পারি কিনা।”

৬

বছর খানেক পর।

রবি প্রমাণভাবে মুক্তি পেয়েছে। পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টারকে অন্য জেলার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করবার সময় তার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু একমাত্র সেই ইন্‌স্‌পেক্টার ছাড়া সন্ধ্যার অন্ধকারে জনপ্রানীহীন পল্‌টন মাঠে তিনটি বৃক্ষের মাঝখানে কে প্রবোধ রায়কে গুলি বিদ্ধ করে—তা কেউ দেখতে পায়নি। কারণ আশে পাশে কোন বসতি নেই। সাহেবদের গল্‌ফ ও টেনিস্ খেলবার প্রকাণ্ড মাঠ। একমাত্র সহরের বিদেশী সাহেবরাই এই ময়দানে দিনের আলোতে খেলতে আসে। এই গ্রাউণ্ডটা সর্বদা সুন্দর ভাবে রক্ষিত হয়। মিহি গালিচার মত সবুজ ঘাসের আস্তরণে আবৃত। ক্রীড়ামোদী সাহেবদের অবসর সময়ে গল্‌ফ খেল্‌বার জন্য ময়দানটিকে চির নবীন ও সতেজ রাখা হয়। হোস্ পাইপের জলে ময়দানটিকে স্নান করিয়ে নিদাঘের তপ্ত হাওয়া হতে ময়দানটিকে সজীব রাখা হয়।

জনসাধারণের ঐ পথ দিয়ে গতিবিধিও কম। সব সময়ই একটা বিরাট নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর পল্‌টনের পথটি প্রাণহীন শবের মতই স্তব্ধ হয়ে থাকে। দুই একটি যান বাহনের চঞ্চল গতি যেন পল্‌টন ময়দানের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে যায়।

সুতরাং সন্ধ্যার সূচীভেদ্য অন্ধকারে প্রবোধ রায়ের হত্যার কোন সাক্ষীই ছিল না। অবশ্য বৃটিশ সরকার রাজসাক্ষী জুটিয়েছিল বেশ কয়েকটি। কিন্তু বিচক্ষণ আইনজ্ঞদের প্রশ্নের জালে কেউই শেষ পর্যন্ত টিক্‌তে পারেনি। একসাক্ষীর সঙ্গে অপর সাক্ষীর ভাষ্যের সামঞ্জস্য নেই। তাই বৃটিশ সরকারের স্বজাতীয় বৃটিশ জেলা জজের রায়ে রবির বিরুদ্ধে কেস্ টিক্‌ল না। রবি সসম্মানে কারাগার হতে ফিরে এল।

রবি ফিরে এল। কিন্তু সে যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। সদা প্রফুল্ল রবির প্রফুল্লতা যেন অস্ত গেছে। এই রবি যেন—সে রবি নয়। রবির স্বদেশী গানের কলিতে যে বাড়ী মুখরিত হত,—সে বাড়ী রবির বর্ত্তমানেও যেন রবিহীন হয়ে পড়েছে। রবির উদাস দৃষ্টি, সদা ম্রিয়মান মুখ, কি যেন এক গভীর চিন্তায় তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বন্ধু বান্ধবেরা তাকে অভিনন্দন জানাতে আসছে। কিন্তু সে যেন এসব আনন্দ উচ্ছ্বাস হতে নিজেকে সরিয়ে রাখতে ব্যস্ত। বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দের স্রোতে সে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারছে না। সবাই তাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু সে বিরক্ত হয় এসব ব্যাপারে। নানা অজুহাতে সে এসব অনুষ্ঠান হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আজকের রবি যেন উদয়মান প্রভাতের স্নিগ্ধ রবি নয়। এ যেন অস্তোন্মুখ রবির বিদায় আভার রেশ। বন্ধুরা অভিনন্দন জানাতে এসে রবির এই ঠাণ্ডা পরিবেশে নিজেদের আনন্দ স্ফূর্তি সব কিছু হারিয়ে ফেলে। কেউ ঠিক বুঝতে পারে না প্রাণ চঞ্চল, আবেগময়, সরল, উদার রবির আজ কি হল? যে ছিল মুখর। আজ কেন সে মূক। রবির গরবে যারা নিজেদের গর্বিত বোধ করছে, তারাও রবির এই নিস্তেজ, পলাতক মনোবৃত্তি দেখে যেন কেমন দমে যাচ্ছে। কিন্তু রবির এই বিরাট পরিবর্ত্তনের হেতু তারা খুঁজে পায় না। বাসায় তন্ময়ও কবি লক্ষ্য করে সেজদার পরিবর্ত্তন। মামা মামীমাও বুঝে উঠতে পারেন না মুক্তি পেয়েও রবি কেন এভাবে সর্বদা চিন্তামগ্ন।

রবির মধুর কণ্ঠস্বরে আর সমরবাবুর গৃহ মুখরিত হয়ে উঠে না। সমরবাবু রবির এই জয়ে সব চেয়ে বেশী আনন্দিত হয়ে ছিলেন। চাকরী হতে অবসর নেওয়ার গ্লানি যেন রবি সার্থক করেছে। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে আনন্দ—সে কেন শুক্‌নো ঝরা ফুলের মত শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রস্ফুটিত ফুলটি যেন স্পর্শেই শুকিয়ে যাচ্ছে।

সুতারা সবার অলক্ষ্যে রবিকে জিজ্ঞেস করেন "রবি, তোর কি

হয়েছে—আমায় বল্? আমার কাছে তো কোন দিনই কিছু গোপন করিস্নি। আজ কেন তবে এমন করছিস্?"

"মামীমা, তোমায় কি বলব? আইনের জাল থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু আমি তো জানি প্রবোধ রায়ের মৃত্যুর কারণ আমি।"

"তুই যদি তার মৃত্যুর কারণ হবি,—তবে তো সঙ্গে সঙ্গে সে মাবা যেতো। সাত দিন পর এক দেশ হতে অন্য দেশে স্থানান্তরিত কবতে গিয়েই তো এই বিভ্রাট ঘটলো। এখানকার ডাক্তারদের কথা অমান্য করেই তো তাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সরকারের দূরদর্শিতার অভাবেই হয়ত প্রবোধ রায় মারা গেছে। প্রবোধ রায়ের মৃত্যুর কারণ তুই নস্।"

"না মামীমা, কোন বকমেই কোন যুক্তিই আমার মনে সায় দিচ্ছে না। আমার বার বার মনে হচ্ছে প্রবোধ রায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী আমি। আমি আক্রোশের বশে একটা লোককে হত্যা করলাম।

"কিন্তু তা যদি সত্যি হয়েও থাকে, তা তো দেশের জন্যই করেছিস্। এতে কোন অপবাধ নেই। তুই কে? তুই উপলক্ষ্য মাত্র। ভগবান তোকে দিয়ে তার অপবাধের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। নিজেকে নিমিত্তের ভাগী কেন মনে করছিস্ না? কেন মিথ্যে এসব অবান্তর চিন্তার বোঝায় ভারাক্রান্ত হচ্ছিস্? তুই আমি কে? ভগবান যাকে দিয়ে যা করান—তাই আমবা করি মাত্র।"

"না মামীমা, এই মিথ্যে প্রবোধ বাক্যে তো আমার মনের আগুন নিভাতে পারবে না। ভগবান আমাদেব জ্ঞান, বুদ্ধি দিয়েছেন। তুমি আমাকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছো। সুতবাং সৎ অসৎ কাজ করবার মত জ্ঞান বুদ্ধি তো আমার হয়েছে। মিথ্যে নিজের অপরাধের বোঝা ভগবানের উপর চাপিয়ে নিজের বিবেককে তো নিষ্কৃতি দিতে পারব না।

তুমি দেশের কথা বলছিলে। কিন্তু একজন সামান্য বাঙ্গালী পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করে দেশের কতটুকু উপকার আমি করতে পারলাম? এতে দেশের কতটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি হচ্ছে বা হবে? পরন্তু একটি পরিবারকে আমি অভাবের মুখে ঠেলে দিলাম। কারোরই কোন উপকার এতে হলো না।"

"কিন্তু যে সব বাঙ্গালী এভাবে পরাধীনতার শৃঙ্খলে দেশকে আবদ্ধ কবে রাখতে সহায়তা করছে, হয়ত তারা প্রবোধ রায়ের পরিণাম দেখে ও পথে আব যাবে না।"

রবি অধীর হয়ে বলে "তুমি কেন বুঝতে পারছ না মামীমা, যে এরা দেশদ্রোহীতা কববাব জন্যই ঐ কাজ নেয়নি. নিজের পরিবার প্রতিপালন করবার জন্যই তাদের চাকরী নিতে হয়েছে। মামার মত অর্থবল, শিক্ষা, দীক্ষা, সাহস, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় সবার নেই। তাছাড়া তাঁর মত জ্ঞানী পণ্ডিতের জন্য আরও বহু পথ খোলা আছে। কিন্তু এসব হতভাগাদেব জন্য দ্বিতীয় আব কোন পথ নেই। তাই উপায়ন্তরহীন হয়েই এরা এপথে এসেছে।

প্রবোধ বায়কে যখন আমি বলেছিলাম স্বদেশী ছেলেদের পিছু না নিয়ে সবে দাঁড়াতে তখন সে এ কথাই বলেছিল। অবশ্য সে যদি আমাকে না শাসাতো, হয়ত আমি এতটা ক্রুদ্ধ হয়ে এমন অপকর্ম করতাম না। কিন্তু কি লাভ হ'ল? কার লাভ হল প্রবোধ রায়ের মৃত্যুতে?"

"হয়ত তোর কথা সত্য। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী দলে থাকতে হলে তো এমন কোমল মন হলে চলে না। কেন তুই ঐ পথে গিয়েছিলি? সকলের পথ এক নয়। কিন্তু যা ঘটে গেছে তা নিয়ে অযথা চিন্তা করলে তো কোনই ফল হবে না। পরন্তু ঐ পথে আর যাস্ না।

তাছাড়া সরকার পক্ষ হতে তোর কেস্‌টা আপিল করেছে

হাইকোর্টে। এ সময়ে তোর একটু সাবধানে থাকা ভাল। যা ঘটেছে তা যখন ফেরান যাবে না,—তখন বৃথা এসব কথা আলোচনা করা বা প্রকাশ করে নিজের ক্ষতি করে কি লাভ? প্রবোধ রায়কে তো ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না, বাছা!"

"কিন্তু আমার মন যে শান্তি পাচ্ছে না। আমি যে কিছুতে প্রবোধ রায়ের মৃত্যুর যৌক্তিকতা মেনে নিতে পারছি না। অহর্নিশি সেই একই চিন্তা যে আমাকে দগ্ধ করছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সব কথা স্বীকার করে শাস্তি বরণ করে নিলে হয়ত আমার শান্তি আসবে। কিন্তু মামার মাথা হেঁট হবে তাতে। সরকার পক্ষের নিগ্রহ চলবে মামা ও অন্যান্য ভাইদের উপর। তাই ইচ্ছে থাকলেও দোষ স্বীকার করতে সাহস পাচ্ছি না।

মামীমা, আমায় তুমি বলে দাও—কি করলে আমি শান্তি পাব। বন্ধুদের অভিনন্দন যেন বৃশ্চিকের মত আমাকে দংশন করছে। আমার বিবেক বলছে—আমি এই অভিনন্দনের যোগ্য নই। কোন কাজে নিবিষ্ট চিত্ত হতে পারছি না। কারও সঙ্গে আলাপ করতেও আমার ভাল লাগে না। তুষানল জ্বলছে আমার মনে। আমি মুক্তি চাই দহন জ্বালা হতে। আমায় বলে দাও মামীমা, কি করে আমি শান্তি ও মুক্তি পেতে পারি।"

"আমি বলছি রবি, তোর এই অনুতাপের আগুনেই তোর সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ভগবানের কাছে তুই তোর সব পাপ স্বীকার করে মনে মনে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা কর। দেখবি শান্তি তোর মনে আসবেই। মানুষ মাত্রেই ভুল করে। কিন্তু অনুতাপের দ্বারা আবার নিজেকে শুদ্ধ করা যায়। এতো আমার কথা নয়। এ যে মহাপুরুষদের বাণী।

রবি, তোর কাছে আমার একটা অনুরোধ। দোষ স্বীকার করে শাস্তি বরণ করে আমাদের শাস্তি দিস্ না। নিজের ছেলের মত স্নেহ

আদরে তোকে মানুষ করেছি। আর আজ এই বয়সে তুই এমন কিছু কাজ করিস্ না—যাতে আমাদের দুঃখের মাত্রা বাড়বে।

আজ অবধি তোর মামার কাছেও আমি যা প্রকাশ করিনি—তিনি দুঃখ পাবেন জেনে, সেই কথা সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করে তাঁর মাথা হেঁট করে দিস্ না। তাঁকে সরকারের শ্যেন দৃষ্টিতে ফেলিস্ না। এ আমার দিব্যি রইল জানিস্।"

৭

আরও কয়েক মাস পর।

হাইকোর্টেও রবির জিত হয়েছে। কেবলমাত্র আহত ব্যক্তির জবানবন্দীর উপর নির্ভর করে রবির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হয়নি। নীচের আদালত বা হাইকোর্ট কোথাও সরকার পক্ষের কৌঁসুলী রবির বিরুদ্ধে সচেষ্ট হয়েও কোন মামলা দাঁড় করাতে পারেনি। দেশ নেতারা খুনী মামলার অসামীকে এভাবে বেকসুর খালাস করতে পেরে আনন্দিত হয়েছেন। কিন্তু আসামীর মনে নেই কোন আনন্দের স্পর্শ বা মুক্তির আনন্দ বেজে উঠেনি। সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবেই সে এই সুসংবাদ গ্রহণ করেছিল।

সমরবাবুর মনে একটা দুশ্চিন্তা ছিল হাইকোর্টের রায় কি হবে। কিন্তু এ যাত্রাও রবির পক্ষের কৌঁসুলীদের পাণ্ডিত্যের কাছে সরকার পক্ষের যাবতীয় কলা কৌশল হার মেনেছে। প্রসন্ন চিত্তে তিনি বাড়ী ফিরে ছিলেন রবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে সুনাগরিক হবার পরামর্শ দেবেন এই সঙ্কল্প নিয়ে। কিন্তু বাড়ীতে এসেই সুতারার গম্ভীর মুখ দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন "আজ এমন আনন্দের দিনে তোমার মুখে বিষাদের ছায়া কেন? রবি কোথায় তাকে ডাকো। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে তাকে এই পথ হতে সরে যেতে পরামর্শ দেব। রবির মত কোমল স্বভাবের ছেলেরা এ অন্যায় অভিযোগও সহ্য করতে পারে না। তাই লক্ষ্য করনি এ মামলা সুরু হওয়ার পর হতে সে কেমন গম্ভীর হয়ে পড়েছে। রবিকে ডাকো। আজ তাকে আমি কয়েকটা কথা বলবো তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।"

সুতারা তবু বিষণ্ণ মুখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে সমরবাবু

বল্লেন "কি হয়েছে সুতারা? রবি ভাল আছে তো?" প্রশ্ন করেই তিনি অধীর হয়ে ডাকতে সুরু করলেন 'রবি' 'রবি'।"

এবার সুতারা উত্তর দিলেন "রবি নেই। তাকে সরকার পক্ষ হতে গ্রেপ্তার করে নিয়েছে "বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স" আইনে। ছেলেটা যাবার সময় প্রণাম করে বলে গেল 'মামীমা, আর হয়ত এ জীবনে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। মামাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলো,—আমি বড়ই হতভাগ্য! ছোটবেলায় মা বাবাকে হারিয়েছি। সেই অভাব একটি দিনের জন্যও তোমরা বুঝতে দাওনি। আর আমি কিনা কৃতঘ্নর মত প্রতিদানে মামার এই বয়সে চাকরীটা খোয়ালাম। তোমাদের লোকসানের পাতাই আমি কেবল পূর্ণ করে গেলাম।'

রবির কথাতেই নয়। কেমন একটা অমঙ্গলের ইঙ্গিত যেন আমার মনে ডাকছে! ভগবান ছেলেটির ভাল করুন এই প্রার্থনা।"

বিষণ্ণ মুখে সমরবাবু বল্লেন "অন্ততঃ আজকের দিনে তাকে এভাবে আত্মীয় পরিজন হতে ছিনিয়ে নিয়ে না গেলেই পারত। রবিকে আসামীর কাঠগড়াতে রেখেই কেবল এরা খুসী নয়। ফাঁসির মঞ্চে ঝুলাতে না পেরে যেন ক্ষেপে গেছে। তাই হাইকোর্টের রায় বের হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা রবিকে কারাগারে নিক্ষেপ করল। এ অন্যায় সহ্য করাও যায় না! প্রতিবাদ করবার উপায়ও নেই। কারণ বৃটিশ শাসক। আর আমরা শাসিত।"

"আমার কি মনে হয় জান? রবি হয়ত পাগল হয়ে যাবে।"
"কেন এমন অমঙ্গল চিন্তা তোমার মনে জাগছে?"

"রবিকে তোমরা লক্ষ্য করেছো? প্রবোধ রায়ের এই মামলার সুরু হতে যেন বিমর্ষতা তাকে গ্রাস করে বসেছিল। তারপর থেকে তার কণ্ঠে গানের ললিত রাগ আর কখনো বাজেনি।"

"সে হয়ত অতবড় অপবাদের বোঝা তার উপর চাপানো হয়েছে বলে।"

"তা নয়। সে সত্যি প্রবোধ রায়কে গুলি করেছিল। তুমি

তো জান সে কোনদিনই আমার কাছে কোন কথা গোপন করে না। রবি সেদিন ফিরে এসে আমার কাছে একথা বলেছিল। তোমার কাছে আমি এতদিন একথা প্রকাশ করিনি। কারণ এতে তোমার দুশ্চিন্তা বাড়তো। কিন্তু রবি ও আমি ছাড়া এ সত্য আর জানতো প্রবোধ রায়।

রবি রাগের বশে এই অপকর্ম করে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে। এই জন্যই তাকে যখন সবাই অভিনন্দন জানাতে এসেছিল প্রথমবারে, তখন সে বিরক্ত হত। সে আমায় নিজেই বলেছে তার কৃতকর্মের জন্য সে অনুতপ্ত। এবং রাতদিন এই চিন্তাতেই সে বিভ্রান্ত।

কিন্তু ভাইদের উপর, তোমার উপর অত্যাচার করবে—এই ভয়ে সে সত্য প্রকাশ করতে পারেনি। যদিও তার মন সত্য প্রকাশ করবার জন্য পাগল হয়েছিল। কিন্তু তোমাদের চিন্তাতেই সে অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি গ্রহণ করতে পারেনি। অথচ এই চিন্তাই অহোরাত্র তাকে পাগল করে রেখেছিল। এই চিন্তাই তার হাসি গান কেড়ে নিয়েছিল। এইজন্য আমার মনে হয় তার মনের ভারসাম্য সে রক্ষা করতে পারবে না। হয়ত মস্তিষ্ক বিকৃতি হবে। আমাদের মাঝে থাকলে তার সেই সম্ভাবনা হয়ত কম ছিল। চাকরী ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সব ভুলে যেতো আস্তে আস্তে। মামলার রায়ের জন্যও সর্বদা তার মন সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ঘুরতো তখন। তাই সেই সময় ঘটনাটা ভুলে থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এখন হয়ত তা সম্ভব হত।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে ঠিক যে সময় তার মানুষের ভীড়ের মধ্যে থাকার প্রয়োজন,—সেই সময়ই সরকার তাকে নির্জ্জন কারাগৃহে নিক্ষেপ করল! তাই ভাবছি রবির মত এত সরল, সোজা ছেলের পক্ষে এ কাজ যে কত কঠিন তা' তো জান। তাই সে নিজের বিবেকের কাছেও নিজেকে অপরাধী মনে করছে।"

সমরবাবু খানিকক্ষণ মৌন থেকে উত্তর দিলেন "সুতারা, তুমি

আজ আমাকে এ কি সংবাদ দিলে? আমাদের রবির মত কোমল হৃদয়ের ছেলে কি করে এ কাজ করল? আমার মন যে তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এমন অবিশ্বাস্য কাজও কি কখনও তার দ্বারা সম্ভব?"

উভয়ের কথোপকথনের মধ্যে মৃণ্ময় এসে উভয়ের পদধূলি নিয়ে প্রশ্ন করল "মা, রবি কোথায়?"

"এমন অসময়ে হঠাৎ কি মনে করে? রবিকে আবার গ্রেপ্তার করে নিয়েছে।"

"কিন্তু পথে তো পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় দেখলাম রবির বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করে দিয়েছে। তবে কেন আবার গ্রেপ্তার করল? তার বিরুদ্ধে আবার কি নূতন মামলা সাজাচ্ছে?"

"এবার কোনও ধারায় নয়। তাকে রাজবন্দী করেই রাখা হবে। হয়ত বৃটিশ সরকার এমন একটা আসামীকে বাইরে রাখা নিরাপদ মনে করছে না। যাক্ এসেছিস্ যখন ভালই হ'ল— ভেবেছিলাম আমরা আজ রাত্রের ট্রেনেই ফিরে যাব। রবির জন্যই আমাদের কলকাতায় আসা। ভেবেছিলাম একসঙ্গে সবাই ফিরবো কিন্তু তা যখন ভগবান দিলেন না, তখন একলাই কয়েক দিনের মধ্যে ফিরবো। ভেবেছিলাম হিমাংশু ও তোকেও কয়েক দিনের জন্য নিয়ে যাব। কি দুশ্চিন্তায় দিন কেটেছে এই দীর্ঘ ১॥ বছর। অনুক্ষণ মনে দুশ্চিন্তার বোঝা নিয়ে ঘুরেছি। ভগবান যদি বা মুখ তুলে চাইলেন, কিন্তু সবই আবার ধূলিসাৎ করলেন রবির গ্রেপ্তারে।"

মুখ গম্ভীর করে মৃণ্ময় বল্লে "কাল রবি আমাকে বলেছিল, 'বড়দা, তুই একবার কাল আসিস্।' তাই আজ আর দেরী না করে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। কিন্তু তাও দেখা হ'ল না। কখন গ্রেপ্তার করেছে? আমি যাব জেলখানায় দেখা করতে।"

গম্ভীর মুখে সমরবাবু বল্লেন "সেই ভাল মৃণ্ময়। আমিও তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তুই আমার সঙ্গে চল্।"

সুতারা বল্লেন "আমারও যে ছেলেটাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। কবে ওকে ছাড়বে তাতো জানি না। আবার কবে তার সঙ্গে দেখা হবে জানি না।"

রবিকে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন এবার দেশনেতৃবৃন্দ। সমরবাবু তাঁদের অভ্যর্থনা করতে ব্যস্ত। ববির গ্রেপ্তারের কথা শুনে সকলেই বিমর্ষ হলেন। ববিকে কোন বকম দণ্ড দিতে না পারার জন্যই যে গ্রেপ্তার—তা সকলেই উপলব্ধি করতে পারল। সমরবাবুকে সান্ত্বনা জানিয়ে এবং চাকরী ত্যাগ করে তিনি স্বাধীন ভাবে প্র্যাক্‌টিশ করছেন জেনে সকলেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলেন। সমরবাবু তাঁদের চা পানে আপ্যায়িত কবতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রবির গ্রেপ্তারের সংবাদে তাঁরা ক্ষুন্ন মনে ফিরে গেলেন। সমস্ত জয়ের আনন্দ, এই সংবাদে ম্লান হয়ে গেল। তাঁবা জানেন এইভাবেই বৃটিশ সরকার বিদ্রোহীদের নিষ্পেষিত করবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের তরুণ যুব সম্প্রদায়কে অকারণে কারারুদ্ধ করে তাদের প্রস্ফুটোম্মুখ সুন্দব জীবনকে অসময়েই পঙ্গু করে দেবে।

অভ্যাগতরা বিদায় নিলেন। সমরবাবু ও মৃন্ময় রবিব সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সুতারাকে সেদিন তাঁবা যেতে দিলেন না। মৃন্ময় বল্লে "মা, আজই তোমরা যেও না। পরন্তু কবি ও তন্ময়কে লিখে দিচ্ছি, তারা ওখান থেকে সমস্ত জিনিষ পত্র গুছিয়ে চলে আসুক।"

"ওরা এখনও ছোট। ওরা কি পারবে একটা গোটা সংসাব গুছিযে আনতে? তোর বাবা প্র্যাক্‌টিস্ করবেন বলে চলে এলেন। বিশেষ করে রবির মামলার জন্যই তাঁব আসা হয়েছিল। সবার যখন পড়াশুনা শেষ হয়েছে, তখন তোর বাবাকে এখানে একা বেখে, ওখানে থাকা সম্ভব নয়। তাই ভাবছি আমরা গিয়ে সব গুছিয়ে এখানে চলে আসবো।"

মৃন্ময় ও সমরবাবুর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে একটি তন্বী সুন্দরী

শ্যামাঙ্গী মেয়ে সাধারণ বেশে এসে সুতারাকে বল্লে "মাসিমা, রবিদা কোথায়? রবিদাকে আমি অভিনন্দন জানাতে এসেছি।"

সবার কাছে একই উত্তর সুতারাকে বার বার দিতে হচ্ছে। শুনে গম্ভীর মুখে চন্দ্রিকা বল্লে "মাসিমা, রবিদার মত ছেলেদের রাজনীতিতে যাওয়া বোধ হয় ঠিক হয়নি। এঁরা হেসে খেলে সবাইকে আনন্দ দেবেন। এদের মধ্যে যে গুণ আছে—তার মাধ্যমেই তো অন্যদের প্রেরণা দিতে পারতেন। আমি কয়েক বারই বলেছি রবিদা, তুমি এ পথে এসো না। সবার জন্যই ভগবান এক পথ বা এক কাজেব বিধান করেন নি। গতানুগতিক একই পথে সবাই চলতে পারে না! চলা উচিতও নয়। কিন্তু রবিদা প্রতিবারই হেসে নানা স্বদেশী গানের কলি গেয়ে জানিয়েছেন দেশ সেবাই তাঁর ব্রত। বলেছি 'গানের মধ্যে দিয়ে সেই যুগের চারণ কবিদের মত দেশপ্রেমিকদের উৎসাহিত করতে পারো, প্রেরণা দিতে পারো। সবাইকেই যে হাতিয়ার ধরতে হবে তেমন কোন মানে নাই।' কিন্তু রবিদা ছিলেন অটল তাঁর সঙ্কল্পে। মানুষের সামান্য দুঃখে বা পশু পক্ষীর দুঃখে যার চোখে জল আসে, সে কেন এ পথে এলো বুঝি না। হয়ত এসবই গ্রহের ফের।"

"কিসের জন্য সে ঐ পথে গিয়েছিল জানি না। হিমাংশুর মত অহিংস পথে যাওয়াই তার উচিত ছিল। মানুষ মাত্রেই ভুল করে। কিন্তু ভুল যখন বুঝতে পারে, তখন আর তা শোধরাবার পথ থাকে না। জানি না হতভাগ্য ছেলের অদৃষ্টে কি আছে। জন্মের কয়েক বছরের মধ্যে মা বাবাকে হারিয়েছে। অবশ্য কবির অদৃষ্ট আরও খারাপ। জন্মলগ্নে সে মাকে এবং বছর দুই পরেই বাবাকে হারিয়েছে। তবু কবি যেন অনেকটা শক্ত। রবির মত এত দুর্বল বা কোমল চিত্তের নয়। রবির জন্যই ছিল আমার বরাবর ভয়। শেষ পর্যন্ত এই রবিই এমন একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো—যার জন্য আমাদের চিন্তার অবধি নেই। কেমন যেন একটা ঘুর্ণি ঝড়

পরিবারের চেহারাটাই বদলে দিয়ে গেল। তোমার মেশোমশায়কে চাকরী হতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় এসে প্র্যাক্টিস্ করতে হচ্ছে। এখন সব সময়ই আতঙ্কের মধ্যে থাকি আবার কোন ছেলে কি করে বসে। রবির উপরেই ছিল আমাদের আস্থা। সেই রবিই যখন সব উলোট পালোট করে দিল, তখন আর কাকে বিশ্বাস করবো? যুগটা যে বড়ই মন্দ। এই হাওয়ায় কখন যে কে ঘরছাড়া হয়ে—কি ঘটাবে—কে জানে?

যাক্ তোমার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে চন্দ্রিকা? মা বাবার কাছে নিয়মিত চিঠি দাও তো। তোমরা বিদেশে থাকলে, তাদের মন যে কতটা উদ্বিগ্ন থাকে তাতো তোমরা বুঝ না।"

"না মাসিমা, আমি নিয়মিত প্রতি সপ্তাহেই মার কাছে চিঠি দিয়ে থাকি। তা নয়ত বাবার তার এসে হাজির হয়।

আজ উঠি মাসিমা। হোষ্টেলে ফিরবার সময় হয়ে গেছে। রবিদার খবরটা পত্রিকায় পড়ে ছুটে এসেছিলাম তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। এমন দুঃসংবাদ শুনবার আশঙ্কা নিয়ে আসিনি। মনে হচ্ছে বৃটিশ সরকার যাকে ধরবে—জোঁকের মতই ধরবে। আর ছাড়বে না।"

"আজ তুমি এসো। আমি হয়ত কয়েক দিনের মধ্যেই দেশে ফিরবো। তোমার মা বাবাকে জানাবার কোন খবর থাকলে—এর মধ্যে একদিন এসে জানিয়ে যেও।"

৮

চন্দ্রিকা সুতারার বাল্যবন্ধু উমার মেয়ে। উমারও বিয়ে হয়েছিল একই দেশে। উমা ছিল অপরূপ সুন্দরী, সুলক্ষণা গুণবতী। কিন্তু ভাগ্য নিয়ে বিধি তার বাম। উমা জন্ম দুঃখিনী। দুই মাস বয়সে মাকে হারালো। দিদিমার কাছে কয়েকটি বছর ভালমন্দে কেটেছিল। কিন্তু তিনিও বেশী দিন উমার মায়ায় সংসার আঁকড়িয়ে থাকতে পারলেন না। তাঁরও পরলোকের ডাক আসলো। উমাকে ফিরে আসতে হলো পিতৃগৃহে। ততদিনে উমার মার শূন্য স্থান পূর্ণ করেছেন বিমাতা। বিমাতার রূঢ় ব্যবহার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনার মধ্যে উমার কৈশোর ও যৌবন কাটল।

বিমাতার মেয়েরা হয়েছিল রূপহীনা। এজন্য বিমাতার সব আক্রোশ ছিল উমার সৌন্দর্যের উপর। তাই উমাকে যথা সম্ভব মলিন ছিন্ন পোষাক পরিয়ে ছাই দিয়ে আগুণ ঢাকার চেষ্টা চলেছিল। উমার তেল বর্জ্জিত রুক্ষ পিঙ্গল কুঞ্চিত কেশদাম সদা সর্বদা বিমাতা কদম ছাট দিয়ে রাখতেন উমাকে শ্রীহীনা করতে। কিন্তু উমার অবাধ্য কেশগুচ্ছ দু'দিনেই কান ছাপিয়ে কাঁধে এসে পড়ত তার সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে। আবার সেই কেশগুচ্ছকে নিগৃহীত হতে হোত উমার বিমাতার হাতে।

বিমাতার রূপহীনা, কৃষ্ণকায় মেয়েদের পোষাকের পারিপাট্যে রূপবতী করে তুলবার চেষ্টা হোত। দিদিমার মৃত্যুর পর হতে উমার জীবনে নেবে এসেছিল কালরাত্রি। কারণে অকারণে বিমাতার ও বৈমাত্রেয় ছোট ভাই বোনদের অত্যাচারে সে জর্জ্জরিত। উমার বাবারও কেমন যেন নির্লিপ্ত ভাব। তাঁরই চোখের সামনে উমা লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত হচ্ছে অকারণে—তা পিতার চোখে পড়েও পড়তনা।

কিশোরী উমা ভাবত তার সুন্দরী মাকে—যাঁর স্মৃতি অবশ্য উমার তেমন মনে নেই। দিদিমার মুখে তাঁর অজস্র গুণ ও সৌন্দর্য্যের কথা সে সব সময় শুনেছে—যদিও এ বাড়ীতে আর কোথাও তার মার কোন স্মৃতি নেই। সেই মাকে বাবা কি করে ভুলে সৎমার মায়ায় এমন ভাবে জড়িয়ে পড়লেন যে সেই মায়ের একমাত্র স্মৃতির উপর এমন অত্যাচার হচ্ছে দেখেও নীরব থাকতেন।

উমা জল ভরা বড় বড় চোখে লাঞ্ছিত হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। অশ্রুধারা তার কপোল বেয়ে পড়তে থাকে। উমার বাবা লাঞ্ছিতা উমার প্রতি দৃষ্টি পড়লেই, তাড়াতাড়ি সেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। নীরবে উমাকে সব সহ্য করতে হ'ত। ফরিয়াদ জানাতো সেই সৃষ্টিকর্ত্তার দরবারে—যিনি তাকে এত রূপ লাবণ্য দিয়ে সৃষ্টি করেও—এমন দয়া মায়াহীন পরিবেশে পাঠিয়েছেন। সব সময়েই তার নিপীড়িত মনে মা'র অস্পষ্ট ছবি ও মার কথা ফুটে উঠত।

কিশোরী উমা এক হাতে বাড়ীর যাবতীয় কাজকর্ম রান্নাবান্না সব কিছু করতো। উমাকে কখনও কোন স্কুলে পড়বার সুযোগ দেওয়া হয়নি। কারণ তবে সংসারের হাঁড়ি ঠেলবে কে? সৎ ভাই বোনেদের স্কুলে পড়ানো ও বাসায় তাদের প্রাইভেট টিউটারও আছে। বুদ্ধিমতী উমার হাতে খড়ি হয়েছিল দিদিমার কাছে। তাই উমার অক্ষর পরিচয় ভালই ছিল। রান্না ঘরের পাশেই একটা বারান্দায় ছোট ভাই বোনেরা পড়াশুনা করত। উমা একাগ্র মনে তাদের উচ্চগ্রামে পড়া শুনে শুনে নিজেও সামান্য বিদ্যা আয়ত্ত্ব করে ছিল। অবশ্য তার এই বিদ্যার পরিচয় কখনই সে কাউকে দেয়নি। এই বিষয়ে তাকে সহায়তা করত পাশের বাড়ীর হেমলতাদি। দুপুর বেলায় ভাই বোনেরা যখন স্কুলে যেতো, সৎমা দিবাকালীন সুখ নিদ্রা উপভোগ করছেন,—সেই সময় কোলের সৎ ভাইটিকে নিয়ে হেমলতাদির কাছে গিয়ে সে পড়াশুনা করত। মার দিবানিদ্রা শেষ হবার আগেই আবার বাসায় ফিরে আসতে হত।

অতি অনাদরে থেকেও উমার রূপের ডালি তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন উপছে পড়ছিল। উমার পাশে নিজের কুরূপা মেয়েদের দিকে যতই দৃষ্টি পড়ত—ততই সৎমার আক্রোশ যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। উমার প্রতি অহেতুক নির্য্যাতন ততই বেড়ে চলেছিল। তার নিজের শ্রীহীনা মেয়েদের পাশে এই রূপের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে সৎমার সাহস হতো না। তাই উমাকে যেন তেন প্রকাবেণ পাত্রস্থ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সৎমা।

উমাব রূপের জন্য বহু বড় বড় পরিবার হতে বিয়ের সম্বন্ধ এলো। হয়ত সে সব প্রস্তাব নিজেব মেয়েদের জন্য হলে সৎমা লুফে নিতেন। কিন্তু অত বড় ধনী ঘবে উমার বিয়ে হয়—সৎমার তা পছন্দ হোত না। অকাবণে বাজে অজুহাত দেখিয়ে সেইসব বিয়ে ভেঙ্গে দিতেন। যদিও উমার বাবা মনে মনে এমন পাত্রই উমার উপযুক্ত মনে করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের ভয়ে মুখ ফুটে উমার পক্ষে একটি কথাও বলতে তিনি কোনদিনই সাহস পাননি। তাই অকারণে কেবল ধনী নয়, সম্পদশালী, সুন্দর কন্দর্প কান্তি, বিদ্বান, উচ্চ বংশজাত সব পাত্র উমার পানিপ্রার্থী হয়ে উমার বিমাতাব দরবার হতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতো।

অবশেষে উমাব বিমাতা নিজেরই এক দূর সম্পর্কের দোজবরের বৃদ্ধের সঙ্গে উমাব বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। কেবলমাত্র দোজবব নয়। পাত্রের সৎমা বর্ত্তমান এবং তিনিই বাড়ীর কর্ত্রী। অর্থাৎ জেনে শুনে এমন বাড়ীতে উমাব বিয়ের ব্যবস্থা করলেন যেখানে উমাব নিগ্রহের সীমা পরিসীমা থাকবে না। কারণ বরের সৎমা ব্যাপিকা সমশ্রেণীর মহিলা বলে পাড়ায় কুখ্যাত ছিল, উমার দ্বিগুণেরও বেশী বয়সের পাত্র। এই বয়সে বিয়ে করা শোভনীয় নয়। তবু সরল সাদা মাঠা মানুষ প্রভাকরবাবু বিমাতার আদেশে অনিচ্ছায় বিয়ে করতে বাধ্য হন্। যেহেতু বিমাতার দৌরাত্ম্যে বাড়ীতে কোন ঝি চাকর টিকে না। সেই হেতু বিনে পয়সায়

একজন ঝির প্রয়োজনে প্রভাকরবাবুকে বিয়ে করতে তিনি বাধ্য করলেন।

মহিলার নিজের কোন সন্তানাদি ছিল না। সতীনেব অন্যান্য সন্তানেরা তাঁর দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে যে যার পথ বেছে নিয়েছে। একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাকর পিতার অবর্ত্তমানে বিধবা সৎমাকে পবিত্যাগ করে কোথাও যেতে পারেনি। পাড়ায় গুজব যে সৎ শাশুড়ীর লাঞ্ছনায় প্রভাকরবাবুর প্রথমা স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিলেন এবং সৎ শাশুড়ীর অত্যাচারেই শৈশবেই প্রভাকরবাবুর দু'টি সন্তান মারা গেছে। প্রভাকরবাবুর এজন্য মনে সুখ বা শান্তি ছিল না। স্ত্রী মারা যাওয়াতে পারিবারিক অশান্তি হতে তিনি অব্যাহতি পেয়ে ছিলেন। কারণ প্রভাকরবাবুর প্রথমা স্ত্রীও মুখরা ছিলেন। যখন পুত্রবধূ ও শাশুড়ীতে কোন্দল সুরু হ'ত—তখন কাক পক্ষীও ঐ বাড়ীতে টিকতে পারতো না।

কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রভাকর বাবুর অযত্নের সীমা ছিল না। সময়ে খাবার তিনি পেতেন না। পরন্তু বিমাতার অনেক কাজই তাঁকে করতে হ'ত বিমাতার কর্কশ ব্যবহার হতে অব্যাহতি পাবার জন্য। প্রভাকরবাবুর প্রথমা স্ত্রীর সন্তানেরা উপযুক্ত শাসনের অভাবে উশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। একদিকে ঠাকুরমার পীড়ন, অন্য দিকে সরল, সন্তানবৎসল পিতার অপত্য স্নেহাতিশয্যে তারা ভেসে বেড়াচ্ছিল। প্রভাকরবাবু জানতেন বিমাতার দূর্ব্যবহারে স্ত্রী আত্মহত্যা করে মুক্তি পেয়েছে। মাতৃহীনা শিশুরা ঠাকুরমার হাতে নির্য্যাতিত হচ্ছে,— এই কারণে অনেক সময়ই প্রভাকরবাবু সন্তানদের অন্যায় দেখেও নীরব থাকতেন। পরন্তু মার অভাব যতটা সম্ভব তিনি স্নেহ দিয়ে ভরিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। এই দুই বিপরীত মুখী পরিবেশের মধ্যে পড়ে তারা নিজেদের খুশী মত চলতে সুরু করে। পিতার জন্য তাদের ছিল না কোন দরদ বা ভালবাসা। পিতার কোন রকম পরিচর্য্যা তারা করত না।

দ্বিতীয়বার বিয়েতে প্রভাকরবাবুর যথেষ্ট আপত্তি ছিল। বিশেষ করে সন্তানদের বিমাতার হাতে লাঞ্ছিত হবার সম্ভাবনায়। বিমাতা জানতেন প্রভাকর সহজে বিয়েতে সম্মতি দেবে না। এই কারণে বিয়ের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে—কনেকে আশীর্বাদ করে দিন ক্ষণ স্থির করে নিমন্ত্রণ পর্ব সমাধা করে—প্রভাকরের কাছে খবর দেওয়া হয়েছে, যাতে কোন প্রকারেই প্রভাকরবাবু অসম্মতি জানিয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে না পারেন।

নববধূ রূপে এ বাড়ীতে পা দিতেই উমার উপর নিগ্রহ সুরু হয়। সতীনের পুত্র অম্বিকা তখন বছর ৫ এর, কন্যা অম্বালিকা ৪ বছরের এবং কনিষ্ঠা কন্যা অম্বুধি ৩ বছরের। নূতন মায়ের স্নেহ তারা পেলো। কারণ ভুক্ত ভোগী উমা সতীনের সন্তানদের শাশুড়ীর অজ্ঞাতে যথেষ্ট স্নেহ করত। তার জীবন সুরু হয় গরল মুখে নিয়ে। তাই সন্তানদের মুখে তা সে দিতে চাইল না। যদিও, সাধারণতঃ এর উল্টাই দেখা যায়। যেমন নিগৃহীত বধূ যখন শাশুড়ীর আসন পায়, তখন সেও বধূর উপর অত্যাচার করে থাকে। বা সৎমার দ্বারা লাঞ্ছিতা মেয়ে যখন সৎমার আসন পায়, তখন যেভাবে নিজে নিগৃহীতা হয়েছে—সেইভাবেই সতীনের সন্তানদের প্রতি নিগ্রহ চালায়। কিন্তু ভগবানেব এই রাজ্যে, এই ধূলো মাটির সংসারে কখনও কখনও চিরন্তন এ রীতির ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যদিও সেই অভিনবত্ব এতই বিরল তা মানব চক্ষে সাধারণতঃ পড়ে না। তাই 'সৎমার' নাম চিরকালই ভীতির সঞ্চার করে,—একটা অশুভ সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

তবু এই পৃথিবীতেই যেমন আছে তমসাচ্ছন্ন যামিনীর পাশে উষার স্নিগ্ধ আলো, গরলের পাশে অমৃত, অসতের পাশে সৎ, শীতের পর আসে বসন্ত, মন্দের পাশে ভাল, দুঃখের পাশে সুখ, অধর্মের পাশে ধর্ম, অসীমের মাঝে সীমা,—তেমনি বিমাতার আচরণ ও গুণাগুণের মধ্যে কোথাও কোথাও বৈচিত্র দেখা যায়। উমা সেই

ব্যতিক্রম। বিমাতার উগ্র মেজাজ, রুদ্র রূপ নিয়ে সে প্রভাকরের সংসারে আসেনি। এসেছিল মাতৃ স্নেহে আপ্লুত নমনীয়া, কমনীয়া জননীরূপে। তাই তার সুন্দর অবয়বে ফুটে উঠেছিল মাতৃরূপের চিরন্তন স্নিগ্ধ ছবি।

প্রভাকরবাবুর জীবনে আসলো পরিবর্ত্তন। তার অবহেলিত জীবনের সব প্রভঞ্জন যেন কেটে গেল। উমার প্রতি যে নিগ্রহ হত তা প্রভাকরবাবুর অসাক্ষাতে। কারণ বধূ পীড়নও তার পুনরায় দার পরিগ্রহ না করার অন্যতম কারণ ছিল। এইজন্য উমার নীরব ধৈর্য্য ও সহ্যগুণে প্রভাকরবাবুর অবর্ত্তমানে যা ঘটতো, তা প্রভাকরবাবু জানতে পারত না। অবশ্য মাঝে মাঝে সন্তানরা এসে বিমাতার প্রতি ঠাকুরমার লাঞ্ছনার কথা প্রকাশ করে দিত। কিন্তু উমা সে অভিযোগকে আমল দিতো না। কথা প্রসঙ্গে তা চাপা দিয়ে জানাতো, বৃদ্ধার ব্যবহারকে শিশুর ব্যবহারের সঙ্গে তুলনা করতে হয়। তিনি গুরুজন মাননীয়া; কিছু যদি গালমন্দ বা অত্যাচার করেও থাকেন, তা নিয়ে কি তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ করা যায়?

উমার চালচলনে গৃহের লক্ষ্মী শ্রী যেন ফিরে এল। সন্তানদের দেহেও যেন পরিচ্ছন্নতার প্রলেপ বুলানো হয়েছে। কিন্তু রুদ্রমূর্ত্তি বিমাতার অত্যাচার দিন দিনই উমার প্রতি বেড়ে উঠেছে। পাড়া প্রতিবেশীরা জানে, উমাও শুনেছে শাশুড়ীর পীড়নে সতীন আত্মহত্যা করেছে। তাই যথা সম্ভব নিজের ধৈর্য্যের বাঁধ সে কখনও ভাঙ্গতে দেয়নি।

সন্তানদের প্রতি উমার স্নেহ, পরিচর্য্যাও শাশুড়ীর মনঃপূত হয়নি। কোন প্রকারেই উমাকে কলহ দ্বন্দ্বে নাবাতে না পেরে অবশেষে শাশুড়ী অন্য পথ নিলেন। সন্তানদের মন বিষিয়ে দিলেন মার বিরুদ্ধে, পিতার বিরুদ্ধে। সন্তানেরা আর উমার স্নেহ, পরিচর্য্যাকে সহজ, সরল ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। সব সময় তাদের মনে সংমার যে ভয়াবহ প্রতিমূর্ত্তি ঠাকুরমা এঁকে দিচ্ছিল,

সেই চিত্র ছাপিয়ে উঠল তাদের মনে। কুটিলা ঠাকুরমার ছলনা সরল বালকবালিকারা উপলব্ধি করতে না পেরে—তারা ঠাকুরমার মন্ত্রণায় সৎমাকে নানাভাবে পীড়ন ও তিরস্কার করতে সুরু করে। অবশ্য প্রভাকরবাবুর সামনে কবতে নিষেধ থাকায়, তাঁর অজ্ঞাতেই শাশুড়ীর ও সতীন পুত্রদের অত্যাচার নীরব অশ্রুবারির মধ্য দিয়ে উমা সহ্য করেছিল।

নিজেব জীবনের প্রতি উমার মায়া মমতা নেই। কিন্তু শাশুড়ীর প্ররোচনায় এই শিশুরা বিপথে যাচ্ছে, এটাই তাকে আঘাত করত। কিন্তু যে শিশুরা এ গৃহে আসার পর তার মনে কত আশার আলো জ্বালিয়ে ছিল,—শাশুড়ীর কুচক্রে তারাই আজ তার সংসার ঘন অন্ধকারময় করে দিচ্ছে। স্বামীর কাছে শিশুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তার বিবেকে বাঁধত। কিন্তু সন্তানেরা বিপথে যায়—তাও সে চায় না। অবশেষে ভগবানই তার সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন শাশুড়ীকে তাঁর কোলে টেনে নিয়ে। সন্তানরা কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ালো বাঁধন ছাড়া মুক্ত বিহঙ্গের মত। তারপর আস্তে আস্তে তারা আবার খাঁচায় প্রবেশ করে—পোষ মানলো।

উমার জীবনের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ যামিনীর অবসান হ'ল। বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে সে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। উমার কোল জুড়ে এল চন্দ্রিকা, চণ্ডালিকা ও চন্দ্র। প্রভাকরবাবুও তার সংসারে প্রভাকরের মতই প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। স্নিগ্ধ শান্তির ছায়া নেবে এল প্রবীণ প্রভাকরবাবুর সংসারে। জীবন সন্ধ্যায় প্রভাকরবাবু এই সর্বপ্রথম জীবনে আনন্দের স্বাদ পেলো। মুখরা প্রথমা স্ত্রী শাশুড়ীর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে—শোধ তুলতো স্বামীর উপর বাক্যবাণে। তাই হতভাগ্য প্রভাকরবাবুর জীবনে শান্তি ছিল না। সেই চির আকাঙ্ক্ষিত শান্তি আবার নেবে এল প্রভাকরবাবুর জীবনের গতি পথে। বিমাতার গঞ্জনা ও প্রথমা স্ত্রীর বিমৃষ্যকারিতায় নিষ্প্রভ

প্রভাকরের প্রভা উদ্দীপ্ত করল উমা। জীবনের যে পথ দুঃখের পাথরে চাপা পড়ে রুদ্ধ হয়ে ছিল—আজ তা যেন বাঁধ ভাঙ্গা খর-স্রোতের মত আনন্দে দুকুল ভাসিয়ে বয়ে চল্ল।

মানুষ যখন হতাশার সৈকতে, দুঃখের মরুভূমিতে বিচরণ করে, তখন তার জীবন তার কাছে বিস্বাদ, বিষাক্ত হয়ে উঠে। জীবন পিঞ্জর হতে প্রাণকে উড়িয়ে দেবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। দুঃখের কাল মেঘে তার জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। অসীমের মধ্যে, অনন্তের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে তার মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠে। জীবনের এই যে নৈরাশ্য—এটাই কাউকে ঠেলে দেয় ধর্মের পথে, কাউকে বা ভাসিয়ে দেয় অধর্মের ভেলায়। দক্ষ কাণ্ডারী না হলে জীবন তরী ডুবে যাবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকে।

প্রভাকরবাবুর জীবনেও যখন তেমনি অশান্তি, নিরানন্দের ঝড় উঠেছিল, তরী যখন তার বার বারই ডুবে যেতে চাইছিল, তখনই ভগবান অন্ধকারে আলোর রেখা ফুটিয়ে তুল্লেন তার জীবনে উমার আগমনে। সেই উমা নিজের অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধির দ্বারা সংসারের রূপ বদ্‌লে দিল। বিমাতার দুর্নাম সে মুছে দিল তার স্বভাবে, ব্যবহারে।

৯

ইতিমধ্যে অনেক জল গঙ্গা যমুনা দিয়ে বয়ে গেছে। দেশেও নানা পরিবর্ত্তন ঘটেছে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেক রদ বদল ঘটেছে। ভারতের একমাত্র সংগ্রামী সংস্থা কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে ভাঙ্গন ধরেছে। বিশিষ্ট অনেক নেতা কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির সঙ্গে ভিন্ন মত হওয়ায় সরে গেছেন। বিপ্লবী দলের তৎপরতাও বেড়ে চলেছে।

দেশের সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশ প্রেম দেখা দিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামকে সকলে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল। দেশের যুবদল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ছুটে এসেছিল। কিন্তু দেশের ঐক্য ভেঙ্গে পড়ল। কেবলমাত্র বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস হ'তে বেরিয়ে এসে নূতন পার্টি গঠন করলেন না। কূট কৌশলী বৃটিশ শাসক দেশের একতা নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে মহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে "মুসলীম লীগ" নাম নিয়ে একটা নূতন পার্টি গঠন করিয়ে মুসলীম সম্প্রদায়কে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করতে কৃতকার্য্য হয়েছে।

তারপর বৃটিশ শাসক গুষ্ঠি ভারতীয়দের তুষ্ট করবার জন্য কিছু কিছু শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে দিল বটে, কংগ্রেস এতে তুষ্ট হলেও সুভাষ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই ধরণের ক্ষমতার হস্তান্তরের নীতি মেনে নিতে রাজী হলেন না। তাঁরা দাবী করলেন পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা। এই প্রকারে কংগ্রেস নেতৃত্বে অর্ন্তদ্বন্ধ এমন দানা বেঁধে উঠল যে—অনেক নেতাকে কংগ্রেস সংস্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছিল। যেমন দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টি গঠন ও সুভাষ বসুর ফরোয়ার্ড ব্লকের জন্ম। অন্যদিকে যুবশক্তি সশস্ত্র বিদ্রোহের জীগির তুল্লে,—যার বাহ্যিক অভিব্যক্তি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ভগৎ

সিংদের লাহোর ষড়যন্ত্র বা মীরাট ষড়যন্ত্র বা কাঁকোরী ষড়যন্ত্র ইত্যাদি।

নেতা বা কর্মী নির্বিশেষে সকলকে কারারুদ্ধ করা হলো। এ সময় গোটা ভারতবর্ষ একটা কারাগারে পরিণত হলো, যুবশক্তির উষ্ণ শোণিত এই পূণ্যভূমির প্রতি ধূলিকণা সিক্ত করে দিলে। নেতা বা কর্মীবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করেও বৃটিশ শাসক স্বাধীনতার সংগ্রামের আগুন নিভাতে পারলো না। চাপা আগুনের মত স্বাধীনতার আগুন ভারতবর্ষের প্রতি সহরে প্রতি গ্রামে প্রতি ভারতবাসীর বুকে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল অবধি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো ইউরোপে, হিট্‌লার বীরদর্পে ইউরোপে দেশের পর দেশ জয় করতে লাগল অমিত বিক্রমে। বৃটিশ সিংহ হিট্‌লারের বোমার আঘাতে জর্জ্জরিত। উত্তর পুর্বে রাশিয়া খর কৃপাণ হাতে হিট্‌লারের বিষ দাঁত উৎপাটন করবার জন্য সর্বপ্রকারে প্রস্তুত।

সেই সময় ভারতের নেতৃবৃন্দ দ্বিধায় বিভক্ত হলো। গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই সময় বৃটিশ শাসককে বিব্রত করতে ইচ্ছুক হলেন না। অন্য দিকে সুভাষ চন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বৃটিশ সিংহকে আঘাত করবার এই প্রকৃষ্ট সুবর্ণ সুযোগ বেছে নিলেন।

সুভাষ চন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে এই সময়ে বন্দী করা হলো। স্বাস্থ্যের অজুহাতে সুভাষ চন্দ্রকে তাঁর নিজ গৃহে অন্তরীণ করা হলো। একদিন সুভাষ চন্দ্র শিবাজীর মতই শত্রু চক্ষুর অন্তরালে ছদ্মবেশে বৃটিশ সরকারের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে আপন বাসস্থান হতে অন্তর্হিত হলেন।

তিনি ছদ্মবেশে নানা দেশ পর্য্যটন করে অবশেষে জার্ম্মানী, তারপর জাপানে উপস্থিত হলেন। জার্ম্মানীতে বন্দী বৃটিশ শিবিরের ভারতীয় সৈন্যদের হিট্‌লার সুভাষ চন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করলেন। তাদের

দিয়ে তিনি গঠন করে ছিলেন "আজাদ হিন্দ ফৌজ" বা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক দল। জাপানে রাসবিহারী বসুও সুভাষ চন্দ্রকে তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ সরকার গঠনে সহায়তা করে ছিলেন।

বর্মা ও আসাম সীমান্তে নানা দেশের মধ্য দিয়ে এই ফৌজ এগিয়ে চলেছিল দিল্লীর লাল কেল্লায় স্বাধীনতার পতাকা উড়াবার জন্য। মাঝপথে কোহিমায় সুভাষ চন্দ্রের সেনার অগ্রগতি প্রতিহত হলো। অন্যদিকে জার্ম্মান যুদ্ধের মোড় বিপরীত দিকে ফিরে গেল। মিত্রসেনা জার্ম্মানী দখল করল। জাপানও আমেরিকার পদানত হলো। সুভাষ চন্দ্র তখন অন্তর্দ্ধান করলেন। আজও তাঁব সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বৃটিশ সরকার একদিকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে দেখেছে "আজাদ হিন্দ ফৌজের" অমিত বিক্রম, অন্যদিকে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে নৌ-সেনা বিদ্রোহে বৃটিশের সিংহাসন কেঁপে উঠল লণ্ডনে। বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করতে পারলো ভারতের উপর এই ভাবে আর রাজত্ব করা সম্ভব নয়। ঘুমন্ত ভারত প্রবল বিক্রমে জেগে উঠেছে। কিছু দিয়ে তাকে তুষ্ট না করলে হয়ত তামাম বৃটিশ সাম্রাজ্য সে নাড়িয়ে দেবে। তাই কুট কৌশলী বৃটিশ সরকার ভারতকে দ্বিধা খণ্ডিত করে একটি মুসলীম রাজ্য, অপরটি ভারত রূপে স্বাধীনতার চিরকুট দিয়ে গেল। বাহ্যিক জগতের সামনে বৃটিশ প্রমাণ কর'ল বিনা রক্তপাতে ভারত স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু বস্তুত, আই, এন, এ, নৌ-সেনার ও যুব দামালদের উষ্ণ রক্ত বিনিময়ে এসেছিল স্বাধীনতা।

দ্বিখণ্ডিত ভারতকে আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কতিপয় নেতা মেনে নিলেন। পাকিস্থান হ'তে উদ্বাস্তুর ভীড় জমতে লাগল। পশ্চিম পাঞ্জাবে সম্পত্তি বিনিময় ও সম্প্রদায় বিনিময় হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব বঙ্গে যারা ছিন্ন মূল হয়ে ভারতে এসে বসতি স্থাপন করতে

চান্‌নি—পাকিস্তান ভারতের উপর চাপ দেবার জন্য প্রায়ই জেহাদের জীগির তুলে সেই সব হিন্দুদের পীড়ন সুরু করে দিল। ফলে যাঁরা জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে আসতে চান্‌নি—তাঁদেরও শেষে সর্বস্বান্ত হয়ে এক বস্ত্রে এসে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিতে হোল।

মানুষ হারালো মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা। ধর্ম কর্ম মুছে গেল মানুষের জীবন থেকে। কালোবাজার মানুষের মধ্যে জাগালো লোভ। বিদ্যা, বুদ্ধি, ন্যায়, ধর্ম, বয়স কোন কিছুই সমাজে পূজ্য নয়। একমাত্র যেন তেন প্রকারেণ অর্থ আহরণ জীবনের লক্ষ্য ও কাম্য বস্তু। এমন ব্যক্তিই—যত দুশ্চরিত্রই হোক্ না কেন সমাজে বা দেশে পূজনীয় বরণীয় হয়ে উঠল। সাধু সজ্জন নির্য্যাতিত, নিপীড়িত, হাস্য কৌতুকের বস্তুতে পরিণত হ'ল।

তাই মানুষও অনলে পতঙ্গ যেভাবে ছুটে—সেইভাবে ন্যায় ধর্মের পথ ত্যাগ করে অর্থের খনির সন্ধানে দিন রাত্রি পাগলের মত ছুটে চলেছে। এজন্য নিজের বিবেক বিক্রি করছে, বিক্রি করছে কন্যা বা স্ত্রীর সতীত্ব। তবু সমাজে নিজেকে বিত্তবান বলে জাহির করতে হবে। বিত্তশালী খেতাব পেতে হবে। তাই নরকের পথে নেবে হলেও—গর্হিত অপরাধের বিনিময়ে হলেও মানুষ ধনের পিছনে ছুটেছে।

ফলে দেশে ধর্ম পরিত্যক্ত। নারীরা আদর্শ ভ্রষ্টা। কিশোর; যুবক সম্প্রদায় অপরাধ প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। প্রবীণরা দুই চোখ বন্ধ করে গর্হিত কাজে অর্থোপার্জ্জনে নিজেকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা যাবতীয় আকর্ষণের সূত্র ছিঁড়ে গেছে। সমবেদনা বা সহানুভূতি মুছে গেছে মানব হৃদয়ে। পরন্তু মানুষের মনে দু'টি বৃত্তিই সর্বাপেক্ষা প্রকট হয়ে উঠেছে—ঈর্ষ্যা ও লোভ।

তাই যে যত ধন সঞ্চয় করছে—সম্পদের চাহিদা তার তত বেড়ে যাচ্ছে। মানব সমাজে বা দেশে নিজেকে পূজনীয় বরণীয় করবার

জন্য অর্থের জন্য ঘোড়দৌড়ে ছুটেছে। বিবেককে রুদ্ধ না করলে আধুনিক সমাজে ধনী হওয়া যায় না। তাই ধনীর মধ্যে বিবেকের লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। যে যতবড় ধনী তার গৃহে তত অশান্তির ঢেউ দেখা দিয়েছে।

স্বামী স্ত্রী উভয়েই অর্থোপার্জ্জনে সচেষ্ট। তাই কে কত নীচে নেবে যাচ্ছে এজন্য—সন্তানদের সামনে কি কুৎসিত দৃষ্টান্ত তারা তুলে ধরছে! সবই ভুলে যাচ্ছে। তদুপরি পরস্পরের প্রতি নেই বিশ্বাস, প্রেম, আস্থা—পরস্পব পরস্পরকে সন্দেহ করে। ঘৃণা করে। তাই গৃহের পরিচারক পরিচারিকা সন্তানদের সামনেই চলে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের নোংরা উক্তি ছোড়াছুড়ির খেলা। পরিণামে অল্প বয়স হতে সন্তানরাও বিপথে যাওয়াকে পাপ মনে করে না। শাসন করবে কে? যাদের শাসন করে সন্তানদের সৎ ও সাধু পথে চালিত করার দায়িত্ব—তারাই তো ভাসিয়েছে নিজেদের জীবন তরী পাপ ও অধর্মের ক্লেদাক্ত পথে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও স্বাধীনতা উত্তর ভারতের সামাজিক চিত্র হলো এরূপ। সমাজের নিম্ন শ্রেণী হতে উচ্চতম শ্রেণীর সকলেই ভেসে চলেছে অধর্মের ভেলায়, পাপের তরীতে পাল তুলে। তাই উৎকচ গ্রহণ করার নাম হয়েছে উপরি পাওনা। কালোবাজারী যে করে—জাহির করতে সে সঙ্কোচ বোধ করে না।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতকে শাসন করেছে একটানা কংগ্রেস। কংগ্রেস শাসন কালে যারা গদীতে বসেছে—প্রাক্ স্বাধীনতা ইতিহাসে তাদের অনেকের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের অবদান আছে বা যে সব পরিবার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে লাঞ্ছিত হয়েছে বা সর্বস্ব হারিয়েছে—তারা আজ ডুবে গেছে স্বাধীনতা উত্তর ভারতে। তাদের সেই অবদানের স্বীকৃতি পর্যন্ত আজ নেই।

কালো বাজারে বা অন্য উপায়ে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স যাদের স্ফীত হয়েছে—তারাই আজ গদীর মালিক। দেশের জন্য বা জনসাধারণের জন্য তারা নয়। যে যার নিজের চৌদ্দ পুরুষকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেবার জন্য সঞ্চয় করে যাচ্ছে। দরিদ্র ভারতবাসীর, মুনি ঋষির পদরেণুর দ্বারা পবিত্র করা এই ভারতভূমি আজ কেবল মাত্র গদীব অধিকারী মুষ্টিমেয় নেতৃবৃন্দের ভোগ্য।।

বছরে বছরে নিত্যি নূতন করের ভারে দরিদ্র অনাহার, অর্দ্ধাহারে ক্লিষ্ট ভারতবাসী নুব্জ হয়ে পড়ছে। বিদেশ হতে কোটি কোটি টাকা ঋণ আসছে। কিন্তু দূর্ভাগ্য ভারতের অবস্থা, ভারতবাসীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। রাস্তা, ঘাট, ট্রেন, ষ্টীমার, প্লেন কোথাও আজ নিরাপদে চলাচল সম্ভব নয়—প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার জন্যে। খাদ্য বস্তুর দাম আকাশ ছোয়া হয়েছে। বহু খাদ্যই খোলা বাজার হ'তে উড়ে গিয়ে কালো বাজারে ভীড় করছে —যার মূল্য জনসাধারণের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। দিতে পারে কেবল তারাই যারা কালো টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি অফিস আজ নানা দোষে দুষ্ট হয়েছে।

মানুষের অনেক আশা, বহু দিনের ঈপ্সিত স্বাধীনতার পরিণতিতে ভারতবাসীরা দেখছে আজ তাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই, পরিধেয় বস্ত্র নেই, পেটে অন্ন নেই। রোগীকে নির্ভেজাল ওষুধ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। শিশুর খাদ্যে পর্য্যন্ত ভেজাল। অথচ অপরাধী দণ্ডিত হচ্ছে না। পরন্তু অপরাধীর সমাজে মান, সম্ভ্রম বাড়ছে, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়ছে, মরছে জনসাধারণ। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানাবে কার কাছে? সবাই যে এক পথের পথিক, কার বিচার কে করবে?

তাই ভারতবাসীর মনে আজ কেবল আক্ষেপেব বীণা ঝঙ্কৃত হচ্ছে। বিদেশীর শাসনে ধর্ম, বস্ত্র, অন্ন নষ্ট হয়নি। মাথার উপর ছিল একটু আচ্ছাদন। আজ যে কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু

সুবিচারের আশা দীর্ঘ বিশ বছরে কংগ্রেস শাসনে কোথাও মেলেনি। তেমন প্রত্যাশা করাও মূঢ়তার নামান্তর মাত্র। বিশ বছরে সাধারণ মানুষ গরীব হতে গরীবতর, গরীবতম হয়েছে। আর মুষ্টিমেয় ধনী যেন তেন প্রকারণে তাদেব ধন সম্পদ কম্পাউণ্ড ইন্টারেস্টে বাড়িয়ে চলেছে।

১০

মানুষের আদালতে রবির জয় হয়েছিল। আইনের চোখে রবি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হয়ে বেকসুর খালাস পেয়েছিল। কিন্তু রবি তার বিবেকের আদালতে পরাজিত হয়েছে। যে হিংসাত্মক কাজ সে করেছিল—তার জন্য তাকে মাশুল দিতে হ'ল। বিবেকের দংশনে সে হারালো তার জ্ঞান, বুদ্ধি। তার হলো মতিভ্রম। তাই রবিকে 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' এ আটক রাখা অবস্থাতেই স্থানান্তরিত করতে হয়েছে রাঁচীর পাগ্‌লা গারদে।

রবি পাগল হয়ে যাওয়ায় সমরবাবু ও সুতারা খুবই আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু বিধির বিধান কেউ তো খণ্ডাতে পারে না। তাই রবির বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। রবিকে ঘিরে সমরবাবুর যে স্বপ্ন ছিল,—তা ভেঙ্গে গেল। কারো প্রতি আর তিনি আস্থা রাখতে পারলেন না। মানুষের অতি বিশ্বাসের স্থানে যখন ঘা পড়ে, তারপর মানুষ আর কিছুতেই কারও প্রতি আস্থা রাখতে পারে না।

ছেলেরা সকলেই স্বাবলম্বী হয়েছে। সমরবাবুও কারও মুখাপেক্ষী নন্‌। তিনি কলকাতায় স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর নিজস্ব গৃহে বসবাস করছেন। মফঃস্বলে আত্মীয় পরিজন হ'তে দূরে তাঁরা শান্তিতেই ছিলেন।

কলকাতা মহানগরীর বুকে এমন একটা পরিবেশ যে মফঃস্বলের আন্তরিকতা, হৃদ্যতা সেখানে নেই। মহানগরীর মতই এখানকার মানুষের হৃদয়ও যেন পাথরে তৈরী। তাই পাশের কক্ষের বা ফ্ল্যাটের বাসিন্দার জন্য পাশের প্রতিবেশীর নেই সহানুভূতি বা সমবেদনা। কেউ কারোর পরিচয় জান্‌তে উৎসুক নয়। যদিও পরস্পর পরস্পরের হাঁড়ির খবর সংসারের খুঁটি নাটি সব খবরই রাখে।

ঝি, চাকর মারফৎ। কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে অন্তরঙ্গতা করতে চায় না। তাই এই ফ্ল্যাটে যখন মৃত্যুর দূত এসে সমস্ত পবিবারকে শোকাচ্ছন্ন করে, ঠিক সেই সময়ই পাশের ফ্ল্যাটে চলেছে রেডিও বা রেডিওগ্রামের উচ্চগ্রামে সিনেমার নানা গান। কোথাও কোথাও আবাব লাউড স্পীকার সংযোগে সমস্ত পাড়াকে মাতিয়ে রেডিও প্রোগ্রাম চলে। প্রতিবেশী কে অসুস্থ, কাব মনে বিষাদের ছায়া পড়েছে—তা জানবার বা বুঝবার প্রয়োজন কোন প্রতিবেশীর নেই। তাই হাসি কান্নার তরঙ্গ ছুটে চলে পাশাপাশি।

পাশ্চাত্য অধিবাসীরা বা শাসক গোষ্ঠি যদিও এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু তাদেব আবহাওয়া এখনো বেশ প্রবহমান এ দেশের বুকে এবং আমাদেব দৈনন্দিন জীবনে তাব আমেজ এখনো বেশ প্রকট। তাই প্রতিবেশীর সঙ্গে হৃদ্যতা বা আলাপ করা সেকেলে মনে কবে। নিজেকে ছোট করা হবে ভেবে কেউ উপযাচক হয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করে না। তাই প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি, সমবেদনাব প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু আমরা তো সত্যিকার পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হতে পারিনি। যদি সেই চেতনা আমাদের মধ্যে থাক'ত তবে বিদেশীদের মত অন্যের বিরক্তির কারণ ঘটাবার জন্য উচ্চগ্রামে রেডিও বা রেডিওগ্রাম চালানো হোত না।

অবশ্য যারা অতটা পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পাবেনি, তারা উপযাচক হয়ে আলাপ কবতে গিয়ে পায় "কোল্ড রিসেপ্‌সন", অথবা আলাপের পরিণতি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীর দৌরাত্ম্যে পাড়া বদলাতে বাধ্য হয়। সময় অসময় এটা সেটা ধাব তো সাধারণ কথা। তদুপরি নিজের মান সম্ভ্রম বন্ধু ও আত্মীয় গোষ্ঠীর কাছে বাডাবার জন্য প্রতিবেশীর আসবাব পত্র বা বাসনপত্র নিয়ে এনে তা নষ্ট করা, প্রতিবেশীর ফোনে রাতদিন প্রতিবেশীর ছেলে মেয়েরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোন করে চলেছে—হয়ত মালিকের প্রয়োজনীয় ফোন 'রিসিভ' করা সম্ভব হয় না—শুধু

প্রতিবেশীর পুত্র কন্যারা নয়, তাদের বন্ধু বান্ধবরাও এসে বিনে পয়সায় নিরীহ ভদ্রলোকের ফোন নিয়ে যত্র তত্র তাদের "ফিঁয়াসীদের" কাছে ফোন করে চলেছে—ইত্যাদি নানা রকম উপদ্রব নিরীহ প্রতিবেশীকে সহ্য করতে হয়। কোন ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে গেলে এ হেন প্রতিবেশীর কাছে হ'তে হয় লাঞ্ছিত। শিক্ষিত ভদ্র নিরীহ প্রতিবেশী সমান তালে পা ফেলে প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহ করতে বা যুঝ্‌তে পারে না। এবং যে প্রতিবেশী এতদিন স্বচ্ছন্দে নিরীহ প্রতিবেশীটির উপর উপদ্রব চালাচ্ছিল, তার উপদ্রব ও শত্রুতা এমন চরমে গিয়ে পৌঁছায় যে প্রাণের ভয়ে, মানের জন্য প্রতি-বেশীকে বাড়ী বদল করতে হয়। অত্যাচারী প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীর থেকে আর কোন সুযোগ সুবিধা গ্রহণের সুযোগ না পেয়ে—প্রতিবেশীকে পরোক্ষে নানাভাবে হেনস্তা করতে চেষ্টা করে।

প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যে কুৎসা বদনাম রটাতে থাকে। প্রতিবেশীর ঝি চারককে প্রতিবেশী ঠিকমত বেতন দেয় না ইত্যাদি বলে তাদের ভাগাতে থাকে। আরও নানাভাবে—প্রতিবেশীর গৃহে ময়লা ফেলে বা নিজে কলেব জলের অপচয় করে—প্রতিবেশীব জলাভাব ঘটিয়ে ইত্যাদি নানভাবে প্রতিবেশীকে বিব্রত করে তুলে যা'তে প্রতিবেশী প্রাণের, মানের ভয়ে ঐ পাড়া ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

আর উভয় পক্ষই যদি সমকক্ষ হয়, তবে কোর্ট, কাছারী, মামলা মোকদ্দমা হয়ে দাঁড়ায় অবশ্যম্ভাবী ফল। যে পক্ষ যত বেশী টাকা থানার অফিসারদের দক্ষিণা দিতে পারবে, থানা তার ডাকে তত তৎপর হয়ে ছুটে আসবে, এবং অপর পক্ষের গ্লানির আর সীমা পরিসীমা থাকে না। এটাই কলকাতা মহানগরীর প্রতিবেশীব ইতিকথা।

কলকাতায় আত্মীয় স্বজনের খোলসও যায় বদলে। নিজেদের

প্রাধান্য, সম্পদ প্রতিপত্তি জাহির করতেই তারা তৎপর। বাহ্যিক আড়ম্বর তাদের যথেষ্ট। ভিতর ফাঁপা। জৌলসের যুগ এটা। তাই যার পেটে দু'বেলা অন্ন পড়ে না, অভাব, অনটন যার নিত্য সহচর, তার গৃহের আসবাব পত্র ও তাদের পোষাক পরিচ্ছদ হতে বুঝবার উপায় নেই—এরা সম্পন্ন নয়। এই সব তথা কথিত ঠক্ সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাইরের ঠাঁট বজায় রাখবার জন্য মহানগরীর বুকে তেমনি ব্যবস্থাও আছে। আসবাবপত্র ভাড়া পাওয়া যায়। আসবাব পত্রের ভীড়ে ডুবে গৃহস্বামী ঐ সমস্ত দামী আসবাব পত্রের নকল মালিক সাজে। তেমনি পোষাক পরিচ্ছদ, ঝুটো অলঙ্কার সবই ভাড়া পাওয়া যায়। এবং এই ভাড়া করা পরিচ্ছেদে নিজেদের সাজিয়ে অনেক তথা কথিত পরিবাব ভূয়া আভিজাত্যের ভণিতা করে থাকে। এ হ'ল তাদের বাহ্যিক আড়ম্বর বা সজ্জার গুপ্ত কাহিনী।

নিরীহ কোন আত্মীয় যদি মফঃস্বল হ'তে মহানগরীতে এসে বাসা বাঁধে, আত্মীয়ের সর্বপ্রথন কাজ হ'বে খোঁজ নেওয়া কতটা সম্পদ তিনি সঙ্গে এনেছেন। যদি জানা যায়, তেমন কিছু তিনি সঙ্গে আনতে পারেন নি, তখন নিত্য রোজ ভাড়া করা, ধার করা পোষাকে, অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে তারা আসবে এবং নানা ধন সম্পদের গল্প, পুত্র কন্যাদের নানা গুণপণার কাহিনী শুনিয়ে যাবে। আর যদি জানতে পারে যে আত্মীয় ধন সম্পদ নিয়েই মহানগরীতে এসেছেন, প্রথমতঃ চেষ্টা করা হবে নানা ভাবে তাকে প্রবঞ্চিত করে, তাঁর অর্থের মোটা অংশ আত্মসাৎ করা যায় কিনা। যদি দেখা যায় গৃহস্বামী নিরীহ, কিন্তু বুদ্ধিমান, তখন সুরু হবে নিত্যি নূতন উপায়ে তাঁর পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করা। যেমন হয়ত সেই আত্মীয়ের ছেলেদের প্রতি মেকী স্নেহ ও দরদ দেখিয়ে—তাদের মনে নানাভাবে তাদের পিতা মাতা বা সেই আত্মীয়র বিরুদ্ধে তাদের কাণে বিষ ঢালা। ফল যে একেবারেই হয় না—তা নয়। দূরদর্শিতার অভাবে অনেক সময়েই সরল ছেলেমেয়েরা এইসব কূট

আত্মীয়দের প্রবঞ্চনায় ভুলে নিজের প্রিয় মা বাবাকে ভুল বোঝে,—তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে, পরিবারে শান্তির ব্যাঘাত ঘটায়। এই ভাবে নিরীহ আত্মীয়র সঙ্গে তারা নব আত্মীয়তার সূত্রপাত করে। একদিকে সন্তানদের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে গৃহের শান্তি নষ্ট করে,—অন্যপক্ষে তারাই ভাল মানুষ সেজে এসে আত্মীয়কে সমবেদনা জানিয়ে উপহাস করে।

আত্মীয় আত্মীয়ের ভাল দেখতে পাবে না, শুনতে পারে না। যদি আত্মীয়েব সন্তানেরা ভাল থাকে,—তাদের নানাভাবে প্রলুব্ধ কবে ঠেলে দেয় নবকের পথে। সব চেয়ে বেশী শত্রুতা তারা করে থাকে, যেসব আত্মীয়ের থেকে তারা উপকার পেয়েছে। কারণ উপকারীর সামনে নিজেকে সর্বদাই ছোট মনে হয়। তাই নিজের সেই হীনতা থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যই নানাভাবে আত্মীয়ের শত্রুতাচারণ করে থাকে পরোক্ষে। আত্মীয়ের নামে মিথ্যে নিন্দা, কুৎসা রটিয়ে থাকে। যে প্রকারে সম্ভব আত্মীয়ের ক্ষতি করতে পারলে বা শান্তি নষ্ট করতে পারলেই যেন সুখ অনুভব করে থাকে। আধুনিক আত্মীয়দের এটাই রীতি।

সমরবাবু ও সুতারাব অদৃষ্টেও তেমন আত্মীয়ের অভাব ছিল না। প্রথমতঃ যদিও সমরবাবু দার্ঘকাল সরকারী উচ্চ পদস্থ অফিসার ছিলেন, কিন্তু কলকাতা মহানগরীতে তাঁর কোন বাড়ী না থাকায়, তিনি তথা কথিত বড়লোক সম্ভ্রান্ত আত্মীয় সমাজে পংক্তি পান্‌নি। অবশ্য সমরবাবুর মত উদারচেতা, স্বাবলম্বী নির্ভীক লোক কোন আত্মীয়কে কখনও তোষামোদ করতেও যান্‌নি। পরন্তু তিনি সবার থেকে বরাবর নির্লিপ্ত থাকতেই বেশী ভালবাসতেন। তাই আত্মীয়দের আক্রোশটাও তাঁর প্রতি বাড়ন্তই ছিল। যদিও বিপদ আপদে আত্মীয়রা অর্থ সাহায্য ও নানা ভাবে বরাবর তাঁর সহায়তা নিয়ে গেছেন।

সমরবাবুর নিজের মা, বাবা, ভাই, বোন কেউই জীবিত ছিল না,

কিন্তু সমরবাবুর একমাত্র দাদা, হিমাংশুর পিতাও কয়েকবছর হ'ল সমরবাবুর বাড়ীতেই মারা গেছেন। সুতরাং ভাগ্নে, ভাইপো ছাড়া তাঁর নিকট আত্মীয় তাঁর দিকে আর কেউ ছিল না।

সুতারার দুই দিদি ছিল। সুতারা তার দিদিদের তুলনায় নিজেও লেখাপড়া বেশী করেছেন, সমরবাবুও অন্যান্য জামাইদের তুলনায় অধিকতর শিক্ষিত ও রোজগারী। সুতারার দিদিদের সুতাবাব বাবা ধনী শ্বশুরের একমাত্র পুত্র দেখে বিয়ে দিয়ে ছিলেন। সুতরাং স্বামীকে নিয়ে সুতারার যেমন গর্ব করবার মত অনেক কিছুই ছিল—রূপ, বিদ্যা, যশ, ধন, ভগ্নীপতিদের নিয়ে দিদিদের গর্ব করবার মত কিছুই ছিল না। অবশ্য তবু সরলা, সচ্চরিত্রা, সুগৃহিনী সুতারা কখনও কিছু নিয়ে গর্ব করেনি। পরন্তু নিজেকে তিনি শামুকের মত গুটিয়ে রাখতেন। তাঁর আড়ম্বরহীন সরল, সহজ জীবন তাঁর দিদিদের আলোচনার বিষয় ছিল।

দিদিদের ধারণা ছিল সমরবাবু ভাইপো, ভাগ্নে, দাদাকে প্রতি-পালন করতে গিয়ে সুতারার প্রতি অবিচার করেছেন। তাই সুতারা নিত্যি নূতন অলঙ্কারের জৌলস থেকে বঞ্চিত। তাদের স্বামীদের বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, আয় সুতারার স্বামীর থেকে কম হওয়া সত্বেও বেশী সুখী, তাই কারণে অকারণে তারা সুতারাকে নানাভাবে ব্যঙ্গোক্তি করতে কুণ্ঠা বোধ করত না।

সুতারা কিন্তু কখনই মুখ ফুটে তাদের ধারণা যে সত্য নয়, তারও যে ঐশ্বর্য্যের অভাব নেই, তা প্রকাশ করত না। পরন্তু নীরবে সহাস্য মুখে উত্তর দিত—"বাহ্যিক আড়ম্বর নাই বা রইল। আমার সব ছেলেরা মানুষ হোক, সেটাই আমার আনন্দ। আমার মৃণ্ময়, হিমাংশু, রবি, কবি, তন্ময়, এরা পাঁচ ভাই মানুষ হয়ে উঠুক। এরাই তো আমার অলঙ্কার। অলঙ্কার দিয়ে আমার কি হবে? মেয়ে তো নেই। বৌরা যখন আসবে, তাদের তখন সাজিয়ে দেব অলঙ্কারে। ছেলেদের মা হয়ে নিত্যি নূতন অলঙ্কার পরে বেড়াতে

আমার লজ্জা করে। ছেলেরা তবে আমাকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না। তাই আমার অন্য গয়নার প্রয়োজন নেই। এই পাঁচটি রত্নই যে আমার সাত রাজার ধন।"

উত্তর শুনে দিদিরা মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে 'সঙ্গতি নেই মুখ ফুটে তা প্রকাশ করবে না—বলে কিনা প্রয়োজন নেই। কোন মেয়ের আবার সাজসজ্জায় অরুচি, অলঙ্কারে বিতৃষ্ণা ? ভগবান মেয়েদের তো রূপ দিয়েছেন তা সাজিয়ে আর দশজনের সামনে প্রকাশ করার জন্য।' সুতারা তার দিদি সুনয়না ও মেজদি সুচারু হতে অধিকতর সুন্দরী। তাই দিদিরা মনে মনে ভাবতো রূপের ডালি, রং এর জৌলস থাকা সত্ত্বেও সুতারা স্বামীর স্বার্থের জন্য নিজের ভোগ, বিলাস সব ত্যাগ করেছে। কি বোকা মেয়ে সুতারা! কি দরকার তার এতগুলি ছেলের দায়িত্ব নেওয়া। সুতারা যদি আপত্তি করত তবে সমরবাবু কখনও ভাগ্নে ভাইপোদের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতেন না। অনাথ আশ্রমে তাদের পাঠিয়ে দিয়েই তো সব দায়িত্ব শেষ করা যেতো। তা নয়, বোকার মত সমানভাবে নিজের ছেলের সঙ্গে এদের মানুষ করার কি প্রয়োজন ?

একই মায়ের সন্তান সুনয়না, সুচারু ও সুতারা। মায়ের তিন মেয়ে। অথচ এদের রুচি, প্রকৃতির মধ্যে এত তফাৎ যে দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না এরা সহোদরা তিন বোন। পোষাকে পরিচ্ছদে, চলনে বলনে এদের মধ্যে এত পার্থক্য।

সুতারার হিমালয়ের মত গাম্ভীর্য্য, সমুদ্রের মত সৌম্য প্রশান্ত চেহারা, মহাকাশের মত ধীর, স্থির, উদার রূপ—দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা আপনা হতে নুয়ে আসে। তারই পাশে নদীর উচ্ছ্বাসের মত সদা সর্বদা উচ্ছ্বাস আবেগে ভরা, অফুরন্ত বাক্য বিন্যাসে পটিয়সী, অতিরঞ্জনে ওস্তাদ, বেশে বাসে চাকচিক্য—সব মিলিয়ে সুনয়না ও সুচারুকে ধনী গৃহিণী বলেই মনে হয়—যাদের মধ্যে নেই কোন মায়া বা মমতা। সদা উন্নাসিকা। আত্মপ্রশংসা, আত্মজনের কথায় মুখর।

১১

সমরবাবুর কলকাতার পার্ক সার্কাসের বাংলো প্যাটার্নের বাড়ীখানা আত্মীয়দের চক্ষুঃশূল। তাছাড়া সি, আই, টি রোডেও তাঁর একটা বড় বাড়ী তাঁর পাকিস্তানের বাড়ীর সঙ্গে বদল করে পেয়েছেন। সেই বাড়ী হতে আয়ও কম নয়। তাছাড়া হাইকোর্টে সমরবাবুর এরই মধ্যে নাম ডাক হয়েছে।

সুনয়না ও সুচারু যেন সুতারার এতটা ঐশ্বর্য্য আশা করেনি। পরন্তু তাদের কারো শ্যামবাজারের পৈত্রিক যুগের সেকেলে বাড়ী, কারো বউ বাজারের শ্বশুরের আমলের পুরানো ফ্যাসানের বাড়ী সুতারার অত্যাধুনিক ফ্যাসানের বাড়ীর পাশে নিষ্প্রভ। মনে মনে ঈর্ষ্যার আগুনে দুই বোন জ্বলতে থাকে। সুনয়না নিঃসন্তান। সুচারুর ছেলে মেয়েরা মা মাসীর মত বাইরের আড়ম্বরে টয়টম্বুর। কিন্তু সরস্বতী দেবীর সঙ্গে তাদের বনিবনা ঠিক হয়নি। তাই এক একজনকে এক একটি ক্লাসের মায়া ছাড়াতে বেশ সময় লেগেছে। অবশ্য সোসাইটিতে মেলামেশার যাবতীয় গুণাগুণ সবই তারা রপ্ত করেছে।

সুনয়নার পক্ষপাতিত্ব সুচারুর প্রতি চিরকাল। কারণ সুতারাকে যেমন সে ঈর্ষ্যা করে তার স্বামীর রূপ, গুণ, বিদ্যা, অর্থের জন্য, তেমনি সহ্য করতে পারে না সুতারার বিদ্যানুরাগী ছেলেদের। তাই অকারণে সুচারুর সন্তানদের সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করে সুতারা ও তার সন্তানদের সামনে।

এই কয়েকটি বছরের মধ্যে সমরবাবুর পরিবারেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। রবি রাঁচীর পাগলা গারদে। মাঝে মাঝে সুতারা ও সমরবাবু গিয়ে তাকে দেখে আসেন।

মৃন্ময় কলকাতায় প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করেছে। সুতারার বাল্যবন্ধু উমার মেয়ে চন্দ্রিকার সঙ্গে মৃন্ময়ের বিয়ে হয়েছিল, চন্দ্রিকা আই, এ পাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে। হিমাংশু এখন "চিফ্ ক্যামিষ্ট"। সে বিয়ে করেনি। তন্ময় বি, এস, সি পাশ করে মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে। সে হাজারীবাগে একটা কোলিয়ারীর ম্যানেজার। তন্ময় হাজারীবাগে চাকরী করতে এসে—তার 'বস্' চীফ্ ম্যানেজার মিষ্টার শিবদেশানীর মেয়েকে বিয়ে করে মা বাবার অমতে। অবাঙ্গালী বিয়েতে সমর-বাবুর আপত্তি ছিল না। কিন্তু তিনি অনুসন্ধান করে মেয়েটি সম্বন্ধে যা জেনেছিলেন তেমন সোসাইটি গার্লকে নিয়ে তন্ময় সুখী হবে না এই আশঙ্কায় তাঁরা এই বিয়েতে সায় দিতে পাবেননি। কিন্তু আধুনিক সন্তানদের বিয়েতে মা বাবাব মতামতটা হ'ল সেকেণ্ডারী।

পরন্তু সুনয়না যখন জানতে পারল তন্ময়ের বিয়েতে সুতারার মত নেই, তখন সুনয়না উপযাচিকা হয়ে তন্ময়ের বিয়ের সব কর্ত্তৃত্ব করে—তন্ময়ের বিয়ের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করল এবং তন্ময় তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকলো।

কবি বি, এস, সি পাশ করে হয়েছিল "মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। কবিও প্রেম করে বিয়ে করেছিল সহপাঠী একটি খৃষ্টান মেয়েকে। মামা মামীর অনুমতির প্রতীক্ষা না করেই বিয়ের পব সমাধা করে সে তাঁদের জানিয়েছিল। মামা মামীর থেকে কোন জবাব সে পায়নি। আশাও করেনি। এখানেও সুনয়না যথেষ্ট মদৎ জুগিয়েছে সুতারার অবর্ত্তমানে। কোন ব্যাপারই সুনয়না ঢেকে বাখতে পাবেনি। সমরবাবু ও সুতাবার কাছে সব ঘটনাই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

হিমাংশু সবার সব ব্যাপাব দেখে নীরব রইল। মৃন্ময় বড় মাসিকে এভাবে ভাইদের বিপথে চালিত করার জন্য দোষারোপ করতে যেয়ে সে নিজেও মাসির কুহক জালে জড়িয়ে পড়'ল। ক্রমেই বড়মাসির বাড়ীতে মৃন্ময়ের আনাগোনা বাড়তে লাগল সবার অলক্ষ্যে।

প্রথম প্রথম চন্দ্রিকার কাছে মৃন্ময় তা প্রকাশ করতো। কিন্তু যখন মৃন্ময় উপলব্ধি করল' যে চন্দ্রিকা মাসির বাড়ী যাওয়া পছন্দ করে না কারণ তিনি পিতা মাতার বিরুদ্ধে সন্তানদের উস্কিয়ে দিচ্ছেন, তখন থেকে মৃন্ময় চন্দ্রিকার কাছেও এ ব্যাপার গোপন করতে লাগল।

বড়মাসি প্রতিদিন মৃন্ময়ের মনকে বিষিয়ে তুলেছিল তার মা বাবা ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে। সুনয়না বল'ত—"তোর বাবার কি উচিত ছিল না তোকে ব্যারিস্টার করিয়ে আনা? আজকাল কত আজে বাজে পরিবারের ছেলে মেয়েরা ব্যারিস্টার হয়ে কেমন নাম করছে। আর তোর বাবার সব টাকা তিনি শেষ করলেন ভাগ্নে, ভাইপোর পিছনে। তাই তোকে ও তন্ময়কে তেমন উচ্চশিক্ষা দিতে পারলেন না। বিদেশের ডিগ্রী আনবাব সুযোগ তোরা পেলি না। হয়ত বিদেশী ডিগ্রী থাকলে তোদেব জীবনে আরও উন্নতি করার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সাধারণ এ্যাড্ভোকেট হয়ে তুই কতটুকু উন্নতি করতে পারবি? 'ব্যারিস্টার' এই নামের জৌলসে দেখ্‌তে পেতিস্ কত বড় বড় মক্কেল জুট্‌তো তোর।"

"কিন্তু বড়মাসি বাবার তো আয় বা নাম কিছু কম নয়।"

"মূর্খ ছেলে, তোর বাবা হলেন আই, সি, এস আবার ব্যারিস্টারও সুতরাং তাঁর সেই নামেই তো মক্কেল জুটেছে। কিন্তু তুই তো বিদেশের মাটি চোখে দেখবারও সুযোগ পেলি না। যে কয়দিন তোর বাবা আছেন, তাঁর জুনিয়ার হিসাবে তোর কিছু হ'তে পারে। তারপর তো তোর সংসার চালানই মুস্কিল হবে।

তাছাড়া তোর মত বিদ্বান, রূপবান, ছেলের অদৃষ্টে কিনা জুটলো আই, এ, পাশ ঐ কাল মেয়েটি। সুতারার আক্কেল ও বুদ্ধি দেখে অবাক হই। লোকে নিজের ছেলের স্বার্থটাই আগে দেখে। তা নয় সে মৃত বান্ধবীর মেয়ের স্বার্থটাই বড় করে দেখলো। কত সুন্দরী গুণবতী মেয়ে তোর জন্য আমি জুটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তা

নয়। আমাদের পরামর্শ না নিয়ে কি একটা বিয়ে তোর দিলে। তুই-ই বা ঐ মেয়েকে দেখে কি করে পছন্দ করলি জানি না।

অবশ্য তোরা হলি মা বাবার সুবোধ সন্তান। মা বাবার অমতে কিছু করতে বা বলতে সাহস পাস্ না। কিন্তু তাই বলে তোর ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে তোর মাব কি উচিত হয়েছে এমন একটি কাল মেয়েকে তোর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া? এটা তোর প্রতি কত বড় অবিচার করা হয়েছে—তুই আজ নয়, আবও কিছুদিন পর তা বুঝবি।

চন্দ্রিকা হ'ল নেহাৎ সেকেলে সাধারণ ঘরের মেয়ে। কোনদিন তুই যদি ব্যারিস্টার হতে পারিস্—সে কি পারবে তোর সঙ্গে সামাজিকতা রক্ষা করতে, পার্টিতে যেতে বা অবাঙ্গালীদের সঙ্গে অমন সহজভাবে মেলামেশা করতে?—যেমন পারে তোর ছোট মাসির মেয়ে কিটি, রিনি? তখন পদে পদে তোর মাথা হেঁট হবে এই জড় ভরত মেয়েকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে সমাজে পরিচয় দিতে।"

"চন্দ্রিকা তো কাল নয় মাসিমা। সে তো উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা।"

"রেখে দে তোর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। কোলে তুই একটি সন্তান আসুক তখনই দেখ্‌বি ঐ রং কাকের মতই কালো হবে।

তাছাড়া যেখানে দুধে আল্‌তা রং এর সুন্দরী উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে তো'র স্ত্রী হ'তে পারে—সেখানে শ্যামাঙ্গিনী কেন হবে তোর স্ত্রী?

তোরা সরল ছেলে তাই বুঝতে পারিস্‌নি এখানেও তোর মা বাবার নিজেদের স্বার্থটাই বড় করে দেখেছে। তোর স্বার্থ দেখেনি। সুন্দরী, গুণবতী মেয়ে যদি তাদের বশে না থাকে, বৃদ্ধ বয়সে তাদের না দেখে, তাই বান্ধবীর অশিক্ষিতা কাল মেয়েকে বধূ রূপে গৃহে এনেছে—যাতে সে সারাজীবন কৃতজ্ঞতা বোধে তাদের পরিচর্য্যা করে। তাদের দুঃখ কষ্টটার কথাই সমর ও সুতারা চিন্তা করল। কিন্তু তোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একবার চিন্তা করল না।

মৃণ্ময়, এখনও সময় আছে বাবাকে বল্ তোকে বিলেত হতে

ব্যারিস্টারী পড়ে আসবার সুযোগ দিতে। আর তা যদি সে না দেয় —তোব চিন্তার কারণ কি? কত শ্বশুর পাবি, যারা তোকে লুফে নেবে এবং তোর ব্যারিস্টারী পড়বার খরচ জোগাবে। বলিস্ তো আমিই তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

আমার বান্ধবী ব্যারিস্টার তালুকদারের স্ত্রীর একমাত্র সুন্দরী, সুগায়িকা, বিদুষী মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারি।"

এইভাবে দিনের পর দিন মাসি চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নিজের হাতে তৈরী করে মৃণ্ময়কে খাওয়ায়। আর নানাভাবে তার মনকে বিষাক্ত করে তোলে চন্দ্রিকা, সুতারা ও সমর বাবুর বিরুদ্ধে।

চন্দ্রিকা বুঝতে পারে মৃণ্ময়ের মনকে কে যেন বিষিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না কে সে? এইভাবে আস্তে আস্তে মাসির আঁকা রঙ্গীন ছবি যতই মৃণ্ময়ের কল্পনায় ভেসে উঠে, ততই মৃণ্ময় তার মা বাবার প্রতি আস্থা হারায়, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি সব যেন বুদ্ধুদের মত শূন্যতায় মিলিয়ে যায়।

চন্দ্রিকা ক্রমে মৃণ্ময়ের জীবনে যেন ঝাপসা হয়ে উঠতে থাকে। সেইক্ষেত্রে ভেসে উঠে অত্যাধুনিকা চোখ্ ঝল্সানো মিস্ তালুক-দারের প্রতিমূর্ত্তি। চন্দ্রিকাকে সে যেন আর সহ্য করতে পারে না। চন্দ্রিকার সব কিছুতে সে যেন গ্রাম্য মেয়ের ছাপ দেখে। যদিও চন্দ্রিকা কলেজে পড়ুয়া, সুরুচি সম্পন্না, সুশ্রী, স্মার্ট মেয়ে। তবু মাসির দেওয়া মদিরায় আচ্ছন্ন হয়ে মৃণ্ময় যেন চন্দ্রিকার মধ্যে আর 'সু' কিছুই খুঁজে পায় না। তার মনেও যেন একথাই বার বার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে যে চন্দ্রিকা তার জন্য নয়,—পিতা মাতার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যই এ বাড়ীতে আনা হয়েছে। যদিও তেমন কিছু মনে করবার কোনই কারণ ছিল না। চন্দ্রিকা যথা সম্ভব স্বামীর সেবা যত্ন করত। তবু মৃণ্ময়ের মনে যে বিশ্রদ্ধার বীজ রোপিত হলো তা ক্রমশঃ বিষবৃক্ষের মত বাড়তে থাকলো। সন্দেহের বীজ সাপের বিষের মতই ভয়ঙ্কর। একবার যদি কারো মনে প্রবেশ

করে, তবে তার মনের সব শান্তি, সুখ নষ্ট না করে ক্ষান্ত হয় না। মৃণ্ময় সেই সন্দেহের বিষের জ্বালায় অনুক্ষণ নিজে দগ্ধ হচ্ছিল তার শান্তির নীড়ে নানা সন্দেহের বিষ প্রবেশ করে। মৌচাকে ঢিল পড়লে যেমন ক্রুদ্ধ মৌমাছিদের দল সামনে যাকে পায়, তাকেই দংশন করে জর্জ্জরিত করে, তেমনি মৃণ্ময়ও কারণে অকারণে চন্দ্রিকা, মা, বাবাকে রূঢ় আচরণে আঘাত করতে লাগল।

সমরবাবু ও সুতারা বুঝে উঠতে পারে না,—কি করে মৃণ্ময়ের এমন পরিবর্ত্তন সম্ভব হল। চন্দ্রিকা যেন খানিকটা আঁচ করতে পারে যে বড় মাসির প্রভাবেই মৃণ্ময়ের এমন পরিবর্ত্তন। কিন্তু গুরুজন সম্বন্ধে হঠাৎ কিছু বলা উচিত নয়—মনে করে সে সুতারার কাছেও তা প্রকাশ করে নাই।

১২

সমরবাবুর সুখের সংসারে ঘুন ধরেছে। তাঁর আদর্শ স্বভাবের সন্তান ও সন্তানতুল্য ভাইপো, ভাগ্নেদের জন্য আত্মীয় পরিজন তাঁকে ঈর্ষ্যা করত। সেই আত্মীয় পরিজনের প্রভাবে পড়ে—সমরবাবুর সুখের সংসারে কে যেন হলাহল ঢেলে দিল। রুদ্র বৈশাখের তাণ্ডব নৃত্যে যেমন অতি যত্নে সাজানো বাগিচার চরম দুর্দ্দশা ঘটে, ঝড় ঝঞ্ঝায় কচি ফুলের গাছ ধরাশায়ী হয়, প্রস্ফুটিত সুন্দর ফুলগুলি ধুলো বালি ও জল ঝড়ে দুমড়ে মুষড়ে গিয়ে এক কদাকার রূপ নেয়, —তেমনি সমরবাবুর সাজানো সংসারে যেন প্রলয় নৃত্য হয়ে গেছে। এক এক করে সবাই সরে পড়ছে। একমাত্র চন্দ্রিকা ও হিমাংশুই বৃদ্ধ বৃদ্ধার শেষ অবলম্বন হয়ে রয়েছে।

কিন্তু ঝড়ো হাওয়ায় ভেঙ্গে পড়া গাছের মতই—চন্দ্রিকার মন ভেঙ্গে চৌচির হয়েছে। মৃণ্ময় অবশেষে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে ব্যারিস্টার তালুকদারের মেয়েকে বিয়ে করে তার টাকায় সস্ত্রীক বিলেত গেছে ব্যারিস্টারী পড়তে। চন্দ্রিকার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে গেছে। সম্প্রতি বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ায় সে চন্দ্রিকাকে বলেছিল উভয়ের সম্মতিতে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্যে।

চন্দ্রিকা অতটা আধুনিকা হ'তে পারেনি। তাই এইভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে সম্মতি দেয়নি। মৃণ্ময়ের পত্রোত্তরে সে লিখেছিল, "তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলেও—আমি এই বন্ধনকে অস্বীকার করতে রাজী নই এবং আমার শ্বশুর শাশুড়ী যতদিন বেঁচে আছেন, তাঁদের প্রতি কর্ত্তব্যও আমাকে করতে হবে" ইত্যাদি।

প্রত্যুত্তরে মৃণ্ময় তাকে জানিয়েছিল যে গরীবের কুরূপা মেয়ে·

চন্দ্রিকা মৃণ্ময়কে বিয়ে করেনি, করেছে সমরবাবুর সম্পদ, বৈভবকে। তাই স্বামী পরিত্যক্তা হয়েও সে স্বামীর সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যর লোভে স্বামীর ভিটে আঁকড়িয়ে পড়ে আছে ইত্যাদি নানা কটুক্তিতে পূর্ণ সে চিঠি।

চন্দ্রিকা সেই চিঠির উত্তর দেয়নি। চিঠিখানা সে সুতারাকে দেখিয়ে তার কি করণীয় পরামর্শ চেয়েছিল। এমন অপমান ভরা চিঠি পড়ে সুতারা ক্রুদ্ধা হয়ে সময়বাবুর হাতে চিঠিখানা দেন। উত্তরে সমরবাবু বলেছিলেন "তুমি উপযুক্ত জবাবই দিয়েছো। আজও তোমার মধ্যে সতী সাবিত্রীর দেশের মেয়েদের আদর্শ যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

মৃণ্ময়ের সঙ্গে এ জীবনে আমাদের কোন সম্পর্ক আর থাকবে না। যে পরিণীতা স্ত্রীকে তার মর্যাদা না দিয়ে, মিথ্যে আলেয়ার পিছনে ছুটে এভাবে তার নিজের জীবন নষ্ট করছে, পরিবারের মান ইজ্জত নষ্ট করছে, তোমার প্রতি অবিচার করে নিষ্ঠুরতা করছে, তাকে ত্যাজ্য পুত্র করা ছাড়া আব কোন গত্যন্তর নেই।

তুমি আমার পুত্রবধূই শুধু নও। তুমি আমাদের কন্যাসম। আমাদের ভুলে তোমার জীবন নষ্ট হবে—তা আমি চাই না। তুমি সম্মতি দিলে মৃণ্ময়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে, আমি মৃণ্ময়ের থেকে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে তোমার আবার বিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে দেব। তোমার বাবার অবর্ত্তমানে আমি হবো কন্যে কর্ত্তা. তুমি কেবল সম্মতি দাও, মা।"

অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে চন্দ্রিকা উত্তর দিয়েছিল– "তা হয় না বাবা। আইন বদল হলেও আমি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর স্ত্রী, হিন্দুর পুত্রবধূ। আমি মনে প্রাণে শুধু আপনাদেরই জানি। আমার স্বামী আমাকে গ্রহণ করুন, আর না করুন, আপনাদের সেবাতেই আমি আমার পরবর্ত্তী জীবন উৎসর্গ করব। আমাকে পুনরায় বিয়ে করার কথা বলে আঘাত দেবেন না।

যদি আপনাদের মত দেবতুল্য শ্বশুর শাশুড়ী ও উপযুক্ত স্বামী পেয়েও আমার কপালে সুখ না থাকে,—তবে অন্য বিয়েতে যে আমি সুখী হ'ব তার নিশ্চয়তা কোথায়? আমায় আপনারা মাপ করবেন। আপনাদের সেবা করার অধিকার হতে আমাকে বঞ্চিত করবেন না—এই একটি ভিক্ষাই আপনাদের কাছে আজ চাইছি। স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীর অধিকার আর কিছুতে নেই। তাই আপনাদের কাছে আমার এই অনুরোধ। বঞ্চিতাকে সর্বতোভাবে বঞ্চিত করবেন না।"

চন্দ্রিকার করুণ আবেদনে সুতারার হু'চোখে জল বইতে থাকে। তিনি চন্দ্রিকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন "ওরে অভাগী, তুই নিজে আমাদের ছেড়ে যদি না যাস্, তবে কারও সাধ্য নেই তোকে আমাদের বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়। তুই শুধু আমার পুত্রবধূ নস্। তুই যে আজীবন আমার কন্যাসম ছিলি। তুই আমার আবাল্যের বন্ধু উমার মেয়ে। আমি যে উমার থেকে তোকে চেয়ে নিয়ে ছিলাম। তখন কি জানতাম এমন দিন আসবে যেদিন আমার মৃণ্ময় আমার পর হয়ে যাবে। তোর কোন ভয় নেই মা। আমরা এই হুই বৃদ্ধ বৃদ্ধা যতকাল বেঁচে আছি, তোর অসম্মান কেউ করতে পারবে না।"

সমরবাবু বল্লেন "আজ হতে মৃণ্ময়কে আমি ত্যজ্যপুত্র করলাম। তার ভাগের সমস্ত সম্পত্তি আমি তোমার নামে লিখে দেবো। তন্ময়ও আমাদের অবাধ্য হয়েছে। আর কিছু দিন তার জন্য অপেক্ষা কর'ব। এরমধ্যে যদি তন্ময়ের মধ্যে কোন অনুতাপ দেখা না দেয়, তবে তাকেও পৈত্রিক সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত হ'তে হবে।"

"আমার নামে সম্পত্তি লিখে দেবেন না। আপনি যদি আপনার পুত্রকে শাস্তি দিতে চান্—তবে আপনার সম্পত্তি আপনাদের হুজনের নামে জনসেবায় দান করে দিয়ে যান। যে সামান্য শিক্ষা লাভ করেছি, তাই দিয়েই আমার ভরণ পোষণ চালাতে পারবো। আমায় আর অপরাধী করবেন না। এ ব্যবস্থা

আমাকে লোকচক্ষে হেয় করবে। আত্মীয় স্বজনেরা ভাববেন আমিই চক্রান্ত করে এ কাজ করিয়েছি। আমি আর কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চাই না। আপনাদের আশীর্বাদে দেখবেন আপনাদের বর্ত্তমানেই আমি স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবো।"

"তোমার সে যোগ্যতা, দৃঢ়তা আছে—তা আমি জানি। কিন্তু আমার পুত্রবধূ হয়ে, স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে, তুমি করবে চাকরী ? এতে যে লোকে মৃণ্ময়ের সঙ্গে আমাকেও দুষবে। তাছাড়া লোকের কথা বাদই দিলাম। আমাদের বিবেকের কাছে আমরা কি কৈফিয়ৎ দেব ? তবে মৃন্ময় ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

আমাদেব বর্ত্তমানে তোমাকে কোন চাকরী করার অনুমতি দিতে পারি না। আমাদের অবর্ত্তমানে যদি সময় কাটাবার জন্য কোন কাজ নিয়ে ডুবে থাকতে পার, তবে তা তখন নিও। কিন্তু যতকাল আমরা দু'জন আছি—ততকাল নয়।"

চন্দ্রিকা বিনীত স্বরে বল্লে, "আমায় মাপ করবেন। না তা হয় না। এখন যদি চাকরী না নেই, আপনি তো জানেন এর পরে বয়সের দোহাই দিয়ে আমাকে চাকরীর অনুপযুক্ত সাব্যস্ত করবে। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি আমার ভবিষ্যৎ ভিত গড়ে তুলবার জন্য আপনি সহায়তা করুন। বাধা দিয়ে আমার অন্ধকার ভবিষ্যৎকে অন্ধকারতম করে তুলবেন না।"

"কিন্তু এই সামান্য লেখাপড়ায় তুমি কি চাকরী করবে ? বরং তুমি আবার লেখাপড়া শুরু কর। আমি তার ব্যবস্থা করছি।"

"না, এতদিন পর পড়াশুনায় আমি আর মন বসাতে পারব না। আমার এই বিক্ষিপ্ত মনে পড়াশুনার জন্য একাগ্রতা আনা সম্ভব নয়। আমার বান্ধবী শিবানী বিদেশী বই বিক্রির "সেলস্ গার্লের" কাজ করে। এতে আয় ভাল হয়। শিক্ষিত মার্জ্জিত পরিবেশের সঙ্গেই আমাদের কারবার হবে। তাই ভাবছি আমিও শিবানীর মত এই চাকরীই করব।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সমরবাবু বল্লেন "আমার পুত্রবধূ হবে অবশেষে "সেলস্ গার্লস"! বেঁচে থেকে আমাকে কিনা তাও দেখতে হবে!"

"আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। স্বাধীন দেশের মেয়েদের নিজেদের জীবিকার্জ্জনের জন্য সম্মানহানি না হয় এমন কোন কাজই নিন্দনীয় নয়। উচ্চ শিক্ষা না থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরী দূর্লভ। অফিসের কেরানী-গিরিতে আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও উপযুক্ত সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ করে নাই। উপরওয়ালারাও মনে করে মেয়ে কেরানীরা তাদের ভোগ্য বস্তু। সহকর্মীরাও মনে করে তাদের কাজে উৎসাহ জোগাবার জন্যই বুঝি প্রতি ডিপার্টমেণ্টে মেয়ে কারনিক নিযুক্ত করা হয়েছে। তাই হাল্কা অতি জঘন্য পরিহাস করতেও তারা দ্বিধা বোধ করে না।

সাধারণ "সেলস্ গার্লের" বা "রিসেপসেনইষ্টের" চাকরীও তেমন সম্মান জনক নয়। স্বল্প বিদ্যায় নিজের মান সম্ভ্রম বজায় রেখে স্বাধীন ভাবে একমাত্র এই বই বিক্রির ব্যবসাই ভাল। উচ্চশিক্ষিতের পরিবেশে আমাদের ঘুরতে হবে,—সুতরাং কোন রকম অসম্ভ্রমের সম্ভাবনা নেই।"

"তুমি জান না মা, কেউটে সাপ সর্বত্রই থাকে। যাদের তুমি ভদ্র ও সভ্য মনে করে সাহস করছ,—হয়ত দেখবে তাদের মধ্যেই ক্লেদ, পঙ্কিলতা তত বেশী। টাকার গদীতে এরা বসে আছে। তাই কাউকে পরোয়া করে না এরা। তুমি তো আজও এসব ব্যাপারে শিশু।"

"কিন্তু আমি কারও অধীন নই। কারো আচার ব্যবহারে যদি তেমন কিছু আভাস পাই, তবে তার কাছে দ্বিতীয়বার যাবার আমার প্রয়োজন হবে না। আমি যে আপনারই পুত্রবধূ। জীবন থাকতে কেউ আমাকে অপমানিত করবে—তেমন সাহস কারো হ'বে না। উপযুক্ত শিক্ষা দিতে আমিও পারবো আশা করি আপনার আশীর্বাদে।

আমাদের জন্য বাইরের পথ পিচ্ছিল। তবু দেখে পথ চল্লে হয়ত দূর্ঘটনা না-ও ঘটতে পারে।"

"সেই আশীর্বাদই করি তোমাকে। ভগবান তোমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করুন। মনের এই দৃঢ়তা, শক্তি, সাহস, ধৈর্য্য যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় থাকে। তোমার আদর্শ ও অমননীয় মনোভাবই যেন একদিন ঘরছাড়া মৃণ্ময়কে ঘরে ফিরবার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকে—এ প্রার্থনা করি।

তোমার মনের দুঃখের বোঝা যেন, তুমি কাজের মধ্য দিয়ে ভুলে থাকতে পার। মানুষের জীবন কখনও একই গতিতে চলে না। আশা করি, ভগবান তোমারও সুদিন একদিন অবশ্যি ফিরিয়ে দেবেন। শুধু এই কথাই বল'ব কোন অন্যায়ের কাছে, কোন প্রলোভনেরই কাছে মাথা হেঁট কব না"—বলে সমরবাবু বিষণ্ণ মুখে নিজের চেম্বারে গিয়ে ঢুকলেন। চন্দ্রিকাকে চাকরী করার অনুমতি তিনি তাঁর বিবেকের বিরুদ্ধেই দিলেন—চন্দ্রিকার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। তাই নানা চিন্তা জমাট বেঁধেছিল প্রাক্তন জেলা শাসকের মনে।

১৩

দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক সব ব্যবস্থাই আস্তে আস্তে বদলাতে সুরু করেছে। তাই যা ছিল অচিন্তনীয়, অভাবনীয়—সমাজে তেমন অনেক অঘটনই নিত্যি নৈমিত্তিক ঘটে যাচ্ছে।

মৃন্ময় ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেছে। কেবল পাশের ছাপ থাকলেই ব্যবসা জমে না। এজন্য যেসব গুণের প্রয়োজন—তার কোনোটাই তার ছিল না। কিন্তু নিজের মান সম্ভ্রমকে দশের উর্দ্ধে তুলে ধরতে না পারলে সমাজে বা দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। তাই যেন তেন প্রকারেণ প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় উদ্ভাবনে বদ্ধ পরিকর হয় মৃন্ময়।

স্বাধীন ভারতে দেখা দিয়েছে অনেক পরিবর্ত্তন। ভারতের বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সুযোগ নিয়ে ব্যাঙ্গাচির মত বিদেশী রাষ্ট্রের অধিবাসীতে রাজধানী, নগর, শহর, গ্রাম, জনপদ জনাকীর্ণ হয়েছে। বিশেষ করে আমেরিকানদের ভারতের প্রতি টানটা যেন গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। তাই যত্র তত্র আমেরিকানদের সমাবেশ। এদের মধ্যে আবার অভিনবত্ব আছে। এরা ভারতে এসে নিজেকে পুরোপুরি ভারতীয় রূপে গড়ে তুলতে ব্যস্ত। তাই ভারতীয় আদব কায়দা শিখবার জন্য অনেকে আবার কোন কোন ভারতীয় পরিবারের সঙ্গে নিজেকে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। পরিণাম ঠিক সুখাবহ নয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে শাসক পার্টিতে যোগ দেওয়াই সমীচিন মনে করে মৃন্ময় কংগ্রেসে যোগ দান করেছে। ব্যারিস্টার তালুকদারের মেয়ের পুরোপুরি "সোসাইটি গার্ল"এর খোলস। মৃণ্ময়ের একটি পুত্র হলো। পুত্রটির যখন সবে এক

মাস বয়স, তখন মৃণ্ময় হিমাংশুকে ফোন করে একদিন ডেকে আনে, এবং নিজের নবজাত শিশুটিকে চন্দ্রিকাকে পালন করবার জন্য প্রস্তাব দিল। তালুকদার দুহিতা চম্পার 'সোসাইটি' করে আর সময় জুটে না পুত্রের তত্ত্বাবধান করতে। ছেলেটির বড়ই অযত্ন হচ্ছে। চন্দ্রিকা যখন ডিভোর্স নিল না বা দ্বিতীয় কোন স্বামীর ঘর করল না--তখন সেই না হয় মৃণ্ময়ের সন্তানকে প্রতিপালন করবার দায়িত্ব নিক্। এতে ছেলেটি মানুষ হবে। নতুবা ঝি বা আয়াব তত্ত্বাবধানে হয়ত শিশুটির অকাল মৃত্যু ঘটতে পারে।

মৃণ্ময়ের প্রস্তাব শুনে হিমাংশু বলেছিল "তোমাব আব্দার শুনে হাসবো না বাগ করবো—ঠিক বুঝতে পারছি না। যে স্ত্রীকে বিনা অপরাধে তুমি ত্যাগ করে এসেছো, যার ভরণ পোষণেব খরচ পর্য্যন্ত দাও না—আজ কিনা নিজের প্রয়োজনে তারই দয়াব ভিক্ষুক হচ্ছ! কিন্তু তোমার এ রকম আব্দার তাঁর কাছে পেশ করবার ধৃষ্ঠতা আমার নেই। তোমার এ আব্দারের প্রশ্রয় তিনি দেবেন কেন? তাছাড়া তাঁর সময়ই বা কোথায়? তাঁব নিজের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা তো তাঁকে করতে হয়। বড়দা, তুমি বৌদিকে চিনতে হয়ত ভুল করেছো। তিনি এ প্রস্তাব কেবল প্রত্যাখ্যানই করবেন না। এধরণের প্রস্তাবকে অপমানজনক মনে করবেন।"

মৃণ্ময় ভেবেছিল তার এই প্রস্তাব চন্দ্রিকা সাদরে গ্রহণ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে। কিন্তু প্রথমেই হিমাংশুর থেকে এ ধরণের ধাক্কা খেয়ে সে নিজেকে বিব্রত মনে করে বল্লে "কিন্তু আমাদের পরিবারে সে যে এখনও ঠাঁই পেয়েছে—সে তো আমাবই সম্পর্কের সূত্রে। তাছাড়া তাকে চাকরী করতেই বা হচ্ছে কেন? বাবা কি তার খরচ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে?"

"কাকাবাবু ও খুড়িমার অমতেই সে এই চাকরী নিয়েছে। সে এখন আমাদের পরিবারে আছে ঠিক তোমার সম্পর্কে নয়। পরন্তু বৌদির "সই মার" দাবীতে। তাই তিনি তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ নিজে

গড়ে নিচ্ছেন। এই স্বল্প বিদ্যা নিয়ে তিনি যে আয় করছেন—তা অনেক উচ্চশিক্ষিতার কাছে লোভনীয় বলা যায়। সুতরাং বৌদির পক্ষে তোমার সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা কখনই সম্ভব নয়।

তাছাড়া তুমি বৌদিকে ভুল বুঝেছো। বৌদি ডির্ভোস নেয়নি কাকাবাবু ও খুড়ীমার জন্য। তোমার প্রতি তাঁর আর কোন আকর্ষণ আছে, মনে হয় না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াবার তাঁর যে কি অসীম শক্তি, তা আমি নানা পরিবেশের মধ্য দিয়ে যতই দেখছি, ততই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। কর্ত্তব্যপরায়ণতা, তেজস্বিতা, নির্ভীকতা থেকে কেউ কখনও তাঁকে বিচ্যুত হতে দেখেনি। আমাদের বাড়ীর বধূ হয়ে ঝড়, বৃষ্টি, রোদ মাথায় করে বৌদি দেশদেশান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন নানা বিদেশী বই এর "সেলস্ গাঁল" এর কাজ নিয়ে। মাসে হাজার টাকার বেশী তিনি আয় করেন কমিশনে। অথচ এত কষ্টের তাঁর কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমরা কত বারণ করি। কিন্তু তিনি হেসে বলেন সবার অবর্ত্তমানে আমাকে তো একাই দাঁড়াতে হবে।"

কাকাবাবু তাঁর সম্পত্তি তাঁর নামে লিখে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তা নিজে ভোগ করবেন না। তাঁর ইচ্ছা কাকাবাবু ও খুড়ীমা গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরই নামে কোন প্রতিষ্ঠানে তা দান করবেন। এমন নির্লোভ, এমন ত্যাগী মেয়ের মূল্য বুঝলে না, বড়দা।

বৌদি যদি আজ না থাকতেন তবে জানি না এই বৃদ্ধ বয়সে কাকাবাবু খুড়ীমার কি অবস্থা হোত। আজও যে তাঁরা সব দুঃখ ভুলে বেঁচে আছেন—তা একমাত্র তাঁরই গুণে। অসম্ভব সহ্যগুণ ও চাপা প্রকৃতির মেয়ে। তাঁর উপর দিয়ে যে এত বড় ঝড় বয়ে গেল হাসি-মুখেই তিনি তা' মাথা পেতে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি মনের সেই তুষানলে নিজেকে দগ্ধ না করে—তিনি এমন রাতদিন ছুটোছুটি করার চাকরী নিয়েছেন। আজকাল এমন আদর্শ মহিলা বিরল। বৌদিকে যতই দেখছি, ততই তাঁর গুণে আকৃষ্ট হচ্ছি।

যাক্, অনেক অবান্তর কথায় হয়ত তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিলাম। এবার উঠি। নূতন বৌদির সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয়ও করিয়ে দিলে না। তাঁর আতিথেয়তা পাবার সৌভাগ্যও হলো না।"

মৃণ্ময় হিমাংশুর কটাক্ষে মনে মনে লজ্জিত হয়ে বল্লে "এই দেখ, ভুলেই গেছি বেয়ারাটাকে তোর জন্য চা দেবার কথা বলতে। আর তোর বৌদিকে কি বাসায় পাওয়া যায়? তিনি তো সারাদিন সোসাইটি ও পার্টি নিয়েই ব্যস্ত। যেদিন তাঁর বাড়ীতে পার্টি থাকে,— সেদিন তবু কিছুক্ষণ হয়ত বাড়ীতে থাকেন। ইদানীং আবার এক আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ার মিষ্টার সিমসনকে বাংলা শেখাতে যান্ প্রত্যেকদিন বিকেলে। ফিরতে অনেক রাত হয়।"

"তবে এই বৌদিও তোমার রোজগারী। যাই বল বড়দা, তোমার স্ত্রী ভাগ্য ভাল, দু'টি স্ত্রীই তোমার করিৎকর্মা।

যাক্, তাঁর সঙ্গে যখন আলাপ হবার সৌভাগ্য হলো না, তখন এবার উঠি। তাছাড়া তুমি তো জান বড়দা, আমার গ্যাষ্ট্রিক পেইন। এর জন্য খাওয়া দাওয়া খুবই বাঁধা ধরা। অফিস হতে ফির্লে খুড়ীমা সামনে বসিয়ে খাইয়েছেন। আমি যে এখানে আসছি, তা কাউকে জানিয়ে আসিনি।"

"চম্পা টিউশুনি করে না! এ ভাষা শিক্ষা দান তাঁর ভলাণ্টারী সার্ভিস্। বাইরে এত বেশী ভলাণ্টারী সার্ভিস্ দিচ্ছেন বলেই, সংসারের কিছু, এমন কি বেবীটাকে পর্যন্ত তিনি দেখাশোনা কববার সময় পান না।"

হিমাংশু মনে মনে হেসে উঠে পড়ল। মৃণ্ময় তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে সঙ্গে এলো। দু'জনের মন তখন দুই ভিন্নমুখী চিন্তা ধারায় আচ্ছন্ন। মৃণ্ময়ের মন দুশ্চিন্তার বোঝায় ভারাক্রান্ত। ভেবেছিল হিমাংশুও এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করবে এবং চন্দ্রিকাও সেই দায়িত্ব গ্রহণে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে। কিন্তু হিমাংশুর

সঙ্গে কথা বলে পরন্তু সে বিব্রত ও লজ্জিতই বোধ করছে। চন্দ্রিকা সম্বন্ধে সে যা মনে করেছিল, বড়মাসি চন্দ্রিকার যে রূপ তুলে ধরেছিলেন, মৃণ্ময় দেখছে তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। চন্দ্রিকা স্মার্টই শুধু নয়, তার কথা বলবার যে সুন্দর একটা ভঙ্গী আছে—তাতে সবাই আকৃষ্ট হয়। তদুপরি তার সদা প্রফুল্ল মুখ তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

চম্পার যে কিছুতেই তুষ্টি নেই। সদা সর্বদা ভ্রূ কুঞ্চিত, উগ্র মেজাজ। একজন যেন জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধালোক, অপর জন নিদাঘের তপ্ত রৌদ্র। চম্পার অত্যাধুনিকতার সঙ্গে মৃণ্ময়ের মত ছেলেও যেন সব্দা তাল রেখে চলতে পারে না। মাঝে মাঝে মনে হয় চম্পা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে চলেছে। যে বড়মাসি একদিন চম্পার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, এখন তিনিই চম্পা সম্বন্ধে প্রায়ই নানা কটাক্ষ করে থাকেন। চম্পাকে দিয়ে কি তার সামাজিক মান বেড়েছে?

আজ হিমাংশুর মুখে চন্দ্রিকার স্বাবলম্বী হবার প্রচেষ্টার কথা শুনে এবং চন্দ্রিকার মধ্যে যে দৃঢ়তার পরিচয় সে পেলো,—তা হয়ত কোন দিনই চম্পার মধ্যে পাবে না। চম্পা ফর্সা, চন্দ্রিকা শ্যামাঙ্গী। হিমাংশুর কথায় মনে হোল—চন্দ্রিকার সামনে কোন দিনই সে আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। মৃণ্ময় ভেবেছিল চন্দ্রিকাকে ত্যাগ করে, মৃণ্ময় তাকে অসহায় করেছে। তাই মৃণ্ময়ের দিক থেকে সামান্যতম সাড়া পেলেই চন্দ্রিকা তা সাগ্রহে গ্রহণ করবে।

কিন্তু আজ সে বুঝেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে যে চন্দ্রিকা তার পাশে ছিল তার সেই দৃপ্তরূপই আবার ফুটে উঠেছে। নিজেকে সে কোন প্রকারেই হেয় করেনি—করবে না। আত্মাবমাননা সে কখনই সহ্য করবে না। অন্যের সন্তান প্রতিপালন করবার দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ অর্থই তাকে পরোক্ষে উপহাস করা। এ অপমান চন্দ্রিকা

কখনই সহ্য করবে না। মৃণ্ময় মনে মনে চিন্তা করে চন্দ্রিকার এই রূপ তো তার অজানা ছিল না, তবে কেন সে এতবড় ভুল করতে যাচ্ছিল।

হিমাংশু মনে মনে হাসে বড়দা চম্পাকে কি পুরোপুরি সোসাইটি গার্ল এর স্বাধীনতা দিয়েছে? কিন্তু শেষ রক্ষা হবে তো? একদিন কি এর জন্য অনুতাপ করতে হবে না বড়দাকে? চন্দ্রিকার মত সাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ করে চম্পাকে নিয়ে কি সে সুখী হতে পেরেছে? আরও নানা চিন্তার জাল মৃণ্ময়ের ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে হিমাংশু মনে মনে বুনতে থাকে।

১৪

কয়েক বছর পর।

সার্কুলার রোডের উপর একটা রেঁস্তোরা। রেঁস্তোরাটি সব শ্রেণীর খরিদ্দারের জন্য। খাদ্যবস্তুর দাম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগালের মধ্যে। তেমন আকাশ ছোঁয়া নয়। আবার সুলভও তেমন নয়। যেমন কোন কোন প্রতিষ্ঠান আমলাদের জন্য স্বল্প মূল্যে কাফেটেরিয়া বা ক্যান্টিন করে বড় রকমের আয়কর ফাঁকি দিচ্ছে। মজুর শ্রেণীর ভিড় নেই। সাধারণতঃ রাজনীতিক যুব ও প্রবীণ ব্যক্তিদের আড্ডাখানা বা মিলন কেন্দ্র এই রেস্তোরা। রেঁস্তোরার নামটিও বেশ মজাব। "আপরাহ্নিক আনন্দলহরী"। কেন এমন নামোকবণ হয়েছে কেউ তা জানে না। হয়ত মালিকই একমাত্র এর প্রকৃত কারণ বলতে পারবেন। কিন্তু তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি মৃদু হেসে উত্তর দেন, "কেন নামটার মধ্যে একটু অভিনবত্ব নেই কি? আমার তো মনে হয় এই নামের আকর্ষণেই আপনারা এখানে এসে থাকেন।"

ভদ্রলোক নিজের হাতেই হিসাব নিকাশ করেন। তাঁর রেঁস্তোরার মত তাঁর নামটির মধ্যেও বেশ একটু অভিনবত্ব আছে। আরাম দাঁ। সহকারী ছিল গুটি কয়েক বড়ুয়া বয়। পাচকও তাঁব বড়ুয়া। যাদের রান্নার সুখ্যাতিতে প্রায় সকলের জিভে জল আনে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আড়ম্বর বর্জ্জিত ছোট্ট সীমিত মেনু। ছোট ছোট টেবিলের চারদিকে চারটা চেয়ার। এইভাবেই স্বল্প পরিসর জায়গায় বেশ কয়েকটি টেবিল পাতা হয়েছে। কোন পর্দ্দার বালাই নেই। আড়ালে অন্তরালে এক কাপ চা নিয়ে এক ঘণ্টা নিরিবিলি প্রেম নিবেদনের কোন প্রকার সুযোগ "আপরাহ্নিক

আনন্দলহরী”তে নেই। তাই তেমন মধু আলাপনে যারা প্রিয়—তাদের কাছে “আপরাহ্লিক আনন্দলহরী” হলো হট্টমেলা। এই হট্টমেলা কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছেও তেমন আকর্ষণীয় নয়। কারণ মালিক আরাম দাঁ একটু বেরসিক মানুষ। তাই তিনি নিজেই ঘন ঘন তদারকের অছিলায় টহল দিয়ে দেখেন কে বা কারা এক কাপ চা নিয়ে তার অন্য গ্রাহকের পথ বন্ধ করছে। বড়ুয়া বাবুর্চি ও বয়দের হাতের তৈরী চায়ের সুখ্যাতির জন্যই বিকেল ৪টা হতে রাত ১০টা পর্যন্ত এই “আপরাহ্লিক আনন্দলহরী”কে কেউ কখনও ফাঁকা দেখে না।

আরাম দাঁ রেশনিং অফিসের বড়বাবু। অফিস ফেরৎ তিনি “আপরাহ্লিক আনন্দলহরী”তে ঢোকেন। রাত ১০ টায় সব তালা বন্ধ করে বাড়ী ফেরেন। সারাদিন “আপরাহ্লিক আনন্দলহরী” বন্ধ থাকে। আরাম দাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন “সারাদিন রেঁস্তোরা খোলা রাখলে,—লাভ তো কিছু নেই। ছেলে ছোকরারা এসে হৈ চৈ করবে। বাকী খাতায় পৃষ্ঠা যাবে ভ'রে। আর আমাকে “ইন্‌সল্‌ভেন্ট” হয়ে চাকরীটাও খোয়াতে হবে। আমার অবর্তমানে বয় বাবুর্চিরাও দুহাতে লুট করবার সুযোগ পাবে। সুতরাং অত ঝঞ্ঝাটে না যেয়ে এই ভাল। সারা বিকালের আমার অলস সময়টা “আপরাহ্লিক আনন্দলহরী” তে দেখা শোনা করতে ভালই কাটে। অহেতুক কোন রকম গোলমালের মধ্যেও আমাকে থাকতে হয় না।”

আরাম দাঁকে তার নিয়মিত গ্রাহকেরা আরামদা বলে ডাকে। কারণ বয়সটা তার অর্দ্ধ শতাব্দী উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকদিন। তার গ্রাহকদের কাছে “আপরাহ্লিক আনন্দলহরীর” নির্ভেজাল খাদ্য লোভনীয়। হিমাংশু সেই নিয়মিত গ্রাহকদের অন্যতম। নানা রাজনৈতিক দলের সভ্যরা এখানে আসে। এদের মধ্যে হয় ভাব বিনিময়। কখনো কখনো গরম বক্তৃতাও যে হয় না বা নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা শুনবার সুযোগ থেকে আরাম দাঁ বঞ্চিত হয় না।

আড়ম্বরহীন "আপরাহ্নিক আনন্দলহরী"র গরম চায়ের ঘ্রাণে ও টানে, গরম চপ্ কাটলেটের স্বাদে কখনও কোন খাবার পড়ে থাকবার উপায় নেই, যদিও আরাম দাঁর একটা ফ্রীজ একমাত্র তার বিলাসিতা। উদ্বৃত্ত খাদ্য রাখবার জন্য নয়। তা কেবল আইস্ ক্রীম, কোল্ড ড্রিং এর জন্য। আরাম দাঁ নিজের হাতে প্রতিদিন "আপরাহ্নিক আনন্দলহরীর" খাদ্য বস্তু বাজার করে। তৈরী খাবার শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে খদ্দেরের ভিড়ও হ্রাস পায়। রাত্রির অন্ধকারও ঘন হয়ে আসে। হিমাংশু, কিরীটি সেন, বাসুদেব বালা, মহেন্দ্র খান, অলক দাস, রজনী বসু, চপলাকান্ত গুহ ইত্যাদি বেশ কয়েকজন নিয়মিত খদ্দের এই রেঁস্তোরায় রোজই আসে। অফিস ফেরৎ বা নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য শেষে এরা সবাই এখানে আসে। এখানে তাদের দলের কর্ম পদ্ধতি বা কার্যসূচী নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়।

হিমাংশুও বাড়ী হতে সোজা "আপরাহ্নিক আনন্দলহরীতে" এসেছে। আসন্ন নির্বাচনী কর্মসূচী নিয়েই তাদের আলোচনা। হিমাংশুকে ঢুকতে দেখেই দক্ষিণ পন্থী কমিউনিষ্ট কিরীটি সেন বলে উঠল "আজ আপনার বড্ড দেরী হয়ে গেল হিমাংশুদা। আজ আমাদের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার কথা। যাক্ কি খবর বলুন ? বাম কমিউনিষ্টরা তাদের মতামত কিছু আপনাকে জানিয়ে গেছে কি ? তারা আমাদের যুক্ত 'মোর্চায় আসবে—নাকি তারা স্বতন্ত্র মোর্চা করবে।"

"আজ আমার অন্য একটি কাজে যেতে হয়েছিল। তাই দেরী হয়ে গেল। হ্যাঁ, বাম কমিউনিষ্টরা তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেছে,—তারা স্বতন্ত্র মোর্চা করছে অন্য কয়েকটি দল নিয়ে। তারা আসন বণ্টনের ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পারবে না জানিয়েছে।"

বাসুদেব উত্তরে বল্লে "জানতাম ওরা আমাদের সঙ্গে হাত মিলাবে না। নির্বাচনের সুরুতেই তারা যেভাবে কিরীটিবাবুদের দলের শ্রাদ্ধ শান্তি করে বেড়াছেন, এরপর কি আর হাত মিলাতে পারেন ?"

মহেন্দ্রখান্ বল্লে "ওদের ছাড়াই দেখবেন আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হব। সুতরাং ওদের ছুয়ারে ধন্না দেবার প্রয়োজন নেই।"

অলক দাম ফোড়ন কেটে বল্লে "কংগ্রেসকে ওরা মুখেই গাল দেয়। নতুবা ভেতরে ভেতরে ছুই দলে অগাধ ভাব। সেই ভাবের বন্যাতেই এবার তারা ভেসে যাবে। তারা জানে যুক্ত মোর্চায় আসলে কংগ্রেস এবার ধরাশায়ী হবেই। বন্ধুর অতটা ক্ষতি কি তারা সহ্য করতে পারবে ?"

সমবেত সকলেই সহাস্যে অলকের উক্তিকে অভিনন্দিত করলো। হিমাংশু গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল "আপনারা অতটা আশাবাদী হবেন না। একমাত্র বাম কমিউনিষ্ট পার্টি ব্যতিত অন্য কোন পার্টিই এখনও তেমন কৌলিন্য পায়নি জনসাধারণের কাছে। অবশ্য কিরীটিদের পার্টি জনসাধারণের আস্থা ভাজন। তবু ওদের বাদ দিয়ে আমাদের ফলাফল কি হবে বলা যায় না। সুতরাং ওদের বিরুদ্ধে বিযোদ্গার না করে পরন্তু কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই হুল ফোটাতে হবে আমাদের।"

কিরীটি উত্তর দিল "ওরা যদি আমাদের সমালোচনা করে, আমাদের নিন্দা করে,—তবে মুখ বুজে তাদের সেসব অপমান আমরা হজম করতে পারব না। এটা "শঠে" শাঠ্যং" এর যুগ। আপনাদের গান্ধীবাদী নিরামিষ অহিংসার বাণীতে আমাদের তৃপ্তি আসে না।"

হিমাংশু কিরীটির পিঠ চাপড়িয়ে উত্তর দিল "আমার নিরামিষ পার্টির পলিসি তো তোমাদের গ্রহণ করতে বলছি না। তবে ধীরে ভায়া, ধীরে। জনসাধারণের টেম্পো বুঝে তোমার বুলেটিন ছেড়ো। নতুবা হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। কদম কদম পা বাড়িয়ে চলো।

ঝোপ্ বুঝে না হয় কোপ্ দেবে। কিন্তু নির্বাচনের সুরুতেই পরস্পরের গায়ে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করলে পাব্লিকের সহানুভূতি তো আমরা হারাবই, পরন্তু বিরক্তিভাজন হব। বিশেষ করে বামপন্থী দল গুলির বিরুদ্ধে আমাদের কোন শ্লোগান হওয়া উচিত নয়। আমাদের শ্লোগান হবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।

এসো, আমরা আবার আর একবার বামপন্থীদের সঙ্গে শেষ চেষ্টা করে দেখি—সবাই যুক্ত হতে পারি কিনা।" আরাম দাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই সে বল্লে "আমাদের সবার জন্য এক কাপ চা ও একটা করে কাটলেট দিতে বলুন।"

চপলাকান্ত বাধা দিয়ে বল্লে, "আমাদের ইতিপূর্বেই খাওয়া শেষ হয়েছে। বরং এক কাপ চা দিতে বলুন আমাদের জন্য। আর আপনার জন্য চা ও কাটলেট ?"

হিমাংশু উত্তর দিলে "না সবার জন্যই চা ও কাটলেট পাঠান। একবার হলে দ্বিতীয়বার আবার খাওয়া চল্‌তে পারে। কিন্তু আমরা যদি কেবল এক কাপ চা নিয়ে এতক্ষণ বেচারার আসনগুলি অধিকার করে থাকি, তবে মালিকের কতটা ক্ষতি হয়—সেটা ভেবে দেখুন। এরপর তবে তিনি আমাদের এখানে আসর জমাতে দেবেন না। কেবল নিজেদের দিক্‌টা দেখলেই তো চলবে না। অন্যের কথাও ভাবতে শিখুন। এরপর যদি রাজ্য শাসনের দায়িত্ব আপনাদের হাতে আসে তবে আরাম দাঁর মত লক্ষ লক্ষ লোকের স্বার্থের কথা ভাবতে হবে। সুতরাং এখন থেকেই সে দায়িত্ববোধ আমাদের মধ্যে জাগা উচিত।"

রজনী বাবু প্রসঙ্গান্তরে বল্লেন "শুনলাম এবারের নির্বাচনীতে ব্যারিস্টার মৃণ্ময়ও কংগ্রেস টিকিটে দাঁড়াচ্ছেন। আপনি কিছু শুনেছেন হিমাংশুবাবু ? তিনি তো আপনার দাদা।"

"আপনারা যতটুকু শুনেছেন,—ঠিক ততটুকুই আমি জানি। যে ইচ্ছে দাঁড়ান। ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে আমাদের কোন

আক্রোশ নেই। আমাদের বিদ্রোহ কংগ্রেসের বিশ বছরের কুশাসনের বিরুদ্ধে। আমাদের বিদ্রোহ কালবাজারী, চোরা-কারবারী, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। গালমন্দ দিয়ে নয়। বিশ বছরে প্রতি বিভাগে প্রতি প্রতিষ্ঠানের অবনতির ছবি চিত্রিত করে পাব্লিকের সামনে তুলে ধরাই হবে আমাদের কাজ। আসুন আজ হতে আমরা পরস্পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্টি গুলিতে বিভেদ ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে কংগ্রেস প্রশাসনের বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলি। দেওয়ালে দেওয়ালে, গাছে গাছে সর্বত্র কংগ্রেসের অপশাসনের দৃষ্টান্ত ফুটিয়ে তুলুন-কার্টুং এঁকে, ছড়া কেটে।"

চা ও কাটলেট সহযোগে রাজনৈতিক গরম আলোচনা "আপরাহ্নিক আনন্দলহরী"কেও গরম করে রাখলো।

১৫

কয়েকটা চিঠিতে রবি মৃণ্ময়কে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। রবিকে মৃণ্ময়ের কীর্ত্তিব কথা কিছুই জানতে দেওয়া হয়নি। রবির নিষ্পাপ, সরল মনে হয়ত গভীর বেদনার ছাপ পড়বে—এই কারণে সুতারা, সমরবাবুরা পারিবারিক বিপর্য্যয়ের কোন খবরাখবরই রবিকে জানতে দেননি।

মৃণ্ময় ও রবি দুজনই একসঙ্গে স্বদেশী দলে যোগ দিয়ে ছিল—তাই উভয়ের অন্তরের মিলও ছিল বেশী। শান্তিনিকেতনেও কয়েক বছর দু'জন একসাথে ছিল। এইসব কারণে রবির মৃণ্ময়েব প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তাই প্রতিবারই যখন সমরবাবুরা তার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, প্রতিবাবই সে মৃণ্ময়কে দেখতে চাইত। নিজের সহোদব ভাই কবিব প্রতি তার এতটা টান দেখা যায়নি—যতটা দেখা গেছে মৃণ্ময়েব জন্য।

এই কারণে সুতারার মাতৃহৃদয় চেয়েছিল মৃণ্ময় একবার রবিকে দেখে আসুক। তার সরল হৃদয়ে মৃণ্ময় যেন আঘাত না দেয়। সুতারার আদেশে এই প্রস্তাব নিয়ে হিমাংশু গিয়েছিল মৃণ্ময়ের কাছে।

কিন্তু হিমাংশুর মুখে রবিকে দেখতে যাবার প্রস্তাব শুনে মৃণ্ময় হেসেই তা উড়িয়ে দিয়ে বল্লে—"আমার এত অফুরন্ত সময় নেই যে পাগলকে দেখবাব জন্য ছুটবো।"

কথাটা হিমাংশুর কাণেই কেবল বিসদৃশ ঠেকল না। সে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল মৃণ্ময়ের মুখে এ ধবণের কথা শুনে। সে খানিকক্ষণ মৌন থেকে বল্লে—"বড়দা, রবি আমাদের ভাই। সে কথা কি তুমি ভুলে গেলে? একদিন তুমি ও রবি উভয়ে ছায়ার মত চলেছো। আজ তার এই সর্বনাশের মূলে কি তোমার কোন দায়িত্ব

নেই? তুমি জানতে তার মন কোমল। তবু তুমিই তাকে সন্ত্রাস-দলে টেনে ছিলে। পরিণামে সে আজ পাগ্‌লা গারদে।"

মৃণ্ময় ব্যঙ্গ করে বল্লে "পলিটিক্স করতে যেয়ে যে এতটা সেন্টি-মেণ্টাল হয়, তার অমন হওয়া উচিত। এজন্য আমি দায়ী নই। দায়ী সে নিজে। "যাক্, এ সব অবান্তর কথা। আমার নিজের অনেক কাজ। এভাবে সময়ের অপব্যবহার করবার মত আমার সময় নেই।"

হিমাংশু মৃণ্ময়ের উক্তিতে যেমন বিরক্ত, তেমনি দুঃখিত হয়ে প্রসঙ্গান্তরে বল্লে, যাক্ এসব প্রসঙ্গ। তুমি নাকি আবার কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দিয়েছো?"

"হ্যাঁ ভেবে দেখলাম রাজনীতি যদি করতেই হয়,—তবে কংগ্রেসের হাত ধরাই শ্রেয়ঃ। অন্য আর কোন পার্টির উপর আস্থা রাখা সম্ভব নয়।

তুই তো শুনলাম কংগ্রেস ছেড়ে "বাংলা কংগ্রেসে" যোগ দিয়েছিস্। এতকাল তুই তো আমাদের কংগ্রেসের গুণগান কত শুনিয়েছিস্। এখন হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন বা পার্টি পরিবর্ত্তনের কারণ কি?"

হিমাংশু স্মিতহাস্যে উত্তর দিল "আমাকেও তবে বলতে হয় এতকাল কংগ্রেসের মধ্যে যে আদর্শের আশা নিয়ে ঘুরেছি, এখন কংগ্রেসে আর সেই আদর্শ খুঁজে পাই না। যথার্থ দেশাত্মবোধ বা স্বাদেশিকতা এদের মধ্যে নেই। সবাই যেন আপন আপন পুঁজি ভর্ত্তি করতে ব্যস্ত। যে সংস্থা একদিন যথার্থই স্বাধীনতার সংগ্রামে নেবেছিল ও বৃটিশ শাসকের হাতে নিগৃহীত হয়েছিল—কংগ্রেসের সেই আদর্শ আজ আর নেই। কংগ্রেস আজ দেশের শাসকের দল। এই দুই ভূমিকার মধ্যে বিরাট ব্যবধান। সংগ্রামী কংগ্রেস ছিল সর্বহারাদের, রিক্ত মানুষের। অজস্রের মালিক হলেও তাকে রিক্ত হয়ে কংগ্রেসে ঢুকতে হয়েছিল—যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন,

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু। কিন্তু আজকের কংগ্রেস কারা অধিকার করে বসেছেন? যারা সংগ্রামী কংগ্রেসের নামে শিউরে উঠত, কংগ্রেস কর্মীর দুঃখ কষ্ট, নির্য্যাতনে যাদের মধ্যে আনন্দের উৎস দেখা দিতো,—আজ তাঁরা কংগ্রেসের 'পলিসি মেকার'। সেই শিবিরের ডিক্টেটাব। যারা শাসক শ্রেণীর সঙ্গে একজোট, কংগ্রেসীদেব নির্যাতনকে সমর্থন করেছে বা শাসক শ্রেণীব সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রকৃত কংগ্রেস কর্মীদের নির্য্যাতন করেছে, তাদের প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে কেউ জানতো না বা চিনতো না। শোনেনি কেউ কখনও তাদের নাম। আজ তারা গদীর অধিকারী হয়েছে কেবল আপন কূট বুদ্ধিমত্তার জোরে। যথার্থই গদীতে অধিষ্ঠিত হবার কোন গুণ তাদেব নেই। তাই কংগ্রেস আজ আর কাউকে আকৃষ্ট করে না।

তোমায় বলছি বড়দা, কংগ্রেস যদি তার 'পলিসি' না বদলায় তবে তাকে গদী ছাড়তেই হবে। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।'

"রেখে দে তোদের ভবিষ্যৎ বাণী। ভুঁই ফোঁড় এক গাদা পার্টি হয়েছে। তুই কি মনে করেছিস্ জনসাধারণ এত বছরের গৌরব মণ্ডিত কংগ্রেস পার্টি অপেক্ষা এই সব অর্বাচীনদের পার্টিতে বেশী আস্থাবান্ হবে? কখনই নয়। বিশ বছর কংগ্রেস যেমন সর্বত্র একছত্র ভোটাধিক্যে শাসকের আসন পেয়েছে,—তেমনি দেখবি চতুর্থ নির্বাচনীতেও তার ব্যক্তিক্রম হবে না। যত বেশী পার্টি দেশে গড়ে উঠবে—কংগ্রেসের পক্ষে জয় লাভের তত বেশী সম্ভাবনা। কারণ ভোট ভাগাভাগি হলেই কংগ্রেসের জয়লাভ অনিবার্য্য।"

হিমাংশু স্মিতহাস্যে উত্তর দিল "বড়দা, এবার বোধ হয় তোমাদের গণৎকারের গণনা ভগবান উল্টে দেবেন। এবার যুক্ত ভাবেই কয়েকটি পার্টি মিলিত হয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

দীর্ঘ বিশ বছর কংগ্রেস প্রশাসনে ভারতের যে দুরাবস্থা হয়েছে—

সেটাই তো হবে আমাদের নির্বাচনী সভার মোক্ষম প্রচার পত্র। কংগ্রেস যেমন বামপন্থী দলগুলিকে গালি গালাজ করছে, তেমনি গালি গালাজ কংগ্রেসকে করার আমাদের প্রয়োজন হবে না। আমরা জনসাধারণকে বলবো গত বিশ বছরে সর্বতো ভাবে দেশের কি পরিণতি হয়েছে,—সেই ছবিটিই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরব ব্যালেট বক্সে ভোট ফেলার আগে।

যাক্, এখন তবে উঠি। তোমার অনেক মূল্যবান্ সময় হয়ত নষ্ট করলাম" বলে হিমাংশু মৃণ্ময়ের প্রতি কোন রকম দৃষ্টিপাত না করে কক্ষ ত্যাগ করলো।

মৃণ্ময়ের বাড়ী হতে বের হয়ে আনমনা ভাবে হিমাংশু পায়ে হেঁটেই বাড়ীর দিকে রওনা হল। নানা চিন্তার রাশি ভিড় করেছে তার মনে। বার বারই তার মনে প্রশ্ন জাগছে—এই কি তাদের সেই আদর্শবান্ স্নেহময় বড়দা? এত পরিবর্ত্তন কি করে সম্ভব হল মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যে? যে চন্দ্রিকাকে বড়দা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন, ভালবেসে যাঁকে বিয়ে করেছিলেন—তাঁকে অকারণে ত্যাগ করলেন। ভাইদের মধ্যে যে রবি বড়দার সব চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল,—আজ কিনা অক্লেশে তার সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি করলেন। রবির জন্য তাঁর আজ এতটুকু দুঃখ নেই। অথচ প্রথম যেদিন রবি পাগল হয়ে রাঁচীতে স্থানান্তরিত হচ্ছে খবর এসেছিল—সেদিন এই বড়দা শিশুর মত রবির জন্য কেঁদেছিল।

হিমাংশুর মন যেন কিছুতেই আজকের মৃণ্ময়ের মধ্যে তাদের প্রিয় বড়দাকে খুঁজে পাচ্ছে না। তার সমস্ত মন কি এক অব্যক্ত বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তাই ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি সব কিছু বাদ দিয়ে—পায়ে হেঁটে আপন মনে নানা চিন্তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এগিয়ে চলেছে হিমাংশু!

১৬

বছর খানেক পর।

সমববাবু ও স্নুতারা উভয়েই আজ ভগ্নমনা ও ভগ্নস্বাস্থ্য। মনের স্তরে স্তরে যেন তাদের দুঃখের কীট বাসা বেধেছে। যে পরিবার একদিন আত্মীয়, সমাজ ও দেশে সবাব আদর্শ স্থানীয় ও ঈর্ষ্যার বস্তু ছিল—সমরবাবুর সেই সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে।

রবি অস্তাচলে গেছে রাঁচীর পাগ্‌লা গারদের অন্তরালে। রবির শোক আবার নূতন করেই পীড়া দিল সমরবাবু ও তার স্ত্রীকে। রবির গানের কলি যেন আজও ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে বাতাসে। রবির অবস্থা খারাপ খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে ছিলেন তাঁরা, হিমাংশু ও চন্দ্রিকা। কিন্তু রবির রশ্মি নিষ্প্রভ হয়ে গেল। ডাক্তারের সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ করে রবি চলে গেল। রবি যাবার আগে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। জেলসুপার সমরবাবুকে রবি সম্বন্ধে অনেক খবরাখবরই দিলেন,—যা সম্পূর্ণ নূতন আলোর সন্ধান দিল রবি সম্বন্ধে।

রবির মধ্যে দেখা গিয়েছিল ধর্মভাব। রাতদিন সে কীর্ত্তন গাইত। কেউ যদি বলতো "রবিদা কীর্ত্তন নয়। আপনার মুখে সেই সব স্বদেশী গান শুনতে ভাল লাগে। উত্তরে রবি বলতো—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

অর্থাৎ হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, গোপীদের হৃদয়েও নয়, আমি বিরাজ করি শুধু যেখানে ভক্তরা কীর্ত্তন করে।

পরপারে যাবার সময় হয়েছে। তাই পারের কড়ি কিছু সঞ্চয় করছি, দেশ স্বাধীন যখন হয়েছে,—তখন স্বাধীনতার সেই চারণ

কবিদের দিন ফুরিয়ে গেছে। সারা জীবন পুণ্য সঞ্চয় কিছুই করিনি। তাই যাত্রা কালে একটু নাম গান করছি।”

রবির পরিবর্ত্তনে কর্তৃপক্ষরা সন্তুষ্ট হয়ে যখন তাকে বাড়ী ফিরবার অনুমতি দেবেন স্থির করেছেন, সেই সময়ই মাত্র কয়েকদিনের সামান্য জ্বরে রবি অস্তমিত হ'ল। অবশ্য সমরবাবু ও সুতারাদের সবাইকে সে চিনতে পেরেছিল। সবার সঙ্গেই সে হেসে কথা বলে গেছে। ভাইদের দাদাদের কাউকে সে ভুলেনি। সকলের খুঁটি-নাটি খবর জিজ্ঞেস করেছে। মহাপ্রস্থানের যাত্রীর কাছে কেউ পরিবারের ভাঙ্গা ছবিটি খুলে দিয়ে তার ইহলোকের শেষ মুহূর্ত্তগুলি বিষাদময় করেনি।

চন্দ্রিকাকে দেখে সে হৃষ্ট চিত্তে বলেছে “তোমাকে আমি ছোট বেলা হতে বৌদি বলেই ভাবতাম। তুমি যে সত্যি আমার বৌদি হয়েছো দেখে সুখী হলাম। আমি জানি মামা মামীমার আর কোন দুঃখ থাকবে না তোমার মত পুত্রবধূ পেয়ে। বড়দার জীবনে উন্নতির পথ তুমি সুগম করবে।” এমনি ধারা কত হাল্কা কথাই যাবার দুদিন আগে তাদের সঙ্গে বলেছে।

সমরবাবু কলকাতা হতে বড় ডাক্তার আনালেন—কিন্তু কেউ বিধির বিধান খণ্ডন করতে পারল না। রবি চলে গেল। যাবার আগে রবি বলেছিল “মামীমা, সারা জীবন কেবল তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েই রইলাম। এখানে এসেও মামা ও মেজদার আমার জন্য ডাক্তারদের কাছে ছুটাছুটির অন্ত নেই। কিন্তু বৃথা তাঁরা কষ্ট করছেন। আমার বহুদিনের ঈপ্সিত দিন যে এসে গেছে। অহর্নিশি তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ার থেকে আমি আজ অব্যাহতি পাব —এ যে আমার কি আনন্দের দিন তা তোমাদের কি করে বুঝাব?”

রবির গুণগান জেলের সবাই করেছে। যখনই সে কিছুটা স্বাভাবিক থাকতো তখনই সে অন্য রোগীদের যথাসম্ভব সাহায্য

করতো। নানাভাবে তাদের উৎসাহিত করতে চেষ্টা করতো। সবার সঙ্গে সে নিজেকে সুন্দরভাবে মিশিয়ে দিয়েছিল।

রবির কথা যতই তাঁরা শুনলেন,ততই তাঁদের মন বিষাদে পূর্ণ হয়ে গেল। রবি পাগলা গারদে থেকেও নিজেকে সর্বতোভাবে বিকশিত করেছিল। কিন্তু অন্যরা? মৃণ্ময়, তন্ময়, কবি—এরা সমরবাবু ও সুতারার সব আদর্শকে ধূলিসাৎ করে যেন যুগের ধর্মে মেতেছে। তাদের মধ্যে সমরবাবু ও সুতারার কোন প্রভাবই আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

মাঝে মাঝে সমরবাবু ভাবেন কি করে তা সম্ভব হল? যাঁরা জন্মদাতা, যাঁদের সাহচর্যে কেটেছে বাল্য, কৈশোর, যৌবন—হঠাৎ চাকরী জীবনে ঢুকেই তাঁদের সমস্ত প্রভাব মুছে ফেলে, তাঁদের আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়ে—কোন্ আলেয়ার পিছনে এরা ছুটেছে? একদিন যখন তারা মোহমুক্ত হবে,—তখন অনুতাপের সীমা থাকবে না। কিন্তু তা দেখবার জন্য তাঁরা বেঁচে থাকবেন না। সমরবাবু জানেন কেবলমাত্র যুগের হাওয়ার প্রভাবেই তারা বিপথগামী হয়নি। পরন্তু তথাকথিত আত্মীয়দেব কুচক্রের জালে পড়েছে। আত্মীয়দের স্বরূপ তারা এখনও চিন্‌তে পারেনি। এদের রসাতলের পথে তারা ঠেলে দিয়েছে এবং একদিন এরাই যখন ডুবে যাবে—তখন যারা তাদের এ পথে টেনে নিয়েছে,—তারাই আবার উপহাস করবে, নানা রূপ ব্যঙ্গে এদের ক্ষত বিক্ষত করবে। কিন্তু সেই অনাগত দিন না আশা পর্যন্ত সমরবাবুর সন্তানেরা এদেরই পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে,—তাদেরই পরামর্শে বিদ্রোহের দামামা বাজিয়ে—উশৃঙ্খলতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে।

কিন্তু এদেরই পাশে রবিকে তুলনা করা চলে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে একটি অপকর্ম করে বেচারী সারা জীবন কি দুঃসহ দুঃখ ভোগ করেছে। শেষে নিজেকে সবার সঙ্গে বিলিয়ে দিয়ে কিছুটা শান্তি সে পেয়েছে। নিজের গুণের সৌরভে চারিদিক আমোদিত

করে গেছে। সমরবাবু যে এমনটি চেয়ে ছিলেন। তাঁর প্রতিটি সন্তান যেন কীর্ত্তিমান হয়। মানব জীবন নশ্বর। তার কীর্ত্তি অমর। কীর্ত্তির মধ্য দিয়ে তাঁর সন্তানরা শাশ্বত কাল অমরত্ব লাভ করুক—এই তিনি চেয়েছিলেন। মানুষ যা ভাবে, তা যদি এই পৃথিবীতে ঘটত, তবে তো মানব জীবনে এত দুঃখ বেদনা নিরাশার আঘাত থাকতো না। মানুষের ঈপ্সিত বস্তু তার আয়ত্তের বাইরে বলেই, মানুষ সেই পরমাত্মার দুয়ারে ধন্না দেয়। তাঁকে ডাকে। তাঁর করুণা ভিক্ষা করে। কিন্তু তা যদি না হোত—হয়ত পৃথিবীর চেহারা আরও ভয়াবহ হোত। সীমার মধ্যে মানুষ বদ্ধ। তাই অসীমের পানে সে ছুটে যেতে চায়। অসীম যদি মানুষের অনায়াস লভ্য হোত—তবে পৃথিবীতে পাপ, অনাচার, ব্যাভিচারের স্রোত আরও ভয়াবহ হোত।

১৭

কয়েক বছর পর।

চণ্ডালিকা কলকাতার একটি কলেজের অধ্যাপিকা। চন্দ্র একটা বিদেশী ফার্মের "পারচেইসিং অফিসার।" চন্দ্রকে মাঝে মাঝে বিদেশেও 'টুরে' যেতে হয়। ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে ভাই বোন থাকে। ছোট্ট সংসারের সব কাজই চণ্ডালিকা যতটা সম্ভব নিজের হাতে করে থাকে। একটি ঠিকা ঝি আছে। সেই রেশন তোলা ও ঘরের অন্যান্য কাজে চণ্ডালিকা.ক সাহায্য করে থাকে।

চন্দ্রিকার তরফ হতে প্রয়োজনে হিমাংশু তাদের অভিভাবকত্ব করে থাকে। চণ্ডালিকাও চন্দ্রিকাব মতই কাজে কর্মে স্বভাবে ব্যবহারে পটু। চন্দ্রিকা শ্যামাঙ্গী। চণ্ডালিকা গৌরাঙ্গী ও সুন্দরী। মা বাবা মরা ছেলেমেয়ে, সমরবাবু ও সুতারা যেটুকু স্নেহ করেন, সেইটুকু মাত্র স্নেহই তারা পেয়ে থাকে। দুই পক্ষের সন্তান-সন্ততিদের মানুষ করবার উপযোগী খুব বেশী অর্থ প্রভাকরবাবু রেখে যান্‌নি। প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের দাঁড় করিয়ে বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। চন্দ্রিকার বিয়েটাও দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু শেষের দুই সন্তানের কপালে কিছুই জোটেনি।

প্রভাকরবাবু তেমন কিছু রেখে যেতেও পারেন নি। উমার মত মার তত্ত্বাবধানে অম্বালিকা ও অম্বুধির বিয়ে হয়েছিল। অম্বিকাও লেখাপড়া শিখেছে ও ব্যবসা করছিল—গাজা, আফিং প্রভৃতির ব্যবসা। প্রচুর কাঁচা টাকা আসে অম্বিকার হাতে। উমার ইচ্ছা ছিল না অম্বিকা এ পথে যায়। তার ইচ্ছে ছিল অম্বিকা উচ্চশিক্ষা লাভ করে তার পিতার মত ভাল কোন চাকরীতে ঢুকে। কিন্তু ঠাকুরমার আমলেই অম্বিকা বিপথে পা বাড়িয়েছিল। উমার হাত

যশ তাকে খুব বেশী শুধরাতে পারেনি। লেখাপড়াও বেশীদূর করেনি। তাই তাব বাঞ্ছিত পথেই সে গেল। এতে কাঁচা বয়সে কাঁচা পয়সা উপার্জ্জন করা যায়। কিন্তু চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতা রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রভাকরবাবুর মৃত্যুর পর সে আলাদা হয়ে গেল। মা ও সৎ ভাইবোনদের খরচ পত্রেব দায়িত্ব এড়াতে।

অনেক দুঃখ কষ্টে উমাও চলে গেল। চণ্ডালিকা ও চন্দ্রকে আত্মনির্ভবশীল হতে হয়েছিল পাঠ্যাবস্থা হতেই। চন্দ্রিকা তাদের আর্থিক সাহায্য কিছু কিছু করতো। তাই মৃণ্ময় যখন তাকে ত্যাগ কবে, তখন চন্দ্রিকা যে চাকবী 'নয়েছিল, তা কেবল মাত্র নিজেকে ভুলে থাকাব জন্য নয়। ভাইবোনদের সাহায্য কবাও তাব একটা কারণ ছিল। যদিও সুতাবা এদের সাহায্য করতে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু চন্দ্রিকাব আত্মসম্মানে লেগেছিল। যাব পরিচয়ে তার এই গৃহে থাকবাব অধিকাব, সেই যখন তাকে ত্যাগ কবে গেল—তখন তার মা বাবার অর্থ সে কোন প্রকারে নিজে বা তাব ভাইবোনদের জন্য গ্রহণ করতে পারে না।

প্রভাকরবাবু মাবা যাওয়াব পরও যতদিন উমা বেঁচেছিল, উমা অম্বালিকা ও অম্বুধিব সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। তাদের মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী নিয়ে আসতো। কিন্তু উমা মারা যাওয়ার পর হতে লোক লৌকিকতা কববার কেহ রইল না। অম্বালিকা, অম্বুধিও কখনও এসে খোঁজ নেয়নি পিতৃ-মাতৃহীন ভাইবোন দু'টি কেমন আছে।

অতি দুঃখের পরিবাবেও রাত্রির অবসানে উষার আলো দেখা যায়। তেমনি চণ্ডালিকা ও চন্দ্রর অতি কষ্টের দিনগুলিও গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে চলেছিল। প্রতিদিন বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে চণ্ডালিকা মনে মনে ভগবানকে ডেকে বলত 'ভগবান অভাব অনটন কাটিয়ে দিনটা যেন কোন রকমে শেষ হয়।'

কারও জন্যই দিন পড়ে থাকে না। সুখীর জন্য হাল্কা পাখীর

ডানায় দিনগুলি উড়ে যায়। আর গুরু ভারবাহী গর্দ্দভের মত ধীর মন্থর গতিতে যেন দুঃখীর মুহূর্ত্তগুলি কাটে।

জীবনের সব রকম প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে চণ্ডালিকা ও চন্দ্র যেন ভগবানের সহায়তায় খুঁটি ধরে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছে। বর্ষার বন্যলতা জলের চাপে নুয়ে পড়তে পড়তে ও যেমন পারিপার্শ্বিক কিছু অবলম্বন করে বেঁচে থাকে, তেমনি নানা ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে এই দু'টি ভাই বোন আপন আপন সত্ত্বা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। আজ বিপদের ডঙ্কা শুনেও এরা শঙ্কায় বিহ্বল হয় না। পরন্তু জীবনটাকে যতটা সম্ভব সহজ, সরলভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। তাই জীবনের অতি বড় আঘাতও গভীর দাগ টানতে পারে না তাদের মনে। উমার একটি গুণ তারা পেয়েছিল। অপরের বিপদে তারা যথা সম্ভব সাহায্য করতে চেষ্টা ক'রত—কিন্তু প্রতিদানের আশা কখনও মনে পোষে নাই। কারণ তারা জানে উপকারী কখনও কৃতজ্ঞতা জানাতে পারে না। পরন্তু নিজেকে অপরের কাছে ছোট করবার লজ্জায়—যে উপকার করেছে নানা ভাবে তার ক্ষতি করবার চেষ্টা করে থাকে। এটাই সংসারের চিরন্তন নিয়ম।

হিমাংশু চন্দ্রিকার অনুরোধে এসেছে চণ্ডালিকার খোঁজ খবর নিতে। চণ্ডালিকাকে সংক্ষেপে 'চণ্ডী' নামে আপনজনেরা ডাকে। হিমাংশু এসে দেখে চণ্ডালিকা একটা কেরোসিন ষ্টোভ ধরাতে ব্যস্ত। ব্যাসিনের কাছে গুটি কয়েক বাসন পড়ে রয়েছে।

হিমাংশুকে দেখেই চণ্ডী স্মিতহাস্য অভ্যর্থনা জানিয়ে ষ্টোভে চায়ের কেটলীটা বসিয়ে—একটা বেতের চেয়ার পাশের ঘর থেকে এনে হিমাংশুকে বসতে দিয়ে বল্লে "গরমের মধ্যে এখানেই বসুন। ঝি'টা আজ কাজে আসেনি। তাই বাসন ক'টা ধুতে ধুতে আপনার সঙ্গে গল্প করা যাবে। এই ঠিকা ঝিদের হয়েছে ভারী মজা। খুসী হলে আসবে, নয়'ত আসবে না। প্রশ্ন করলে বা কিছু বল্লে 'কাজ করব

না।' হুম্‌কি দিয়ে চলে যাবে। জানে ওদের ছাড়া আমাদের চলে না।—তাই তার সুযোগটা নিতে কসুর করে না।

যাক্, খবর কি বলুন? দিদি কেমন আছেন? তাঐমশায়, মাঐমা সবাই কেমন আছেন? মৃণালের খবর কি? অনেকদিন তো আসেননি। ইলেকশন নিয়ে বুঝি খুব ব্যস্ত, ফলাফল কি রকম হবে আশা করেন?"

"তুমি তো একসাথে অনেক প্রশ্ন করলে। সংক্ষেপে উত্তর দিই এক একটার। সবাই ভাল আছেন, বৌদির তাড়াতেই আসা। বেচারী কি যে চাকরী নিয়েছেন সময় একদম তাঁর হয় না, একটি দিন যা বা ছুটি থাকে,—কিন্তু সারাসপ্তাহের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে সে-দিন এত অবসন্ন হয়ে পড়েন যে কোথাও বের হন্ না। এ নিয়ে কাকাবাবু, খুড়ীমা ও আমি কত অনুযোগ করি। তিনি হেসে উত্তর দেন্ "ইচ্ছে করে না। কিন্তু প্রকৃত সত্য যে তা নয়। তিনি যে ক্লান্ত, শ্রান্ত তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু মুখ ফুটে তা কখনও প্রকাশ করেন না। কারণ এমনিতেই সবার অমতে এ চাকরী তিনি নিয়েছেন। এ কথা প্রকাশ করলে যদি কাকাবাবু তাঁকে চাকরী ছাড়তে বাধ্য করেন, তাই কখনও আমাদের কাছে তা প্রকাশ করেন না।"

"দিদি যে কেন এত পরিশ্রম করছেন জানি না। দিদিকে বলি তুমি আমাদের কাছে চলে এসো, তিন ভাই বোন বেশ সুখে থাকবো। কি দরকার রোদ বৃষ্টি মাথায় করে এই চাকরী করার? আমরা কি আমাদের দিদির ভরণ পোষণ চালাতে পারি না? মা থাকলে আমরা কি তাঁর ভরণ পোষণ চালাতম না?

দিদি দুঃখের হাসি হেসে বলে 'ভরণ পোষণের দায়িত্ব যার—সেই যখন বিনা অপরাধে সে দায়িত্ব চুকিয়ে গেল, তখন তোরা ছোট ভাই বোন ছোটবেলা হতে কেবল দুঃখ কষ্টই করে আসছিস্, এখন যা-ও বা একটু মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিস্ আমার ভারে তা আর নুইয়ে

দিতে চাই না। তাছাড়া তোদেরও তো ঘর সংসার করতে হবে। আমার জন্য আমি কাউকে বঞ্চিত করতে চাই না।

আরও, যতদিন আমার শ্বশুর শাশুড়ী বেঁচে আছেন—তাঁদের পরিচর্য্যা করা আমার কর্ত্তব্য। আমি তো জানি তাঁরা কত স্নেহশীল কিন্তু অবলম্বনহীন। আজ জীবনের সায়াহ্নে কত দুঃখ তাঁদের। আমি কাছে থাকলে যদি তাঁদের কিছুটা শান্তি আসে,—তার থেকে আমি তাঁদের বঞ্চিত করতে চাই না। এক এক করে সবাই তো তাঁদের ত্যাগ করেছে—একমাত্র হিমাংশু ঠাকুরপো ছাড়া। তোরা সুখে শান্তিতে সংসার কর,—তাই দেখে আমি সুখী হ'ব।'

কি করি বলুন? কিন্তু এভাবে খাটলে যে দিদির টি, বি হবে।"

"আমিও তো রাতদিন সে কথাই বলি। বলি চাকরীই যদি করবে, তবে কোন অফিসে চাকরী কর। ১০টা-৫টা কাজ করবে। রোদ বৃষ্টি মাথায় করে ঘোরাফেরা করতে হবে না।"

বৌদি তখন করুণ মুখ করে বললেন 'সে চাকরী কি আমার পক্ষে খুব সম্মান জনক হবে? আমার মর্য্যাদা কি আমি তাতে পাবো? সাধারণ কেরানীর চাকরী ছাড়া আমার এ বিদ্যায় বড় কোন চাকরী জুটবে না। অন্যের মনোরঞ্জন করবার প্রয়াস নেই এই চাকরীতে। স্বাধীনবৃত্তি। আয়ও কয়েকটি কেরানীর মাইনা, আর রোদ বৃষ্টি আমি গ্রাহ্য করি না। আমি চাই নিজেকে ভুলে থাকতে। আমার মনের কথা তোমরা কেউ চিন্তা কর না। দেহের ক্ষতি আমার হবে না। যতক্ষণ মন আমার শক্ত থাকবে।'

যাক্, তোমার অন্য প্রশ্ন ইলেক্শনের খবর তো তোমরাই দিতে পার। তোমাদের বাম কমিউনিষ্ট পার্টিই তো যত গোলমাল সুরু করেছ। গত ইলেক্শনে কি তোমরা অতটা সিট্ পেয়েছিলে যে এবার যুক্তফ্রণ্টের মোর্চায় আসতে বলায় অতগুলি সিট্ দাবী করছো? তোমাদের একটা পার্টিকে অত সিট্ দিলে,—অন্যান্য পার্টির কপালে কি জুটবে?"

"ভারতীয় কমিউনিষ্টরাই বা আমাদের সেন্টারে তাদের প্রার্থী দিচ্ছে কেন? দোষ কি শুধু আমাদের? এটা তো মেনে নেবেন কংগ্রেসের পর বাংলা দেশে আমাদের পার্টির সংখ্যা গরিষ্ঠতা।"

"কাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা তা গলার জোরে সাব্যস্ত করা যাবে না। এবারের নির্বাচনের ফলাফলে তা প্রমাণ হবে। তবে জেনে রেখো—এই আত্মকলহের সুযোগ কংগ্রেস গ্রহণ কববে। বাম-দক্ষিণ কমিউনিষ্টের দলাদলির সুযোগে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোট ভাগাভাগির ফলে কংগ্রেস প্রার্থীই শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে যাবে।"

"যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সুতরাং এখনই এমন মন্তব্য স্বীকার করতে আমি রাজী নই।"

বাসনগুলি ধুয়ে যথাস্থানে রেখে চণ্ডী বল্লে "ঐ দেখুন, তর্কে এত মেতে গেছি যে আপনাকে চা দিতেও ভুলে যাচ্ছি। একটু অপেক্ষা করুন গোটা কয়েক লুচি ভেজে দিই। আব যদি অপেক্ষা করতে রাজী না থাকেন তবে পাশের পরেশ ময়রার গরম সিঙ্গারা কিনে আনুন। সবে কলেজ হতে ফিরেছি। আমারও চা খাওয়া হয়নি।"

"চন্দ্র কোথায়? সে কি আবার টুরে গেছে।?"

"হ্যাঁ, সে জেমসেদপুর গেছে। চন্দ্র হয়েছে ঠিক দিদির মত। আমি হ'লে এত টুরিং এর কাজ কখনও গ্রহণ করতাম না। কি কষ্ট এসব কাজে। অথচ এতে যেমন আনন্দ পায় দিদি, তেমনি চন্দ্র।

শুনছি এবার কংগ্রেস হতে আপনার বড়দা দাঁড়াচ্ছেন?"

"তাই তো শুনলাম। এরা হ'ল সুবিধাবাদী। এদের চক্ষুলজ্জাও নেই। সুতরাং কোনদিন যদি বড়দা তোমাদের পার্টি হ'তে দাঁড়ায় তাতেও আমি আশ্চর্য্য হব না। দেখলে তো বড়দার কাণ্ডটা! গিন্নী সোসাইটি করতে যায়। আর কর্ত্তার পলিটিক্স। তাই সন্তান পালনে তাদের উদ্‌বৃত্ত সময় কোথায়? তাই একমাসের শিশুকে খুড়ীমার কাছে ড্রাইভার ও একজন আয়া মারফৎ পাঠিয়ে দিয়ে

লিখেছিল—'পরের ছেলে মানুষ করার অভ্যেস তো তোমার আছে, আমার ছেলেটাকেও মানুষ কর।'

এই বয়সে তাদের দেওয়া আঘাত সহ্য করে খুড়ীমার পক্ষে এই দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন করেনি। বা তা চিন্তাও করেনি। এ যেন জুলুম। আমাকে ডাকিয়ে বৌদিকেই কৃতার্থ করতে চেয়েছিলেন এই দায়িত্ব দিয়ে। আমি যখন আমার জবানীতে কঠিন উত্তর দিলাম, তখন খুড়ীমার উপর এই অন্যায় দায়িত্ব চাপিয়েছেন।"

"শুনেছি সবই। কিন্তু তাঐমশায়ের মত লোক আপনার বড়দার এই ধৃষ্টতা মেনে নিলেন কেন?"

"না, তিনি তা মেনে নেন্নি। তিনিও তেমনি পত্র পাঠ শিশুটিকে ফেরৎ পাঠালেন। কিন্তু ঐ যে বল্লাম স্বার্থ সিদ্ধির সময় ওদের গণ্ডারের চামড়া হয়ে যায়। আবার একদিন চুপিসারে সাহেবের আয়া শিশুটিকে এনে খুড়ীমার কাছে শিশুর দুরাবস্থার কথা সবিস্তারে বলে খুড়ীমার কোমল মন জয় কর'ল। খুড়ীমার মত মহিলা যিনি আমাদের মত দশটা আত্মীয়ের অপগণ্ডকে কোলে করে মানুষ করেছেন, তাঁর পক্ষে কি নিজের ফুটফুটে নাতিকে বার বার ত্যাগ করা সম্ভব? বড়দা খুড়ীমার এই দুর্বলতার কথা জানেন বলেই তো এতটা সাহস পেয়েছিলেন।"

"দিদি কিন্তু কখনও এ সম্বন্ধে কিছু বলেন না। মৃণাল তো এঁদের আদর যত্নে বেশ বড় হয়ে উঠ্ছে।"

"বৌদি নির্লিপ্ত। হয়ত মনে মনে হাসেন সাহেবের ব্যাপার দেখে। কিন্তু জানই তো তিনি কি রকম চাপা প্রকৃতির মেয়ে। তাই কখনও এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে শুনি নাই। মৃণালের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণও দেখি না বা সৎ মা তুল্য দুর্ব্যবহার করতেও দেখি না বা শুনি না। পরন্তু যে স্নেহ তিনি তাকে করেন —তা মৃণালের হতভাগ্যের জন্য। মৃণালের প্রতি সহানুভূতি বা সমবেদনা প্রকাশের জন্যই—যত্ন, স্নেহ করে থাকেন। তোমার

মার অদৃষ্টে জুটেছিল সৎমা, সৎ শাশুড়ী, তিনি নিজে হয়েছিলেন সৎ মা, ভাগ্যের পরিহাসে তোমার দিদিকেও মৃণালের সৎমা হ'তে হয়েছে এমন একটা সাধারণতঃ দেখা যায় না।"

"যতই আপনার বড়দাকে দেখছি, ততই অবাক্ হচ্ছি—এই ভেবে যে তাঁর মধ্যে এত পরিবর্ত্তন কি করে সম্ভব হ'ল? মাঐমা তাঐমশায়ের মত লোকের এমন সন্তান কি করে হ'ল? নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মৃণালের প্রতিও আপনার বড়দা ও তস্য দ্বিতীয় ভার্য্যার কোন মায়া, মমতা বা আকর্ষণ নেই!"

"বড়দার এই সুখের নীড়ও বোধ হয় ভাঙ্গতে খুব বেশী দেরী নেই। এ আমি তোমাকে বলে গেলাম। আজ তার কারণ জিজ্ঞেস কব না।

যাক্, আর বেশী দেরী করবাব মত সময় আমার নেই। বৌদি বলে পাঠিয়েছেন এই রবিবার তোমরা দুই ভাই বোন তার কাছে কাটাবে। সকালে যাবে রাত্রে ফিরবে। সুতরাং ঝি'কে সারাদিনের জন্যই সেদিন ছুটি দিয়ে দিও।"

"দিদিকেই বরং রবিবার আমাদের এখানে এসে সারাদিন কাটাতে বলবেন। সত্যি বলতে কি দিদির বাসায় সত্যি আমার যেতে ইচ্ছে করে না। অবশ্য মাঐমা, তাঐমহশায় ও আপনার অকৃত্রিম স্নেহকে অস্বীকার করতে পারি না বলেই যাই। তবু মনে হয়—এ যেন অনধিকার চর্চ্চা হচ্ছে।"

"আমি অত জানি না। দরকার হয় বৌদিকে ফোনে জানিও। আমাকে জানাতে বলেছেন আমি জানিয়ে গেলাম।

তোমার মত নিক্তি দিয়ে অধিকারের বাছ বিচার আমরা করতে জানি না। তাই আপন জন মনে করেই তোমাদের ডেকে থাকি। তাছাড়া ছুটির একটি দিন বৌদি শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা বাদ দিয়ে এখানে এসে স্ফূর্ত্তি করবেন বলে আমার মনে হয় না। হোলো, এবার উঠি।"

"সে কি রাগ করে উঠে যাচ্ছেন কোথায়? অপরাধ হয়েছে—মাপ চাচ্ছি। লুচি তৈরী হয়েছে। গরম চা ঢেলে দিচ্ছি।"

"তোমাদের মেয়েদের এই খাওয়ানোর স্বভাবটা বোধ হয় কোন দেশে কোনকালেই যাবে না। এখানে তোমরা সবাই সমান। যেন একই মাটিতে তৈরী।"

১৮

নির্বাচনী প্রস্তুতি চলেছে সর্বত্র। প্রতিপক্ষকে ছড়ার মাধ্যমে আক্রমণ। কার্টুনের ফেষ্টুন উড়ছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, ময়দানের গাছে গাছে। দেওয়ালগুলির রঙ্ বেরঙ্ হয়েছে নানা রং বেরং এর ছড়ার গানে। কংগ্রেস, বাম কমিউনিষ্ট ও যুক্তফ্রন্ট—এই তিনদলের নির্বাচনী প্রতিযোগিতার মহড়া ভাল ভাবেই চলেছে। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে উদ্দেশ্য করে কেবল কৌতূক রসের ছড়া কেটেই নিবৃত্ত হয়নি। কাব্যশাস্ত্রে যত রকম রস আছে যথা—শৃঙ্গার, ধীব, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, শান্ত—প্রায় সব রকম রসের ছড়া দেওয়াল প্রাচীরে নানা রঙেব কালিতে শোভা পাচ্ছিল। বাম কমিউনিষ্ট যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধেও নানা ছড়া কেটেছে, প্রতিপক্ষও বাদ দেয়নি বাম কমিউনিষ্ট পার্টিকে।

মৃণ্ময়ের পক্ষে নিবাচনী প্রস্তুতি চলেছে। মৃণ্ময় সদা ব্যস্ত। বাড়ীতে রাতদিনই তার কর্মীবৃন্দের ভিড়। কার্টুন ও ফেষ্টুন নিয়ে শ্লোগানে পাড়া মুখরিত করে তারা চলেছে। কিন্তু নির্বাচনী প্রস্তুতিতে মৃণ্ময় তার মন প্রাণ ঢেলে দিতে পারে নাই। মন তার অশান্ত।

চম্পা যেন ক্রমেই তার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। সব সময়ই সে মিষ্টার সিম্‌সনের সঙ্গে। লাঞ্চ, ডিনারও এখন প্রায়ই তার সঙ্গে শেষ করে আসে। পূরোপূরি সোসাইটি গার্ল সে। মৃণ্ময় স্ত্রীকে এতখানি অবাধ স্বাধীনতা দিতে নারাজ। এই নিয়ে চম্পার সঙ্গে তার প্রায়ই কলহ বিবাদ চলেছে।

চম্পা তাকে বিদ্রূপ করে জানায় কুল ললনার মোহ যদি এখনও থাকে, তবে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেই পারে। কিন্তু তার পক্ষে

কেবল 'স্বামী পরমগুরু' মন্ত্র জপ করা, স্বামীর সেবা, স্বামীর পরিচর্য্যা বা স্বামীর মনোরঞ্জন করা সম্ভব নয়। বাইরের অনেক জরুরী কাজ তার অপেক্ষায় আছে। সুতরাং যে কাজ আয়া, বাবুর্চিকে দিয়ে হয়, সেসব কাজের জন্য চম্পা তার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে পারে না। সে জানায় স্বাধীন দেশের মেয়েদের মত সে স্বাধীনতা চায়। নানা ভাষাভাষি নানা রাষ্ট্রের গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

মৃণ্ময় জানায় কিন্তু বিশেষ একজনকে নিয়ে এতটা আতিশয্য ভারতীয় সমাজে শোভনীয় নয়। সুতরাং মিষ্টার সিমসনের সঙ্গে তার এতটা গাঢ় হৃদ্যতা তার অভিপ্রেত নয়।

চম্পা মৃণ্ময়কে নানাভাবে উপহাস করে। বিশেষ করে তার পিতার টাকায় ব্যারিস্টার হয়ে সমাজে তার কৌলিন্য বাড়িয়েছে, সে কথাও জানাতে বাদ দেয় না। চম্পাকে সোসাইটির লোভনীয় করে গড়ে তুলতে মৃণ্ময়েরই ছিল চেষ্টা। চম্পার সৌন্দর্য দশের ঈর্ষ্যার বস্তু হউক—এতেও ছিল মৃণ্ময়ের উৎসাহ ও প্রেরণা। কিন্তু তখন সে বোঝেনি এর পরিণতি কোথায় যেতে পারে। তাই সেই দুর্বার উশৃঙ্খলতার বান যখন চম্পার মধ্যে দেখতে পেলো, মৃণ্ময় রাশ টানতে চেষ্টা কর'ল। কিন্তু ফল কিছু হ'ল না। বল্গা ছিঁড়ে গেল। চম্পার উদ্দাম যৌবন তরঙ্গ রোধ করা গেল না।

একদিন মৃণ্ময় যখন নির্বাচনী সভার থেকে বের হয়ে নিজের 'কারে' উঠতে যাবে, এমন সময় একজন অপরিচিত লোক মৃণ্ময়ের হাতে চম্পার হাতের লেখা একটা চিঠি দিয়ে গেল।

বিস্মিত মৃণ্ময় চিঠিখানা পকেটে ফেলে দিল। সঙ্গীয় কর্মীগণের সামনে চম্পার চিঠি খুলবার মত সাহস তার আর নেই। সে জানে যে বিষবৃক্ষ সে নিজ হাতে রোপণ করেছে, সেই বৃক্ষে ফল দান করার সময় সমুপস্থিত। সে ফল তাকে ভোগ করতে হবে। সভা হতে কংগ্রেস ভবনে যাবার কথা ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার

দোহাই দিয়ে সে তাড়াতাড়ি তার বাড়ীর দিকে গাড়ী ফেরাতে সোফারকে বল্ল।

তখনও চম্পার চিঠিখানা তার পকেটে রয়েছে। মনে হচ্ছিল তার পকেটের চিঠিখানা যেন বিষধর সর্পের মত মৃণ্ময়ের সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে আছে। মৃণ্ময় কেমন অবসন্ন বোধ করছিল। তাড়াতাড়ি 'কার' হতে নেবে নিজের শয়ন কক্ষে ঢুকে কম্পিত হস্তে চিঠিখানা সে পকেট হতে বের করে। মৃন্ময় জানে এ চিঠি তার জন্য দুঃসংবাদ ব্যতীত আর কিছুই বয়ে আনে নাই।

গত কয়দিন হতে চম্পার সঙ্গে তার মতানৈক্য দাম্পত্য কলহের সীমা লঙ্ঘন করছিল। চম্পার শ্লেষ কটাক্ষ যেন অগ্নিদগ্ধ লোকের সর্বাঙ্গ জ্বালার মতই তীব্র ভাবে তাকে দগ্ধ করছিল। মাঝে মাঝে এই অপমান এত অসহনীয় বোধ হ'ত যে মৃণ্ময়ের মনে হোত তার গায়ের মাংস যেন অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঝলসে যাচ্ছে। মৃণ্ময়ের আশঙ্কা হোল এই চিঠিতে হয়ত এমন কিছু আছে—যাতে তার মান, সম্ভ্রম সব ধূলিসাৎ হবে। হয়ত লোক সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যই এই চিঠি। চিঠিখানা হাতে নিয়ে মৃণ্ময় অনেকক্ষণ বসে থাকল। আস্তে আস্তে সেই অনভিপ্রেত চিঠিখানা খুল্লে মৃণ্ময়। মৃণ্ময়ের আশঙ্কাকে প্রবঞ্চিত করেনি চিঠির বিষয়বস্তু।

চম্পা জানিয়েছে সে মিষ্টার সিমসনের জীবন সঙ্গিনী হয়ে তাঁর সঙ্গে আমেরিকায় চলেছে। মৃণ্ময়ের মত 'ব্রীফলেস', নেটিভ', 'কনজারভেটিভ' স্বামীর সঙ্গে বাস তার অমূল্য জীবনে বিড়ম্বনা মাত্র। তাই সিমসনের মত উদার মতালম্বী, ধনী, কৃতী ইঞ্জিনীয়ারের সহধর্মিনী হয়েই জীবনের বাকী দিনগুলি সে কাটাবে। মৃণ্ময়কে তার পূর্বতন স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবার সব রকম স্বাধীনতা দিয়েই সে যাচ্ছে। নিজেও সম্পূর্ণ রূপে মুক্তি পেয়েছে—মৃণ্ময়কেও মুক্তি দিয়ে গেছে।

চিঠিখানা যদিও খুবই প্রত্যাশিত, তবু মৃণ্ময় বহুক্ষণ চিঠিখানা

হাতে নিয়ে স্থবিরের মত বসে রইল। আজ যদি এ খবর প্রকাশ পায় তবে এবারকার নির্বাচনে চম্পাকে নিয়েই প্রতিপক্ষ সুন্দর সুন্দর কার্টুন আঁকবে – অথবা ছড়া লিখে রাখবে তার বাড়ীর দেওয়ালে। আত্মীয় বন্ধু সমাজে সে মুখ দেখাতে পারবে না। যে বড়মাসি রাতদিন তার কানে মন্তবার মত কুমন্ত্রণা দিয়ে চম্পার সঙ্গে এ বিয়ে দিয়েছিলেন, তিনও চম্পার চাল চলন নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা কটু মন্তব্য করে গেছেন। হয়'ত এখন তিনিই এই কলঙ্ক সর্বত্র গেয়ে বেড়াবেন। সেদিন তিনি মৃণ্ময়ের পৌরুষকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন —নিজের স্ত্রীকে সংযত করবার বা শাসন করবার ক্ষমতা যার নেই— তেমন পুরুষ পুরুষই নয়।

মা বাবা ও তার নিজের মনোনীত মেয়ে চন্দ্রিকাকে সে বিনা অপরাধে ত্যাগ করেছে। হয়ত সেই কারণেই ভগবান চম্পাকে দিয়ে সমাজে তার মাথা হেঁট করিয়ে দিলেন। আজ ব্যারিস্টার তালুকদার বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে কি পরিস্থিতি হোত মৃণ্ময় তা জানে না। কিন্তু যা সত্য, মৃণ্ময় তা চাপা দিতে গেলেও—চাপা থাকবে না। চম্পা তো সদম্ভে তার বান্ধবী সমাজে এ খবর পরিবেশন করে গেছে। এই অবস্থায় নির্বাচনের মুখে মৃণ্ময়ের কি কর্ত্তব্য কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছে না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এমন ঘৃণ্য জীবনের কি মূল্য? যার স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ করে যায় তেমন পুরুষের পৌরুষ কোথায়? ধিক্কার এসেছে তার নিজের জীবনের উপর। ভগবান যেন চন্দ্রিকার প্রতি অবিচারের শাস্তি আর একটি মেয়েকে দিয়েই তার জীবনে দেওয়ালেন!

১৯

কয়েক মাস পর।

কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ রূপে ধরাশায়ী করে বামপন্থী দলগুলি সংখ্যাধিক্য ভোটে নির্বাচনে জয়ী হয়েছে বলে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। বহু রথী মহারথী ধরাশায়ী হয়েছে। কংগ্রেসের বিশ বছরের দখলী গদীটা এবার ছাড়তে হোল। এমন অঘটনের সম্ভাবনা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই ভোট গণনার পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কর্ত্তা ব্যক্তি জাহির করে বেড়াচ্ছিলেন যে সাবেক মুখ্যমন্ত্রীই আবার বাংলার গদীতে আসবে। কিন্তু ভগবানের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রীই ধরাশায়ী হন্‌নি—তার সঙ্গে কেবিনেটের আরও অনেক উজির তথা পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের তথাকথিত কর্ণধার, যিনি অল্প কয়দিন আগে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে সোচ্চাবে নানাকথা বলেছিলেন, তিনিও গণেশ উল্টিয়েছেন।

ভোটের ফলাফল এমনই বিপর্য্যয় ঘটাল বিজিত ও বিজেতা উভয়েই যেন কিছুদিন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কেউই এমন একটা ফলের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দীর্ঘ বিশ বছরের গদী যে কংগ্রেস দলকে সত্যিই হারাতে হবে—তা কংগ্রেসীরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। বিজেতারাও লম্ফ ঝম্ফ করলেও যথার্থই নিজেদের জয়ের সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। সবার মনেই যেন তখন সেক্সপীয়ারের এক উক্তিই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল—

"Our wills and fates do so contrary run,
That our devices still are overthrown
Our thoughts are ours, their ends none of
Our own."

যেন যাতুকরের ভেল্কির মত সব আশা নিরাশাকে উপহাস করে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল—যার জন্য প্রকৃত পক্ষে কোন পক্ষই প্রস্তুত ছিল না। তাই জয়ের টীকা যাদের কপালে পড়ল——তারাও যেন নিজেদের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারেনি। যদিও ভোট গণনার পর জিত পরাজিতের নাম ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজেতার দল সোল্লাসে প্রতিপক্ষকে উপহাস করে নানা মিছিল বের কর'ল নানারকম কার্টুন এঁকে।

বিশ বছর ধরে যারা রাজ্য শাসকের ভূমিকা নিয়েছিলেন—তারা হয়ে পড়'ল সংখ্যালঘু। আর বিশ বছর ধরে যারা কংগ্রেসের শাসনে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে কংগ্রেসের সমালোচনায় মুখর হয়ে ছিল, কংগ্রেস শাসকদের নানা ভাবে বিব্রত করবার জন্য নানা জাতিয় শ্লোগান ও লাল ঝাণ্ডার মিছিলের পর মিছিল বের করেছে, ভাগ্যের পরিহাসে জনতার ভোটে তারাই আজ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ কর'ল।

নির্বাচনী প্রস্তুতিকালে যে সব বামপন্থী পার্টিগুলি প্রকাশ্যে একে অন্যের সমালোচনা করেছে, পরস্পর পরস্পরকে ব্যঙ্গ করেছে নানা প্রকার চ্যালেঞ্জ দিয়েছে,— আজ সেই বামপন্থী পার্টিগুলি সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। ঠিক শাসকের গদীতে বসবার জন্য তারা তৈরী ছিল না। এবার কিন্তু বাম কমিউনিষ্ট—যারা এতদিন নিজেদের আভিজাত্য অভিমানে দূরে সরে ছিল, যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত মোর্চায় দাঁড়ায়নি--দেশবাসীর মুখপাত্র পত্রিকাগুলির অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে জনতার আবেদনকে উপেক্ষা করে স্বতন্ত্র পথে চলেছিল,—সেই পার্টিই এবার জনতার রায় অবনত মস্তকে মেনে নিয়ে যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে যুক্তভাবে শাসনকার্য্য ভার গ্রহণে অগ্রণী হয়ে এল।

বাংলার রাজ্যপাল এক স্বনামধন্যা বঙ্গ-দুহিতা ও রাজনৈতিক নেত্রীর দুহিতা। রাজ্যপালের আহ্বানে যুক্তফ্রন্টের নেতৃদল সমবেত ভাবে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মতি জানালো।

জানালো। জনতার অনেক আশা, উৎসাহ, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদকে পাথেয় করে চৌদ্দটি বামপন্থী দল মিলিত হয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল।

বাঙ্গালীর আশা নূতন শাসকরা দেশে নয়া জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে আসছে। গরীবের দুঃখ কেটে যাবে, কালবাজার মজুতদারী বন্ধ হবে, ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে বামপন্থী সরকারের কাছে। এরা শ্রমিক, মজুর ও জনসাধারণের প্রতিনিধি। কংগ্রেস শাসকদের মত শিল্পপতি, কোটিপতি ধনীদের ধন বৃদ্ধিতেই সহায়তা করবে না। এই সরকার গরীবদের দু'টি খেতে পরতে দেবে। গরীবের উপর করের বোঝা হাল্কা করবে।

বামপন্থীদের আঠার দফা কার্য্যসূচী কার্য্যকর হলে দেশবাসী অন্ততঃ কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবে দীর্ঘকালের ঈপ্সিত স্বাধীনতার কিছুটা স্বাদ। জনসাধারণ তাই চেয়েছিল পরিবর্ত্তন। একঘেয়ে আমলাতান্ত্রিক জীবনের অবসান। কংগ্রেসের দীর্ঘ বিশ বছরের শাসনে নূতনত্ব কিছু দেখা যায়নি। গণতন্ত্রের নামে সেখানেও চলেছিল ধাপ্পাবাজী। তাই কথায় কথায় জনতার সোচ্চার দাবীর কণ্ঠ রুদ্ধ করবার জন্য চালিয়েছিল গুলি। প্রতিবাদ মিছিলের উপর চল্‌তো পুলিশী হাম্‌লা। ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছিল পদে পদে। পুলিশী নির্য্যাতনের ক্রমোন্নতি হয়েছিল। বৃটিশ শাসনে বিনা অপরাধে দেশবাসী যতটা নিগৃহীত হয়নি—তার চেয়ে অনেক বেশী উৎপীড়ন সইতে হয়েছে কংগ্রেস শাসকের হাতে। অথচ ক্রমেই দেশে চুরি, ডাকাতী, রাহাজানি বেড়ে চলেছে। সে দিকে পুলিশের দৃষ্টি নেই। পুলিশের সঙ্গে এইসব সমাজবিরোধী দলের সঙ্গে আছে যোগসাজশ। তাই এদের বিরুদ্ধে ডায়েরী লিখতেও তারা চায় না। যদি বা ডায়েরী লেখে, কিন্তু দোষীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেবার কোনই প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। এ সময় পুলিশদের মধ্যে বা থানা কর্তৃপক্ষের মধ্যে দেখা যেতো শৈথিল্য। বৃটিশ

আমলে যেসব আমলারা বা পুলিশ অফিসারেরা বহাল ছিল, স্বাধীনতা উত্তর দেশে তাদের উপরই ন্যস্ত হলো দেশ শাসন বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা। তাই প্রাক্ স্বাধীনতাকালে স্বদেশী যুবক যুবতীদের উপর অত্যাচার চালাতে এরা যেমন তৎপর ছিল, তেমনি তৎপর হ'ল স্বাধীনতা উত্তর দেশবাসীর উপর। কারণে অকারণে পুলিশী নির্য্যাতনে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এ ছবির পরিবর্ত্তন চেয়েছিল জনসাধারণ আকুল প্রাণে।

তাই নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর সর্বত্র একটা স্বতঃস্ফুর্ত্ত আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে। আপ্না হ'তে জিনিষপত্র ও খাদ্য সামগ্রীর দাম পড়ে গেল। মানুষ যেন রাতাবাতি বুঝল যে এখন জীবনধারার আমূল পরিবর্ত্তনের ডাক এসেছে। নূতন প্রত্যাশার আলো যেন সকলের শুষ্ক বিশীর্ণ মুখে—নূতন রক্ত প্রবাহে ঝল্মল্ করে উঠল।

কেবলমাত্র পশ্চিম বাংলা নয়। ভারতের ১৭টি রাজ্যের মধ্যে ৯টি রাজ্যেই কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারালো। গত কয়েকটি নির্বাচনী পর্য্যন্ত কংগ্রেস সর্বত্র একছত্র সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে—একছত্র গদীর অধিকারী হয়েছিল। অবশ্য তৃতীয় নির্বাচনীতে কেরেলায় কমিউনিষ্ঠ সরকার গঠিত হয়েছিল বটে। কেরেলার মন্ত্রীসভার আয়ুষ্কাল স্বল্পকালের জন্য স্থায়ী হয়েছিল। কংগ্রেসী ষড়যন্ত্রের ফলে এবং তাও নেহেরুর জীবিতকালে আবার সেই রাজ্যকে প্রেসিডেণ্ট রুলের আওতায় আসতে হলো। পরে মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনে কংগ্রেস নিজের পলিসি ও ক্রীড্ বলি দিয়ে শাসন ভার পেয়েছিল।

কিন্তু চতুর্থ নির্বাচনীর ফলাফল যে এমন হবে—তা যেন কংগ্রেস পার্টির কেউই স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই এমন একটি আকস্মিক বিপর্য্যয়ে পার্টির অভ্যন্তরে সুরু হ'ল কোন্দল। কারণ কেবল মাত্র পশ্চিম বাংলা নয়,—ভারতের সমস্ত রাজ্যেই কংগ্রেসের শীর্ষ স্থানীয় অনেক

নেতা ভোটে পরাজিত হয়েছেন। এমন কি মাদ্রাজের একটি ছাত্রের নিকট পরাজিত হয়েছেন ভারতের কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট। কংগ্রেস পার্টিতে মানুষ যে এভাবে আস্থা হারিয়ে সবে পড়বে তা কংগ্রেস কখনও ভাবেনি। দূরদর্শী নেতা কংগ্রেস দলে বিরল বা নাই বল্‌লেও সত্যের অপলাপ হবে না। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর কেউ কংগ্রেস প্রশাসনের·ত্রুটির জন্য দোষারোপ করে। কেউ বা নির্বাচনী ত্রুটির জন্য দোষারোপ করে।

তাই নূতন পরিস্থিতির জন্য দুই পক্ষেই সাজ সাজ রব উঠল। প্রস্তুতি চল্‌তে থাকে দুই পক্ষেই। জনসাধারণও নূতন প্রত্যাশার সম্ভাবনায় উন্মুখ হয়ে থাকে। নূতন দলপতিরা কিভাবে রাজ্য পরিচালনা করে, কিভাবে দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করে— তা দেখবার জন্যই যেন ভোটদাতারা উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। নির্বাচনীর পূর্বে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি সর্বত্র সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দেশবাসীর কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে,—তা কতটা কার্য্যকরী করে, তা দেখবার জন্যই যেন সকলে উন্মুখ।

দীর্ঘ বিশ বছরের গদী যাদের ছেড়ে দিতে হোল—তাদের মধ্যে দেখা দিল হতাশা, বেদনা, ব্যর্থতার ক্লান্তির ছাপ। আশাহত মানুষের ব্যথা যেন মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেছে কংগ্রেস ভবনগুলিতে। কংগ্রেসের মধ্যেও সুরু হয়ে যায় দলাদলি। একদল চায় কংগ্রেসের সব কুগ্রহদের ক্ষমতার আসন হতে বিতাড়িত করে যথার্থই কংগ্রেসের আদর্শকে ঢেলে নূতন সাজে গড়ে তুলতে। যারা যথার্থই নিষ্ঠাবান্ তারা এই মতালম্বী। যাদের কেবল গদী আঁকড়িয়ে শোষণ চালানোর রীতি—তারা তার বিরুদ্ধে। এই মতদ্বৈততায় রাজ্য কংগ্রেসের প্রত্যেক স্তরে একটা অসন্তোষের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।

২০

মৃণ্ময়ের মনে অশান্তির ঢেউ উঠেছে। নিজেকে সে এভাবে অপমানিত হতে দিতে চায় না। চম্পার স্মৃতি বুকে নিয়ে তার প্রতীক্ষায় সে যে বসে নেই, এটাই সে চম্পাকে দেখাতে চায়। সিমসনের নেশা একদিন চম্পার ছুটবে। সেদিন চম্পাকে আবার মৃণ্ময়ের দুয়ারে ফিরে আসতে হবে। তার আগেই মৃণ্ময় চায়—চম্পাব শূন্য স্থান পূর্ণ করে তার প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু এই বয়সে কোন্ যোগ্যতায় সে আবার বর বেশে ছাদ্‌না তলায় দাঁড়াবে? বিশেষ করে দুই স্ত্রী বর্ত্তমানে কোন্ মেয়েই বা তাকে বরণ করতে এগিয়ে আ৺বে? আইন ও তার প্রতিকূলে। অথচ যেন তেন প্রকারেণ চম্পাকে দেখাতে হবে—তার বিহনে মৃণ্ময়ের জীবনও মরুভূমি হয়নি।

দিনের পর দিন এই চিন্তা যেন মৃণ্ময়কে পেয়ে বসেছে। অথচ কোন উপায় উদ্ভাবন করতেও পারছে না। সহকর্মী বা বন্ধু বান্ধব কারো কাছে নিজের এই অপমানের কথা মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারছে না। ক্লাবে বা সোসাইটিতে যাওয়া এক রকম ছেড়ে দিয়েছে। সবার কৈফিয়তের কি উত্তর দেবে—এই একটি চিন্তার লুতাতন্তু বুনে চলেছে সে মনে মনে। বিশেষ করে চম্পার বন্ধু বান্ধবীদল হতে নিজেকে সে যথা সম্ভব দূবে সরিয়ে বেখেছে।

দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ছুটে চলে। তাই চম্পার এই কাহিনী চম্পা মারফৎই কোন কোন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। মৃণ্ময় ফলাও করে যেমন তা প্রকাশ করে না কাবো কাছে, তেমনি অপরের জিজ্ঞাস্যকে যথা সম্ভব এড়িয়ে চলে। কিন্তু এই ভাবে তো দীর্ঘ দিন কাটানো যায় না।

মানুষ নিজের পছন্দ মত নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে চায়। কিন্তু কি

এক অজ্ঞাত অদৃশ্য হাত সব যেন তছ্‌নছ্‌ করে দেয়। তাই মৃণ্ময়ের একের পর আর সব আশাই ভেসে গেল। ব্যারিস্টার হ'ল। কিন্তু ব্রীফ নেই, নাম নেই, যশ নেই। রাজনীতিতে নাম করবে বলে কংগ্রেস দলে ভিড়ল। কিন্তু যখন তার এম, এল, এ হবার সম্ভাবনা ছিল, তখনই চম্পার চমকে কেবল মৃণ্ময়ই চম্‌কে যায়নি তার ভাগ্যও ধরাশায়ী হ'ল।

একূল ওকূল দুকূল সে হারালো। হয়ত বড় মাসির পরামর্শে ব্যারিস্টারী ও তালুকদারের মেয়ের মোহে না পড়লে তার জীবনটা অন্যভাবে ঢেলে সাজানো যেতো। বাবার জুনিয়র হয়ে বাবার মতই অর্থ, নাম, ডাক সবই তার হোত। সে জীবনে সুখ, শান্তি, অর্থ, সমাদর সবই পেতো। তবু কেন আরও ধন, নাম, যশের লোভে সে হাতের মুঠোর সব কিছুকে ফেলে অনিশ্চিতের পথে ছুটে এল? কিন্তু তার তৃষ্ণা তো মিটে নাই। পরন্তু পিপাসায় তার আজ ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু এক ফোঁটা শান্তির বা সান্ত্বনার বারি. সে কোথাও পাচ্ছে না।

মনের অস্থিরতা নিয়েই সে ছুটিয়ে চলেছে তার 'কার'। ভরা ভাদ্র মাস। সারাদিনের দুশ্চিন্তার ক্লান্তিতে কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম! উষ্ক খুষ্ক চুল উড়ছে। দৃষ্টি উদাস। উদ্দেশ্যহীন ভাবে চল্‌তে চল্‌তে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে। আকাশে তারা নেই। চাঁদ নেই। গাছের পাতাগুলি নড়ছে না। গুমোট ভাব। সর্বত্র একটা থম্‌থমে অন্ধকার।

অন্ধকার নির্জ্জন পথে দ্রুত ধাবমান কিছু 'বাস্‌' ও 'কার' ছুটে চলেছে। খান কয়েক রিক্সও টিম্‌টিম্‌ করে পথ চলছিল। এই অন্ধকারে সামান্যই নজরে আসে। কিন্তু নিজের চোখকে মৃণ্ময় অবিশ্বাস করবে কি করে? ঐ যে 'বাস্‌ স্টপেজের' কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে চন্দ্রিকা। হয়ত পূজা দিতে এসেছিল। এক হাতে ব্যাগ্‌ ঝুলছে, অন্য হাতে পূজার ডালি ও প্রসাদ। বহু বছর পর এত কাছ

হতে এমন স্পষ্টভাবে চন্দ্রিকাকে মৃণ্ময় দেখলো। রাস্তার ক্ষীণ আলোর রশ্মি পড়েছে দণ্ডায়মান চন্দ্রিকার মুখে। মুখে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের ছাপ। শান্ত, সুন্দর, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ একটা শ্রী তার মুখে উদ্ভাসিত। দেখলেই শ্রদ্ধা জাগে মনে।

মৃণ্ময় জানে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় চান্দ্রকা কালী বাড়ী যেতো। চন্দ্রিকার এই ভক্তির জন্য মৃণ্ময় তাকে কত ঠাট্টা করেছে। কিন্তু তবু চন্দ্রিকার এই একনিষ্ঠ ভক্তি হতে তাকে টলান সম্ভব হয় নি। আজও চন্দ্রিকার মধ্যে সেই দেবদ্বিজে ভক্তির একাগ্রতা দেখে মৃণ্ময় চমৎকৃত হয়েছে। যে ভগবান চন্দ্রিকাকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে, আবার ধূলির ধূলায় টেনে নাবিয়ে দিয়েছেন, যিনি তার আবাল্যের প্রেমাস্পদ স্বামীর মন হতে তাকে ঠেলে দিয়েছেন—সেই নিষ্ঠুর বিধাতার প্রতি চন্দ্রিকার ভক্তি শ্রদ্ধা এখনও তেমন অটল আছে দেখে মনে মনে মৃণ্ময়ের চন্দ্রিকার প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। বেচারীর মুখে ফুটে উঠেছে ক্লান্তির ছাপ। সারাদিন 'সেলস্ গার্লের' খাটুনী খেটে এতদূরে এসেছে সে পূজা দিতে। বাবার 'কার'টা দিলে পারতেন। বাসের এই ভিড়ে কত কষ্ট না জানি বেচারার হয়েছে। পর মুহূর্ত্তে মনে পড়'ল হিমাংশুর উক্তি। হয়ত বা চন্দ্রিকাই তা ব্যবহার করে না। নিজের আত্মসম্মান বা ব্যক্তিত্বের প্রতিকূল কোন কাজ চন্দ্রিকার মনঃপূত নয়। এমনি নানা চিন্তায় মৃণ্ময় আচ্ছন্ন।

কিন্তু এ কি! কপালে বা সিঁথিতে কোথাও মৃণ্ময়ের সঙ্গে তার একদা বন্ধনের চিহ্ন মাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। হাতেও তেমন কোন চিহ্ন মৃণ্ময় খুঁজে পেল না। চন্দ্রিকা মৃণ্ময়কে তার জীবন নাট্য থেকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে মুছে ফেলতে পারবে সে কোন দিনও ভাবেনি। মৃণ্ময় পুরুষ। পুরুষের অধিকারে, স্বামীত্বের অধিকারে যথেচ্ছা চলবার স্বাধীনতা পুরুষ চিরকাল ভোগ করে এসেছে। কিন্তু পরিণীতা স্ত্রী যে সব আঘাত সহ্য করে সেকালের সতী সাধ্বীদের মতই স্বামীকে পরম দেবতা জ্ঞানে পূজা করবে, স্বামীর মঙ্গলের জন্য ব্রত পার্বন

উদ্‌যাপন করবে, মঙ্গল চিহ্ন এয়োতীর লক্ষণ সদা সর্বদা বহন করবে —এ হলো শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। মুনি ঋষিদের বিধান। চন্দ্রিকাও এই আদর্শ পালন করবে—এটাই মৃণ্ময় আশা করেছিল। তাই চন্দ্রিকার পোষাকে চেহারায় যে ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য, সৌন্দর্য দেখে সে আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তার স্বামীত্বের অবমাননাকে মৃণ্ময়ের অসহ্য বোধ হলো।

দেশ কাল সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেও যে পরিবর্ত্তন সম্ভব এ যেন অবিশ্বাস্য। তাই চম্পার দেয় অপমান হতে চন্দ্রিকার এই অবজ্ঞা যেন মৃণ্ময়ের মনে কঠোরতর আঘাত দিল। হিমাংশুর মুখে চন্দ্রিকার রোজগারেব অঙ্কটা শোনার পর হ'তে মনে মনে তার একটা লোভ হচ্ছিল। ভেবেছিল চম্পার পলায়নের সংবাদে চন্দ্রিকা বা বাবা মা ই তাকে আবার ডেকে নেবে। কিন্তু তার কোনো আশাই পূর্ণ হলো না,—তখন একটা অকারণ বোষ যেন মৃণ্ময়কে পেয়ে বসেছিল। যেমন করেই হোক চন্দ্রিকাকে জয় করতেই হবে। চম্পা তাব যে মাথা হেঁট করিয়েছে—চন্দ্রিকাকে দিয়েই আবার তা সবার উপরে তুলতে হ'বে। মনে মনে সে অনেক আকাশ কুসুম রচনা করেছিল। কিন্তু চন্দ্রিকাব এই বেশ যেন আজ এক মস্ত ধাক্কা দিয়ে তাকে তাব স্বপ্নপুরী থেকে জাগিয়ে তুল্লে।

এমন একটা পরিস্থিতির জন্য মৃণ্ময় প্রস্তুত ছিল না। চম্পা অনেক দূর নেবে যেতে পারে। অনেক অসম্ভাব্য জিনিষ তার দ্বারা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু চন্দ্রিকাকে সে ত্যাগ করলেও—চন্দ্রিকা সতী সাবিত্রীর মত তাকে আমরণ পূজা করবে। এমনি একটা আত্মপ্রসাদে মৃণ্ময় বিভোব ছিল। তাই আকস্মিক ভাবে এত বছর পরে চন্দ্রিকাকে দেখে তার মন যেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, তেমনি তার পরিবর্ত্তন তাকে এমন ভাবে আঘাত করল—মনে হ'ল মৃণ্ময়ের মস্তিষ্কের সব শিরা উপশিরায় জট বেঁধে যাচ্ছে। সে আর ভাবতে পারছে না। সব যেন কেমন ফাঁকা মনে হচ্ছে। অপ্রত্যাশিত আঘাতে মানুষ বোধ হয় এমনি ভাবেই বিভ্রান্ত হয়।

২১

সুহাসের সঙ্গে চণ্ডালিকার পরিচয় ছোট বেলা হ'তে। সুহাস চণ্ডালিকার বান্ধবী সুভাব দাদা। পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতো দু'টো পরিবার। সুহাসের ব্যক্তিত্ব. তেজস্বীতা, নির্ভীকতা সব মিলিযে তার মধ্যে আকর্ষণ করবার একটি শক্তি বিধাতা তাকে দিয়েছিলেন। সুহাসের কাছেই চণ্ডীর রাজনীতিব হাতে খড়ি। সুহাস মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। রুগ্ন মা, ছোট ছোট কয়েকটি ভাই বোন ও বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে তাদের সংসার। সুহাসেব বাবা সুচারুবাবু জীবনের মধ্যাহ্নে পৌছে জীবন সঙ্গিনীকে ঘরে এনেছিলেন। তাই জীবনের পড়ন্ত বেলায় দেখা গেল সুহাস ও সুভা ছাড়া অন্য সব ছেলেমেয়েরা তখনও মাটীর সঙ্গে কথা বলছে।

রাজনীতির ঝড়ে পূর্ববাংলার বহু পরিবার যেমন বিপর্য্যস্ত হয়েছে —সুহাসদের পরিবারও তা হতে অব্যাহতি পায়নি। তাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সর্বস্বই শুধু সুভারা হারায়নি, সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েছে সুহাসের মত শক্ত খুঁটি—যাকে অবলম্বন করে লতার মত সমস্ত পরিবারটা উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

সুচারুবাবু রুগ্না স্ত্রী ও অন্যান্য সন্তানদেব নিয়ে চলে এলেন বর্দ্ধমানের সহরতলীতে। সুচারুবাবুর পৈত্রিক অতবড় বাড়ীটার বিনিময়ে পাওয়া গিয়েছিল বর্দ্ধমানের সহরতলীতে ভগ্নোন্মুখ একখানা আস্তানা। বাড়ী বলা তাকে হয়ত ঠিক হবে না। চারপাশে লাল ইটের দেওয়াল। কোন দিনও বোধ হয় তাতে সিমেণ্ট বা বালুর পোঁচ পড়েনি। উপরে শত শত ছিদ্র যুক্ত টালির ছাদ, দরজার কাঠ কোন রকমে লাগানো চলে। কিন্তু কাঁচা কাঠের দরজা। তাই বর্ষার সময়ে তা ফেঁপে উঠে—অনেক কষ্টে তাতে খিল লাগাতে হয়।

গরমে শুকিয়ে যাওয়া দরজার শতেক ছিদ্র পথে ঘরে জল ঢুকে—ঘরে ভিতর প্লাবন ডাকে। জানলায় নেই কোন গরাদ। খোলা রাখলে যে কেউ টপ্‌কে ভিতরে ঢুকতে পারে—তা বন্য প্রাণীই হোক্ অথবা ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনুষ্য নামে অভিহিত বন্য প্রাণী হতে অধিকতর ভয়ঙ্কর দুর্ব্বৃত্ত। তবু এই আস্তানাতেই কোন রকমে সুচারুবাবু আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এই আশ্রয়টিও জোগাড় করে দিয়েছিল সুহাসের বন্ধু অভয়। অবশ্য এই বিনিময়ের মধ্যস্থ হয়ে অভয়বাবুর পুঁজিও যে ঐ পক্ষ হতে বেশ মোটা মত ভরেছে—তা এ পক্ষের কেউই জানে না। তাই স্রোতের মুখে আগাছার মত তাদের যখন ভেসে যাবার উপক্রম হচ্ছিল,—সেই সময় অভয় যেন ভগবানের অভয়বাণী শোনালো বাড়ী বদলীর এই প্রস্তাব দিয়ে। সুভাদের পরিবারটি অতি ভাল। ঠিক যেন এই যুগের উপযুক্ত নয়। সরল বৃদ্ধ সুচারুবাবু যেমন অমায়িক, সদাশিব, তেমনি দুনিয়ার সবাইকেই তিনি তেমনিই ভাবেন। ভগবানের এ রাজ্যে যে কোন অনাচার হতে পারে, মানুষের মনে শয়তান বাসা বাঁধতে পারে—এ যেন তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারেন না। তাই সন্তানসম সন্তানের বন্ধুকেও তাঁরা একান্ত আপনজন ভেবে গ্রহণ করেছিলেন। সুহাস লেখাপড়ায় ভাল ছাত্র ছিল। তাই একের পর আর সমস্ত সোপানই অনায়াসে গৌরবের সঙ্গে অতিক্রম করে বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী সে লাভ করেছিল।

সুহাস মারা যাওয়ার পর হতে অভয় বন্ধু পরিবারের সঙ্গে নিজেকে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ফেলেছিল। দরকারে অদরকারে অভয় তাদের পরিবারে ত্রাণ কর্ত্তারূপে দেখা দিত। অভয় কিন্তু সুহাসের মত এমন ভাল ছেলে ছিল না। তাই বহু চেষ্টা করেও সে বি, এ ডিগ্রীটা কয়েক বারের চেষ্টাতেও নিতে পারেনি। অভয়ের বাবার কিছু জমিজমা ছিল। উনি সরকারী চাকরীও করতেন। তাতেই কোন রকমে তাদের পরিবারটা চলে যেতো। মা, বাবা ও

আতুর দুই দাদা। এই আতুর সন্তানদের জন্য অভয়ের মা ও বাবার মনে ছিল না শান্তি ও সোয়াস্তি। তাই দুই আতুর সন্তানের পর অভয় যখন তাদের সংসারে সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তান রূপে জন্ম নিল,—তখন মা বাবার স্নেহাধিক্যের প্রশ্রয়টা মাত্রাধিকা হয়েছিল। অতএব স্বতঃসিদ্ধ পরিণাম ঘটল। স্নেহের আধিক্য হওয়ায় বিদ্যার হ্রস্বত্ব ঘটল।

বিদ্যার দৌড়ে অভয় পিছিয়ে পড়লেও, বুদ্ধির দৌড়ে অনেককেই সে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অভয় যে কতদূর নাব্‌তে পারে, কত অলি গলি অতিক্রম করে নরকের কত নীচ স্তরে ডুব্‌তে পারে—তা কেউ জানে না। অভয়ের বাহ্যিক চেহারা ও প্রচ্ছন্ন স্বভাবের অবগুণ্ঠন উন্মোচন না করে—কেউ তার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। তাই সুহাসের অপমৃত্যুর সুযোগ নিতে অভয় কখনও ভুল করেনি। মানুষের দুর্বলতার দুর্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ অভয় পূরোপূরি গ্রহণ করেছিল। সহানুভূতির খোলস পরে, সমবেদনার পোষাক নিয়ে অভয় সুচারুবাবুর অন্দরমহলে আনাগোনার পথ সুগম করে নেয়। সুভার সঙ্গে অন্তরঙ্গটা তার আগেই ছিল। ক্রমে তা হৃদ্যতায় পরিণত হয়। সুভার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। দাদার অপঘাত মৃত্যুতে সে চারিদিকে অন্ধকার দেখেছিল। একদিকে চণ্ডী, অন্য দিকে অভয় যেন তার অন্ধকার ভবিষ্যতে অভয়বাণী বয়ে এনেছিল।

চণ্ডীর সঙ্গে সুহাসের জীবন একই সূত্রে গাঁথা হবে এটাই পরিবারের সবাই জানতো। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সেই জ্বলজ্যান্ত যুবক একদিন নিহত হ'ল। পাঠ্য জীবনে যেমন সুহাসের সুনাম ছিল, কর্মজীবনেও সে উন্নতির সোপানগুলি ত্বরিত গতিতে টপ্‌কে চলেছিল। অল্পদিনেই সে উন্নতির প্রায় শীর্ষস্থানে পোঁছেছিল। বিধর্মী একটি যুবকের এতটা স্পর্দ্ধা অনেকের চক্ষুশূল হয়েছিল। তারই পরিণতিতে হতভাগ্যকে একদিন প্রাণ হারাতে হ'ল।

চণ্ডীর আশার কুসুম অঙ্কুরেই ঝরে গেল। এইভাবে সুহাসের তিরোধানে সুভার সঙ্গে চণ্ডীর আন্তরিকতা আরও দৃঢ়তর হ'ল। সুভার পরিবারের সব দায় দায়িত্ব যেন চণ্ডীর উপর এসে পড়'ল। সুহাসের বন্ধু অভয়কেও চণ্ডী নিজের মতই সুভার পরিবারের শুভার্থী মনে করেছিল। তদুপরি সুভাব সঙ্গে অভয়ের গভীর আন্তরিকতায় চণ্ডী অভয়কে সুভাদের পরিবারভুক্ত একজন বলে মনে করেছিল।

অভয়ের সাহায্যে মাথা গুঁজবার একটা আস্তানা পেয়ে সুচারুবাবু যেন অভয়ের কাছে ঋণী হয়ে ছিলেন। সুভারও অভয়ের প্রতি মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। অভয়ও তার মা বাবা ও আতুর দাদাদের নিয়ে বর্দ্ধমানেই একটা ভাড়া বাড়ীতে এসে উঠল। অভয় কি করে সংসার চালায়—তা কেউ জানে না। সেই রহস্য সে কারো কাছে খোলেনি কখনও। সুহাসের পরীক্ষার সার্টিফিকেট ও ডিগ্রীগুলি কিন্তু একদিন সুভাব থেকে অভয় চেয়ে নিয়েছিল। বন্ধুর স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপই সে ঐগুলি নিয়েছে - এটাই সুভার ধারণা ছিল। অভয়ের ব্যবহারে ও সাহচর্য্যে সুভা এতটা আকৃষ্ট হয়েছিল যে অভয়ের কোন কাজে প্রশ্ন করাও সে ধৃষ্টতা মনে করতো।

২২

সার্কুলার রোডের 'আপরাহ্ণিক আনন্দলহরী' রেঁস্তোরায় আবার জমায়েৎ হয়েছে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারা। বাসুদেব হিমাংশুকে উদ্দেশ করে বল্ল "হিমাংশুদা, গদী তো পেলাম। কিন্তু কাজ তেমন এগোচ্ছে না তো?"

হিমাংশু উত্তর দিল "যুক্তফ্রন্টের সরকারের শরিক রাজনৈতিক দলগুলির এই সরকারকে টিকিয়ে রাখতে তাদের মাথা ব্যথা নেই। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর হতে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই মন দিয়েছে। এই সুযোগে নিজের দলীয় শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করছে। ফলে বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা প্রতিযোগীতার দ্বন্দ্ব যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বে-সামাল করে তুলেছে। সত্যিকারের কাজ কিছুই এগোচ্ছে না।"

অলক দাস বলে "আপনি ঠিকই বলেছেন। মন্ত্রী সভা যেন একটা তৃতীয় সত্তায় পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের নেতারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বার্থে কিছুই করছেন না। মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি উগ্রপন্থীদের প্রকাশ্য বিদ্রোহে উভয় সঙ্কটে পড়েছে। এস, এস, পি দলের সঙ্গে বাম কমিউনিষ্ট পার্টির শত্রুতা চরমে এসে পৌঁছিয়েছে।"

হিমাংশু উত্তর দিল "অথচ আমাদের শত্রু চারিদিকে। পরাজিত রাজ্য কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত আছে কেন্দ্রীয় সরকার। তদুপরি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করবার জন্য আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্র যদিও সর্বজন বিদিত আমাদের নেতারা তা ভুলেই গেছেন বলা যেতে পারে। শিল্পপতিদের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে আমাদের চলতে হচ্ছে। আমাদের মন্ত্রীত্বের আয়ু সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান। তদুপরি আমরা যদি

পরস্পর এভাবে কাদা ছুড়াছুড়ি করি, একে অন্যের সমালোচনায় মুখর হই,—তবে যথার্থই তো এই মন্ত্রীত্ব টিকিয়ে রাখা মুস্কিল।"

মহেন্দ্র খান্ বলে "সব চেয়ে মজা হয় যখন দেখি আমাদের মন্ত্রী-সভার কোন শরিক পার্টি খাদ্য আন্দোলনে এখনও যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে নানা শ্লোগান দিয়ে মিছিল বের করে ময়দানে সভা করে। তখন মনে হয় আমরা কোন্ জগতে বাস করছি। এরা মিছিল বের করে নিজেদের সরকারকে লোক চক্ষে হেয় করছে। যদি জোতদার-দের থেকে খাদ্য সামগ্রী উদ্ধার করতে সহায়তা করত—তবে হয়'ত যুক্তফ্রন্ট সরকারের অনেক উপকার হ'ত। কিন্তু এরা যেন গদীতে বসেও তাদের চিরন্তন স্বভাবটা পরিত্যাগ করতে পারছে না। অর্থাৎ, মিছিল। তারপর সভা। সভায় শাসক গোষ্ঠীর সমালোচনা যেই শাসক হোক না কেন। এতে শত্রুকেই হাসবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে নয় কি?"

কিরীটি সেন বলে "এদিকে আমাদের মন্ত্রীত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য শিল্পপতিদল, কংগ্রেস ও আরও অনেকেই এরই মধ্যে কত রকমের 'সাবটেজের' কাজ করছে। ২৯ শে মার্চ শিবমন্দিরে পূজা দিতে যাওয়ার এই সামান্য ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করে একটা প্রাদেশিকতার বিষ ছড়াবার সুযোগকে কাজে লাগাতে কি রকম তৎপরতা দেখা গেছে। নতুবা ২৯ শে মার্চ বাগমারীতে শিখসম্প্রদায় ও বাঙালীর মধ্যে প্রাদেশিকতার ধোঁয়া তুলে একটা দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করছিল কে? দিবালোকে নানা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে শিখদের শোভাযাত্রা ও লুঠতরাজই বা হবে কেন? পুলিশ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে এত নিষ্ক্রিয়ই বা রইল কেন?"

চপলাকান্ত বল্ল—"কেবল কি প্রাদেশিকতার উস্কানী? নানা ভাবেই তো যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অপদস্থ করতে চতুর্দ্দিক হতে চলেছে ষড়যন্ত্র। তাই ট্রাম কোম্পানীও ঝোপ বুঝে কোপ দেবার মতলবে নেতাদের রাজ্যে সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ বুঝে ভাড়া বাড়াবার

তোরজোর সুরু ক'রল। ভাগ্যিস্ সময় মত আদালত মারফৎ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ইনজাংশেন জারী করে তা রোধ করা হয়েছিল। নতুবা আবার যুক্তফ্রন্টকে আরও বিব্রত হতে হোত।

শুধু কি তাই? হঠাৎ ট্যাক্সি ধর্মঘট করিয়ে কলকাতা মহানগরীর স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভারদের জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি গ্রহণই ছিল তাদের দাবী। কিন্তু দুর্জ্জন লোককে যদি রোধ করা এতই সহজ হ'ত— তবে নিত্যি রোজ কলকাতা মহানগরীতে দিন দুফুরে এত খুন রাহাজানি ঘটছে কেন?"

রজনী বসু উত্তর দিল "তাছাড়া সব ট্যাক্সি ড্রাইভাররাই বা এমন কিছু ধোয়া তুলসী পাতা নয়। কোন কোন ট্যাক্সি ড্রাইভারও তো বহু সালঙ্করা মহিলাদের একা পেযে নিজ্জন স্থানে গাড়ী নিয়ে তাদের হত্যা করে গহণা ও টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবার কীর্ত্তি শোনা যায়। কেবল মহিলা কেন?

অনেক সময় ড্রাইভার যদি বুঝতে পারে আরোহীর সঙ্গে টাকা আছে—তবে সেই আরোহীকেও নির্জ্জনতার সুযোগ নিয়ে হত্যা করার কীর্ত্তি তো বিরল নয়। তার যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পলায়ন করে। সুতরাং যাদের মধ্যে দূর্ব্বৃত্ত কিছু কিছু আছে,—তাদের এ ধরণের আব্দারের কোন মানে হয় না। বিশেষ করে এই ধরণের ঘটনার সঙ্গে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের কোন যোগাযোগ নাই। অথচ এইসব উপলক্ষ করেই চৌরঙ্গীতে ট্যাক্সি ধর্মঘটে সেদিন কত গোলমাল হতে পারতো মহানগরীর বুকে, যদি না যুক্তফ্রন্টের নেতারা সময় মত হস্তক্ষেপ করতে পারতেন।"

কিরীটি বল্ল "২১শে মে'র হাওড়া থানায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘটনাটাও কিছু উড়িয়ে দেওয়ার মত ব্যাপার নয়। অতি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে লঙ্কা কাণ্ড সুরু হয়েছিল। মসজিদ প্রাঙ্গণে ষ্টল তৈরীর ব্যাপার নিয়ে বচসা হলো। খবর মন্ত্রীদের কাছে

পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ফোন করে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও থানাকে জানায় মস্‌জিদে কোন প্রকার ষ্টল তৈরী করতে যেন দেওয়া না হয়। অতি সামান্য ঘটনা নয় কি? কিন্তু হাওড়া ও, সি সেই আদেশ অমান্য কর'ল। পরন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে হাওড়া পুলিশ শ্লোগান তুল্ল—'হাওড়ায় যুক্তফ্রন্টের শাসন চলবে না।' যেসব রাজনৈতিক নেতাবা ও সমাজসেবীরা একটা অশুভ সাম্প্রদায়িকতার হানাহানি হতে দেশকে উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল, চক্রান্ত-কারীদের দ্বারা নিযুক্ত কিছু সংখ্যক সমাজবিরোধী গুণ্ডার হাতে তাঁদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। পরন্তু এই গোলমাল থামাতে যেয়ে একজন বিশিষ্ট মুসলীম রাজনৈতিক নেতা পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হয়। পুলিশের উস্কানীতে গুণ্ডাদলের চরম অবাজকতা স্নুরু হয়। এই দাঙ্গা থামাতে এসে পুলিশের কাছে নিগৃহীত হয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের এম, এল, এ, মন্ত্রী, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও এস, ডি, ও। থানার সব লাইট বন্ধ করে, থানার অভ্যন্তর হতে অন্ধকারে পুলিশরা জনতার উপর আক্রমণ চালায়। কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি এমন কি স্বয়ং জেলা শাসক পর্যন্ত আহত হয়েছিলেন। পরন্তু পরের দিন হাওড়া পুলিশ বিদ্রোহ করে। হাওড়ার ঘটনার পিছনে আছে কোন রাজনৈতিক পার্টি, একদল মালিকের ষড়যন্ত্র ও উস্কানী।"

চপলাকান্ত বলেন "যুক্তফ্রন্ট সরকার পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখায়—এই সরকারের বিরুদ্ধে পুলিশের একটা চাপা ক্রোধ জমে উঠে। কংগ্রেস রাজত্বের মত কথায় কথায় পুলিশী হস্তক্ষেপ রোধ করার দরুণ পুলিশদের প্রতি জনসাধারণের একটা স্বাভাবিক ভয়ও চলে যায়। ফলে পুলিশের হয় অস্নুবিধা। সেই আক্রোশকে মদৎ দেওয়া হয়। তারই পরিণতিতে যত্রতত্র পুলিশ বিদ্রোহ বা পুলিশ জনতাকে অকারণে বিক্ষুব্ধ করে—জনতাকে অকথ্য গালিগালাজ ও মারপিট করে।

রাণাঘাটের তুচ্ছ ব্যাপারকে নিয়ে পুলিশ অহেতুক অশান্তি ও

বিশৃঙ্খলা ঘটিয়েছে। আত্মীয়ের হাসপাতালে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এক ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক রাণাঘাট হতে কলকাতায় আসবার পথে পুলিশ তাদের নারীহরণের অপরাধে অভিযুক্ত করে ঐ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে গ্রেপ্তার করে এনে তাদের উপর অত্যাচার করে। ভিত্তীহীন এই অপরাধেব জন্য নিরপবাধী এই তুইজন যাত্রী পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়। জনসাধাবণ ঘটনা জানতে পেরে থানা আক্রমণ করলে, বিক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে পুলিশের চলে লড়াই। অকারণে রাজ্যে পুলিশী জুলুম বা ঔদ্ধত্যের স্পর্দ্ধা আসে কোথায় থেকে? এই পুলিশ বিদ্রোহের পিছনে কাদের উস্কানী তা রাজ্য সরকার বা জনসাধারণের জানতে বাকী নেই।"

হিমাংশু বলে "যুক্তফ্রন্ট সরকারের রাজত্বের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যেন সুপরিকল্পিত রূপে একের পব আর একটি ঘটনা ঘটিয়ে এই সরকারের অক্ষমতা বা অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা, তৎপরতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কিরীটি, তোমাদের পার্টি ও বাম কমিউনিষ্ট পার্টির মন্ত্রীদ্বয় সব পরিস্থিতিকেই আয়ত্বে আনেন। নতুবা ২৮শে মে পার্ক সার্কাস এলাকায় সামান্য একটা জুয়াখেলাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাব আগুন জ্বালাবার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করা কখনই সম্ভব হোত না। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকায় হয়ত সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ ছেয়ে যেতো।"

বাসুদেব বলে—"কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছো হিমাংশুদা। এইসব দাঙ্গায় যেসব অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, তার কয়েকটার মধ্যে মার্কিন দেশের ছাপ আছে। অর্থাৎ পশ্চিম বাংলাতেও সি, আই, এর অলক্ষ্য হস্তক্ষেপের উর্ননাভের জাল ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র —এসব কি তারই নিদর্শন নয়? কিন্তু আমি বুঝি না আমাদের দেশে আমরা কোন পার্টিকে শাসকের গদীতে বসাবো—সে বিষয়ে মার্কিন দেশের এত মাথা ব্যথা কেন?

রজনী বসু বয়কে সবাইকে চা, টোষ্ট ও অমলেট দিতে বলে বল্লে "এ তো অতি সাধারণ ব্যাপার সেটা বুঝতে পারছেন না। বাম-পন্থীরা যদি গদীতে থাকে, তবে এ দেশে তাদের আধিপত্যের সুদূর ভবিষ্যতে সম্ভাবনা নেই। এমনিভাবে সূতাতন্তুর মত সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে আমেরিকার ঘাঁটি করে বসা সম্ভব হবে না। তাই দেশের শিল্পপতি, কালবাজারীদের সঙ্গে এরাও যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ কবার জন্য বদ্ধ পরিকব হয়েছে। নেপথ্যে এদের অস্ত্রে যুক্তফ্রন্ট বিবোধী আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করছে। ভারতকে দ্বিতীয় ভিয়েৎনাম কববার জন্য যেন সি, আই, এ বদ্ধ পরিকর হয়েছে। এগুলি তো তাবই সূচনা।"

বেয়ারা চা ও খাবার পরিবেশন করে গেল। হিমাংশু চায়ের কাপে মুখ দিয়ে বলে "যুক্তফ্রন্ট সবকার ট্রাম কোম্পানীর পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে খুবই ভাল কাজ করেছে। এতে দেশের একটা মস্ত উপকার হয়েছে। এ মন্ত্রী সভায় বাম কমিউনিষ্ট উপমুখ্যমন্ত্রীর আপন দায়িত্বে কয়েকটি সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব স্বীকার কবতে হয়।

কিন্তু "ঘেরাও"ই বোধ হয় শেষ অবধি যুক্তফ্রন্ট সরকারের সর্বনাশ ডেকে আনবে। এই "ঘেবাও" এর আওতায় পড়ে হাজার হাজার কারখানায় 'লক আউট' ঘোষণা করা হচ্ছে। ছাটাই হচ্ছে হাজার হাজার শ্রমিক মজদুর। যার ফলে শ্রমিক সমাজে দেখা দিচ্ছে হাহাকার। দেশেব কলকারখানা সব বন্ধ। মজুবদের রুজি রোজগাব বন্ধ। এইভাবে "ঘেবাও" এর মাধ্যমে শ্রমিক সমাজের লাভ কিছু হচ্ছে না। পরন্তু ক্ষতি হচ্ছে অপূরনীয়। মাসের পর মাস অভাবের তাড়নায় বহু শ্রমিক পরিবার অর্দ্ধাহারে অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। "ঘেরাও" পদ্ধতিটা যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এতে যথার্থই মালিক শ্রেণী বা কারখানার ম্যানেজার প্রভৃতির উপর দস্তুর মত জুলুম করা হচ্ছে। ঘণ্টার পর

ঘণ্টা তাদের বসিয়ে রাখা যথার্থই মানবিক দিক থেকেও যুক্তিসঙ্গত নয়।

এই "ঘেরাও" রোগ সংক্রামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুলে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে, অফিসে সর্বত্রই এই "ঘেরাও" অনুশীলন করে দাবীদাররা তাদের দাবী আদায় করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকে। সুফল এতে হচ্ছে না। পরন্তু "ঘেরাও" এর ব্যাপারে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে বহু শিল্পপতি পশ্চিম বাংলা হতে তাদের কারখানা অন্য কোন রাজ্যে সরিয়ে নেবার সঙ্কল্প কবছে। এতে পশ্চিমবাংলাতে বেকার সমস্যা আবার প্রকট হয়ে উঠবে।"

আরাম দাঁ এসে তাঁদের আর কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই হিমাংশু সবার জন্য চিংড়ির কাটলেট ও আবও এক কাপ করে চা'র অর্ডার দিল।

চপলাকান্ত হেসে আরাম দাঁকে বল্ল "আরামবাবু, আমবা কিন্তু আপনার রেঁস্তোরার বেশ বড় খদ্দেব—নয় কি? আমাদের এই আড্ডায় আপনি কিন্তু বেশ লাভবান্ হচ্ছেন।"

"তা যা বলেছেন। আপনাদের সবার দয়াতেই তো দাঁড়িয়ে রয়েছি। নতুবা আমার মত গরীব লোকের সাধ্য কি একটা বেঁস্তোরা চালানো। আপনাদের সবার সহযোগীতা না পেলে কবেই আমাকে এই ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হ'ত। আপনাদের মত শিক্ষিত নেতাদের পদধূলিতে ধন্য হচ্ছে আমার এই রেঁস্তোরা। বাজে অবাঞ্ছিত কোন খদ্দের এখানে আসতে সাহস পায় না—আপনাদেরই ভয়ে।"

অলক হেসে উত্তর দিল "আমাদেরও তবে ভয় করবার মত কেউ কেউ এখনও আছে? এটা আমাদের পক্ষে শুভসংবাদ। যাদের নেতৃত্বকে ভয় করে না জনসাধারণ, পুলিশ এমন কি আমলাগোষ্ঠী—তাদের ভয়ে আপনার অবাঞ্ছিত জনের শুভাগমনের সম্ভাবনা এখানে নেই শুনে খুসী হলাম।"

আরাম দাঁ এদের আলোচনায় বাধা সৃষ্টি না করে—এদের অর্ডার সাপ্লাই করবার জন্য দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন।

হিমাংশু আবার আলোচনা সুরু কর'ল —"ঘেরাও"এর মত নক্সাল-বাড়ীর কৃষক বিদ্রোহ যুক্তফ্রন্ট সরকারের আর একটি কলঙ্ক। কেন্দ্র কিভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের উচ্ছেদ সাধন করতে পারে, সেই চেষ্টায় ব্যস্ত। তারই মধ্যে এই সময় উগ্রপন্থী বাম কমিউনিষ্টদের পরিচালনায় এই কৃষক বিদ্রোহ ঘটানো কি সঙ্গত হচ্ছে? কেবলমাত্র নক্সালবাড়ীতেই এই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ নয়। চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি কোন কোন গ্রামেও এই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।

নক্সালবাড়ীর সমস্যা ভূমিহীনের ভূমি লাভের সমস্যা। যুক্তফ্রন্ট সরকার তো কৃষকদের ভূমিদান, পল্লী অঞ্চলে সেচ জলের ব্যবস্থা, শস্যের বীজ দান ইত্যাদি কাজ করছেই—তবু এই সরকারকে পঙ্গু ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য এই প্রচেষ্টা কেন করা হচ্ছে?

কংগ্রেস শাসনে এই কৃষক বিদ্রোহ করা হয়নি কেন? তেভাগা ও তেলেঙ্গনার পরিণতির কথা স্মরণ করেই অথবা সে সময় পুলিশী অত্যাচারের কথা স্মরণ করেই কমরেডরা কি বিরত ছিলেন? আজ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উভয় সঙ্কটে ফেলবার জন্য রাজনৈতিক বার্গেন করার সুযোগ পাবার সম্ভাবনায় এই বিদ্রোহ করান হয়েছে।

এতে লাভ হচ্ছে কার? যুক্তফ্রন্ট সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কেন্দ্র রাজ্যে শান্তি রক্ষার নামে পশ্চিম বাংলার উপর কর্তৃত্ব করতে আসবার সুযোগ পাচ্ছে।

দুঃখ হয়, যথার্থই ভারতের আজ বড়ই দুর্দিন। কোন পার্টিই দেশকে ভালবাসে না। দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে না। সকলেই আপন আপন পুঁজি ভর্ত্তি করতে বা পাটির স্বার্থ সিদ্ধিতেই ব্যস্ত। ফলে ভারতের আকাশে অন্ধকার ভবিষ্যতের কাল মেঘ দেখা দিচ্ছে। একদিকে পাকিস্তান, অন্য দিকে চীন শত্রু।

অপর দিকে আমেরিকা ভারতকে কলোনীতে পরিণত করবার বা আমেরিকার ঘাঁটি করবার প্রচেষ্টা চলেছে। অথচ ভারতবাসীর বুদ্ধি, বিক্রম যে কোন জাত ও দেশ হতে অনেক বেশী। তবে ভারতবাসীর লোভেই বোধ হয়—ভারতের পতন আবার ঘটবে।

Max O'Rell বলেছেন—

"To be a chemist you must study chemistry ; to be a lawyer or a physician you must study law or medicine ; but to be a politician you need only to study your own interests."

কথাটা যে কত সত্য তা আজ আমাদের নিজেদের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারা যায়। আপন আপন স্বার্থের মোহে সবাই অন্ধ। তাই দেশেব কথা, জাতির কথা চিন্তা করবার আর কারো সময় থাকে না।

Rutherford B. Hayes যে বলেছিলেন "He serves his party best who serves the country best"—এ যেন আজ আমরা ভুলতে বসেছি। তাই একই সবকারের শরিক হয়ে আমবা পরস্পরকে অপদস্থ করতে ব্যস্ত হচ্ছি।

যাক্, কথায় কথায় অনেক দেরী হয়ে গেল। আজ আমাদের Partyর একটা মিটিং আছে। এবার আমি উঠি"—বলে রেঁস্তোরার বিল এর টাকা চুকিয়ে দিল।

কিরীটি বল্ল "হিমাংশুদাকে মন্ত্রী পদ না দেওয়া কিন্তু খুবই ভুল হয়েছে।"

হিমাংশু স্মিত হাস্যে উত্তর দিল—"রক্ষে কর। আর গদীতে বসবার সাধ আমাব নেই। সংসার না করেও—সংসারের নানা দায়দায়িত্বও বইতে হচ্ছে। নিজের অফিস, পার্টি, কাকাবাবুর সংসার। তদুপরি আরও বোঝা চাপালে বোধ হয় আমার মেরু দণ্ডটিই ভেঙে যাবে। তাছাড়া সবাই যদি পূজারী হয়—তবে প্রসাদ

নেবে কে? সমাজসেবা, দেশসেবাই আমার ব্রত। তার বেশী আমি কিছু চাই না। আজ তবে উঠি"—বলে হিমাংশু রেঁস্তোরা হতে বেড়িয়ে পড়ল।

হিমাংশুর চলার পথের দিকে তাকিয়ে কিরীটি বল্ল"এমন নিঃস্বার্থ, পরোপকাবী লোক এ যুগে বিরল। কত অশান্তি, কত ঝড় ঝঞ্ঝা নিত্যি রোজ এঁর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে,—তবু কেউ কখনও হিমাংশুদার মুখের হাসি কেড়ে নিতে পারেনি।"

২৩

চন্দ্রিকাকে ঘিরে বৃদ্ধ সমরবাবু ও বৃদ্ধা সুতারার জীবনের শুষ্ক দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। হিমাংশু সবার সব দায় দায়িত্বের বোঝা আপন কাঁধে তুলে নিয়েছিল। হতভাগ্য সমরবাবুদের আশা নিরাশাকে মাড়িয়ে ছেলেরা সকলে আপন আপন খেয়াল খুসীর তবীতে গুণ টেনে চলেছে। যাঁদের স্নেহ, আদর, যত্নে তারা এত বড় হয়েছে—তাঁদের তারা ভুলেছে। পরন্তু নানা মিথ্যে অভিযোগে তারা এই বৃদ্ধ বৃদ্ধার প্রতি তাদের তাচ্ছিল্যের কৈফিয়ৎ সাজাচ্ছে।

কবি বলে মামা দাদার যথাযথ চিকিৎসা করাননি, তাই দাদার এমন অকাল মৃত্যু ঘটলো। তন্ময়, মৃণ্ময়ের অভিযোগ তাদের বিদেশের ডিগ্রী আনবার সুযোগ সমরবাবু দেন্‌নি। সেই অর্থে ভাগ বসিয়েছে তাদের পিস্‌তুত জেঠ্‌তুত ভাইরা। কোন অভিযোগের প্রতিবাদ তাঁরা করেননি। কেবল ফেলেছেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

ভেবেছিলেন জীবনের বাকী ক'টা দিন কোন রকমে কাটিয়ে যাবেন। এমন সময় মৃণালের দায়িত্ব এসে তাঁদের উপর পড়'ল। এই বয়সে নূতন করে আর কোন বন্ধনে নিজেদের জড়াবার ইচ্ছে তাঁদের ছিল না। তবু এই অবাঞ্ছিত ঘটনাকে অস্বীকার করতেও তাঁরা পারলেন না। তাই নূতন করে এক মায়ার জালে জড়িয়ে পড়'তে হ'ল।

চন্দ্রিকা বাইরের কর্মক্ষেত্রে নেবেছে বলে আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়নি। তাই চন্দ্রিকা পূর্বের মতই এই দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধার যত্ন আত্তি করত। নিজের হতভাগ্যের কথা এঁদের কাছে গোপন করে—হাসিমুখে প্রফুল্লচিত্তে এঁদের সেবা করাই যেন তার জীবনের একমাত্র

কর্ত্তব্য। সারা দিনের কর্মক্লান্তির পরও নানা গল্প গুজবের সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্ন চিত্তে এঁদের পরিচর্য্যা করে সাময়িক কালের জন্য এঁদের দুঃখে ভরা ব্যথাকাতর জীবনের কথা ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করত।

হিমাংশুর জীবনেও বৌদির স্নেহের মূল্য কম নয়। নিজের প্রতিই কেবল চন্দ্রিকা উদাসীন। নতুবা গৃহের প্রতিটি পরিচারক পরিচারিকার প্রতিও তার সতত সজাগ দৃষ্টি।

হিমাংশু ভালবেসেছিল চণ্ডীকে। চণ্ডীর মধ্যে সে দেখেছিল তার মানস প্রতিমাকে। তারই আদর্শের প্রতিবিম্ব রূপে দেখেছে চণ্ডীকে। কিন্তু চণ্ডীর মন বাঁধা পড়েছিল সুহাসের কাছে। হিমাংশুকে সে নিজের বড় ভাই এর মত শ্রদ্ধা করত। তার আদর্শকে সে নিজের জীবনেও গ্রহণ করেছিল। হিমাংশুকে সে ভক্তি কর'ত, বিশ্বাস কর'ত। বিপদে আপদে বরাবর সে হিমাংশুর কাছেই এসে দাঁড়াত। কখনও মৃণ্ময়ের কাছে যায়নি। ছোটবেলা হতেই মৃণ্ময় অপেক্ষা হিমাংশুর প্রতি ছিল তার পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা। কিন্তু হিমাংশুর গভীর মনের আঁচ সে কোনদিনও পায়নি। হিমাংশুর স্নেহ সে পেয়েছে। পেয়েছে তার উদার সাহচর্য্য।

সুহাসের সঙ্গে চণ্ডীর আবাল্যের যে সম্বন্ধ ছিল—তা ছিল প্রেমের সম্বন্ধ। প্রণয়ের মাধুর্য্যে উভয় উভয়কে নিকটে টেনেছে। তাদের ভালবাসা যেন ঝর্ণার স্বচ্ছ জলের মত কুল্‌কুল্ করে বয়ে চলেছে আপন গতিতে। এ ভালবাসায় আছে তীব্রতা। একের অদর্শনে অন্যকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। কিন্তু নেই তেমন গভীরতা। এ যেন সাগর সেঁচে জল তুলে ঘড়ায় ভর্তি করে রাখা।

কিন্তু হিমাংশুর ভালবাসায় ছিল গভীরতা। প্রতিদান না পেলেও এ ভালবাসার যেন ক্ষয় নেই। প্রতিদিনের প্রতি কাজের মধ্য দিয়েও যেন এ ভালবাসায় ক্লান্তি বা অবসাদ বা বিরক্তি আনে না। প্রভাতের প্রথম উষার ছটার মতই যেন তার ভালবাসা নির্মল, সুন্দর, নিষ্পাপ। হিমাংশু জানে চণ্ডী সুহাসকে ভালবাসে। তবু

হিমাংশুর ভালবাসায় ভাটা পড়েনি। সে যেন চণ্ডীকে স্নেহ করে, ভালবেসে তৃপ্তি পায়, আনন্দ পায়। সুহাসের মৃত্যুর পরও সে কোনদিন তার মনের কথা চণ্ডী বা অপর কারো কাছে ব্যক্ত করেনি। চন্দ্রিকা বা খুড়ীমা তার বিয়ের প্রসঙ্গ তুল্লে নেহাৎ হাল্কা কথার আবরণে সে তা চাপা দিত। তবু কখনও সে তার মনেব কথা ব্যক্ত করেনি। চন্দ্রিকা অনেক সময় তার এই আদর্শ স্থানীয় দেওরের সঙ্গে চণ্ডীর বিয়ের প্রস্তাব করেছে। চণ্ডীর এ সম্বন্ধে মতামত কি হিমাংশু তা কখন জানতে আগ্রহ দেখাত না। তবে চন্দ্রিকার এই প্রস্তাবে সে তেমন গুরুত্বও দেয়নি কখনও।

হিমাংশুর স্বভাবের মধ্যে এমন একটা সৌন্দর্য্য, নির্মলতা ছিল যা আকৃষ্ট কর'ত সবাইকে। হিমাংশু সবারই আপনজন। কিন্তু তার গহন মনে সে একান্ত ভাবেই একা। সেই গহন মনের খবর কেউ-ই জানতে পারতো না। জানবার সুযোগও সে কখনও কাউকে দেয়নি।

চন্দ্রিকাকে বাইরেব থেকে দেখে কেউ তার মনের তল পেতো না। সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে সে হেসে গল্প গুজবের মধ্য দিয়েই কাটাতো। বাড়ীর সবার প্রতি কর্ত্তব্যও সে যথাযথ করত—কিন্তু তার আবাল্যের প্রেমের অমর্য্যাদাকে সে কোন প্রকারেই ক্ষমা করতে পারেনি। এই অপমানের অন্তর্জ্বালা যেন অহর্নিশ তাকে দাহ করে। মৃণ্ময় তার প্রতি এমন নিষ্ঠুর হবে, এইভাবে সংসার ও সমাজের সামনে তাকে হেয় করবে,—এ যেন সে কখনই ভাবতে পারেনি।

তাই অপ্রত্যাশিত এই আঘাতে তার অন্তর ভেঙ্গে চৌচির হলেও, বহির্জগতে সে নিজেকে এমন শক্ত রেখেছে যে, কেউ বুঝতে পারেনি মৃণ্ময়ের দেওয়া আঘাত চন্দ্রিকাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেছে।

চন্দ্রিকা বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে জানে সংসারে প্রকৃত সহানুভূতি বা সমবেদনা জানাবার কেউ নেই। মৌখিক সমবেদনা জানাবার

হলে তাকে উপহাস করবে সবাই। তার ভাগ্যকে বিদ্রূপ করবে। তাই এই লৌকিক সহানুভূতি জানাবার সুযোগ সে কাউকে দেয়নি। যে-ই তাকে সহানুভূতি জানাতে এসেছে—চন্দ্রিকার সহজ কথাবার্তা হাসি গল্পে সে এমনই জমে·গেছে যে—যে কারণে তার আসা—শেষ অবধি তাই আর প্রকাশ করা হয় নি।

মানুষের সাইকোলজি চন্দ্রিকা ভালভাবেই জানে। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর মানুষের মধ্যে নেই কোন আন্তরিকতা, সহৃদয়তা। আছে কেবল হিংসা, ঈর্ষা, লোভ ও পরশ্রীকাতরতা। তাই চন্দ্রিকাও বাহির জগতে মানুষের স্বরূপ চিনে—সেভাবেই মানুষের সঙ্গে মেশে। নিজের দুঃখ বেদনার গ্লানি একান্তভাবেই থাকে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার কিছুটা প্রকাশ ক'রত হিমাংশু ও চণ্ডীর কাছে।

বহুকাল পর হঠাৎ একদিন অম্বিকা চন্দ্রিকাকে ফোনে তার বাসায় যাবার আমন্ত্রণ জানায়। মার মৃত্যুর পর দুঃখে কষ্টে ভাই বোনেদের দিন কেটেছে। কিন্তু কখনই অম্বিকা ফিরেও তাকায়নি বা তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তাই দীর্ঘকাল পর অম্বিকার ফোন পেয়ে একদিকে চন্দ্রিকা যেমন পুলকিত হয়েছিল, তেমনি অন্য দিকে বিস্মিতও কম হয়নি।

চন্দ্রিকা সমরবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে এই খবরটা দিল। এই খবর পেয়ে তাঁরাও কম বিস্মিত হন্‌নি। তবু সুতারা বলেছিলেন "হয়'ত বয়সে তার বিচার বুদ্ধি জেগেছে। আবার হয়'ত তোমাদের স্নেহ, ভালবাসা পেতে চায়। কিন্তু তোমায় একা কেন ডাকলো? চণ্ডী ও চন্দ্রকেও তো তার ডাকা উচিত ছিল। যাক্‌, তুমি যাও, শুনে এসো কেন দাদা তোমাকে ডাকলেন?" হিমাংশু শুনে বলেছিল, "বৌদি, তুমি যদি কিছু মনে না কর, তবে একটা কথা বলি সাহস করে। তোমার দাদাটিকে কিন্তু আমার বড়দার ওখানে যাতায়াত করতে প্রায়ই দেখা যায়।"

"তুমি কি করে জানলে ঠাকুরপো?' তুমি তো ঐ বাড়ীতে অনাহুত ভাবে যাও না।"

"আমরা রাজনীতি করি বৌদি। সুতরাং আমাদের অনেক পরিবারের হাঁড়ির খবরের প্রয়োজন আছে। আমার বড়দা এখন রাজনীতি করেন না। সখের রাজনীতিও তাঁব শেষ হয়ে গেছে। এখন তিনি কোন বিদেশী সংস্থার চরের কাজ করছেন। তাই অনেক মহাপুরুষই অর্থের লোভে বড়দার দ্বারস্থ হচ্ছে খবব পাই। তারমধ্যে তোমার দাদাটি অন্যতম।

মাঝে মাঝে অবাক্ হয়ে ভাবি একি বাস্তব—না স্বপ্ন? কাকাবাবুর ছেলে—দেশের প্রতি এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করছে—এও কি সম্ভব? আমাদের ভাই বিদেশীকে দেশ হ'তে তাড়াবার জন্য—দেশের স্বাধীনতাব জন্য আত্মদান করলো তিলে তিলে কাবা প্রাচীরের অন্তরালে। একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে— বড়দাব এ কি পরিণতি?

তাই ভাবছি তোমার দাদা বড়দাব চর হয়েই ডাকছে না তো তোমাকে? ঐখানে তুমি একা যেও না। চন্দ্র বা চণ্ডীকে সঙ্গে নিয়ে যেও।"

"তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে ছোট ভাই বোনের সামনে আমি লাঞ্ছিত হতে চাই না। বরং তুমি আমার সঙ্গে চল।"

করজোড়ে হিমাংশু বলে "ঐটি আমাকে মাপ করতে হবে বৌদি। এমনিতেই অযথা বড়দার আক্রোশ আমার উপরে। তাঁর ধারণা আমিই বোধ হয় তোমাদের পুনর্মিলনের পথে অন্তরায়।"

বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে চন্দ্রিকা বলে "একি ধরণের কথা? তোমার বড়দা স্বেচ্ছায় আমাকে ত্যাগ করে পুনরায় আধুনিকাকে বিয়ে করলেন। আমাদের পরস্পরের সম্মতিতে যা'তে বিবাহ বিচ্ছেদটা তাড়াতাড়ি ঘটাতে পারে—এজন্য তিনি আমার সই চেয়ে যে চিঠি আমাকে দিয়ে ছিলেন,—সে চিঠিও তো আমার কাছে আছে। তারপর আবার তোমাকে দোষারোপ করেন কেন?"

"কেন তা তিনি জানেন। তবে এইটুকু আমি বুঝি মানুষ তার নিজের স্বার্থ নিয়েই দুনিয়াকে বিচার করে। হয়'ত তখন বড়দার তোমার থেকেও অত্যাধুনিকার প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করে নূতনের পিছনে ধাওয়া করেছিলেন। এখন আবার দেশ ও সমাজের পবিস্থিতি অনুযায়ী হয়ত তোমাবই প্রয়োজন তিনি বেশী উপলব্ধি করছেন--বিশেষ করে চম্পা দেবী যখন তাকে পরিত্যাগ করে ইয়াংকির সঙ্গে নূতন ঘর বাঁধবার নেশায় চলে গেছেন।"

"ওখানেই তো তোমরা মস্ত ভুল কর ঠাকুরপো। আমরাও রক্ত মাংসের মানুষ। মান অপমান বোধ আমাদের মধ্যেও আছে। আমরা খেলার পুতুল নই। বা কারো খেয়াল খুসী চরিতার্থ করবার জন্য আমরা জন্মাইনি। আমাদেরও রুচিবোধ আছে, নীতিজ্ঞান আছে।

তোমার বড়দাব বর্ত্তমান প্রকৃতির সঙ্গে আমার স্বভাবের কোথাও আজ আর মিল নেই। তাই তাঁর কাছে যে কাজ অন্যায় নয়, আমার কাছে সে কাজ অত্যন্ত গর্হিত। তোমার বড়দার খেয়াল খুসী মত নিজের আদর্শ, ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে আমি তাঁর সংসার করতে যাব, এ ধরণের আশা বাতুলতা মাত্র।"

২৪

জৈষ্ঠ্য মাস, আকাশে বাতাসে বিধবার রুক্ষতা বিরাজ করছে। সারাদিনের উত্তপ্ত বালুরাশি গাছ পালাকে ধূসর সাজে সাজিয়ে দিয়েছে ধূলো ঝড়ে। প্রকৃতি যেন গৈরিক বসন ধারণ করেছে। গোধূলির আকাশও গৈরিক রঙ্গে পশ্চিমাকাশ রাঙ্গিয়েছে। অল্প কিছুক্ষণ আগে যে গুমোট আবহাওয়ায় কলকাতাবাসীর প্রাণ আইঢাই করছিল,—বৃষ্টি শূন্য ঝড়ো হাওয়ায় সে ভাবটা খানিকটা কেটেছে। আশে পাশে কোথাও হয়ত ছুই এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে, তারই হিম স্পর্শ কলকাতার নিদাঘের উত্তপ্ত হাওয়াকে শীতল করেছে।

চণ্ডী কিছুক্ষণ আগে ধূলো ঝড় থেকে তার ঘবেব পরিচ্ছন্নতা বাঁচাবার জন্য যে দরজা জানলা বন্ধ করেছিল, ঝড়ের বিদায় নেবার পর সব খুলে ঘরের ধূলো ঝাড়তে ব্যস্ত। দরজা জানলা [illegible] থাকা সত্ত্বেও ঘরের আসবাবপত্র ও মেঝেতে যে আন্দাজ ধূলো পড়েছে—খোলা থাকলে যে কি অবস্থা হ'ত তা যেন কল্পনা করাই যায় না। ঘরের লাল সিমেণ্টের মেঝে সাদা হয়ে গেছে। যে জিনিষে হাত পড়ছে—ধূলোয় তা ধূলোময় হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, সে যেন সাগরপারে ধূলো নিয়ে খেলছে।

হিমাংশুদাকে সে ফোনে ডেকেছে। তাঁর সঙ্গে চন্দ্রর জন্য মেয়ে দেখতে যাবে। দিদিকে বলেছিল তার সঙ্গে যেতে। কিন্তু দিদি যেন আজকাল কেমন বদলে গেছে। জামাইবাবু আবার বিয়ে করার পর থেকে দিদি নিতান্ত অসামাজিক হয়ে গেছে। অবশ্য এজন্য দিদির দোষ দেওয়া যায় না। আধুনিক সমাজ এমন হয়েছে,—মানুষের স্বাভাবিক জীবন যদি ব্যাহত হয়, তবেই নানা রকম বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ বাণে জর্জ্জরিত করে মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তুলে। শুধু

তাই নয়। সমাজের তিক্ত সমালোচনায় যার উদ্দেশ্যে এসব বর্ষিত হচ্ছে তার যে কি দুরাবস্থা হচ্ছে তা কেউ দেখে না। সুতরাং এমন সমাজকে যে দিদি কৌশলে বর্জ্জন করে চলেছেন, সেটা তার জন্য ভালই। সুভার স্কুল কয়েকদিন ছুটি। তাই সেও চণ্ডীর কাছে ছুটির ক'টা দিন কাটাতে আসবে লিখেছে। বিশেষ করে তার জীবনে এমন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, যাব সমাধানের জন্য চণ্ডীর বুদ্ধি ধার করবার প্রয়োজন হয়েছে। বিশেষ করে সেই কারণেই সুভা আসবে। সুভা আসলে ভালই হবে। সুভাকেও চন্দ্রর জন্য মেয়ে দেখতে নিয়ে যাওয়া যাবে।

আগেকার দিনে কনে দেখা হ'ত দুইপক্ষের অভিভাবকদের সামনে কনে আসত। বরপক্ষ নানা ভাবে কনের রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি পরীক্ষা করত। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সঙ্গে বন্ধুবান্ধবসহ স্বয়ং বরও আসতো ভাবী বধূকে দেখবার জন্য। কিন্তু চাক্ষুস দেখাই হ'ত। কিন্তু পরস্পারের মধ্যে কোন ভাব বিনিময় সম্ভব হ'ত না।

কিন্তু এই প্রাচীন প্রথা আধুনিক সমাজে অচল হয়েছে। আধুনিক যুগে এমন ভাবে সেজে গুজে পাত্রপক্ষের সামনে পরীক্ষা দিতে মেয়েরা অনিচ্ছুক। কারণ শিক্ষিতা বয়স্থা মেয়েরা পণ্য দ্রব্যের মত নিজেকে যাচাই করতে দিতে আর রাজী নয়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাত্রীর অজ্ঞাতেই তাকে দেখানো হয়—সিনেমায়, রেস্তোরায়, চিড়িয়াখানায় বা বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রভৃতি জায়গায়। চন্দ্রর ভাবী বধূকেও তাই দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে বোটানিক্যাল গার্ডেনে। পাত্রীর পিসি চণ্ডীর সহকর্মী। তাই পাত্রীকে নিয়ে পিসিরা পিক্‌নিক্ করতে আসবে। এদিক থেকে চণ্ডী পিসির বান্ধবী হিসাবে সেই পিক্‌নিকে আমন্ত্রিত হয়েছে। সেই সূত্রে পাত্রীও দেখা হবে। চণ্ডীর সঙ্গে যাবে হিমাংশুদা ও সুভা। হিমাংশুদা ও সুভার সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে পাত্রীর কোন ত্রুটি থাকলে তা ঢাকা থাকবে না। চন্দ্রকে সংসারী করাই যেন চণ্ডীর শেষ কর্ত্তব্য।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার নেবে এলো মহানগরীর বুকে। প্রকৃতি যেন কালো বোর্‌খা দিয়ে মুখ ঢেকেছে। কিন্তু অন্ধকারের রূপ এই মহানগরীতে দেখা যায় না। সন্ধ্যার ঘোমটা টানবার আগ হতে চারিদিকে দীপান্বিতা জ্বলে উঠে। গৃহের নিয়নের আলোর রশ্মি জানলা দিয়ে রাস্তা আলোকিত করছে। সঙ্গে সঙ্গে নানা রং বেরং-এর বিজ্ঞাপনের বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকে রাজপথ দোকানগুলি দিবালোকের মতই উজ্জ্বল হয়ে যায়। ছোট্ট ফ্ল্যাটের ব্যাল্‌কনীতে দাঁড়িয়ে চণ্ডী দেখছিল—কর্মচঞ্চল মহানগরীর রূপ। এমন সময় কে দরজার কড়া নাড়লে ?

চণ্ডী দরজা খুলে দিতেই, হিমাংশু ঘরে ঢুকে বলে "তলব করেছ কেন ?" "না ডাকলে তো আসেন না। বিশেষ করে আপনারা সব গণ্যমান্য নেতা। তাই মাঝে মাঝে দেব দর্শন কববো বলে ডাকতে হয় আপনাদের।"

অট্টহাস্যে কক্ষ প্রকম্পিত করে হিমাংশু উত্তব দিল "তুমি ঠিকই বলেছো চণ্ডী। কলি যুগে দেবদর্শনে ভক্ত মন্দিবে যায় না। দেবতা নিজেই ভক্তের দুয়ারে এসে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ হন্। কলিযুগে ভগবানকে কেউ ডাকে না। যারা তাঁর ভজনা করে—সবাই তাদের উপহাস করে। অশেষ দুঃখ তাদের সইতে হয়। তাই ভগবান করুণা বশতঃ তাদের গৃহাঙ্গণেই এসে পূজা নিয়ে যান্।"

"সরি। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি ঠিক এই অর্থে বলিনি। অর্থাৎ আপনি সর্বদা দেশের হিত সাধনে ব্যস্ত থাকেন,—আপনার কাছে গেলেও কথা বলবার সুযোগ হয়ত আমার মিলবে না। তাছাড়া যে কয়দিন আপনার খোঁজে আপনাদের বাসায় গিয়েছি, শুনেছি আপনার দর্শন দুর্লভ। বলুন দোষটা কার ?"

স্মিত হাস্যে হিমাংশু বল্ল "বাঃ আমি তো প্রথমেই দোষ কবুল করেছি। তোমরা ডেকে আমাদের কৃতার্থ কর বসেই তো—

আম'দের কিছু দাম আছে। নতুবা আমাদের মত অপদার্থ অভাজনদের মূল্য কেউ কি দেয় ?”

চণ্ডী লজ্জিত স্বরে উত্তর দিল “একবার নয়। এক'শবার ঘাট মানছি। আমার শ্লিপ অফ টাং এর জন্য যে ত্রুটি হয়েছে তা উইতড্র করছি। সত্যি হিমাংশুদা হু'টি বিশেষ প্রয়োজনে আপনার পরামর্শ ও সহায়তা আমার দরকার। তাই আপনাকে এমন ঝড়ের মধ্যেও এই কষ্ট দিলাম।”

“তোমাদের মুখে আদেশ শুনে আমি অভ্যস্ত। কিন্তু দোহাই মিষ্টি সুরে বিনয় সহকারে কিছু বলো না। ওটা আমার ধাতস্থ হবে না। স্মুতরাং চণ্ডা দেবী, তোমার রুদ্র রূপ আমাকে দর্শন করিয়ে আদেশ কর--এই অভাজন হুকুম পালনে সর্বদা তৈরী। কিন্তু বরাভয় দেখিয়ে ভক্তকে প্রশ্রয় দিও না। তবে কিন্তু সামাল দিতে ত্রাহি মধুসূদন বলে ডাক ছাড়তে হবে।”

চণ্ডী কপট গাম্ভীর্য্য সহকারে বলে “আমায় আর লজ্জা দেবেন না। আপনার মত কর্ম্মঠ, সদা ব্যস্তবাগীস্ লোককে এভাবে বিরক্ত করা সত্যি আমার অন্যায়—তা বুঝি। কিন্তু আপনি ছাড়া আমাকে কে পথ দেখিয়ে দেবে ? দিদি ? দিদির কথা আমার থেকে আপনিই বেশী জানেন।”

“অত ভণিতা থাক্ চণ্ডী দেবী, এবারে ক্ষুধার্ত্ত জনকে কিছু খাবার দিয়ে প্রাণ বাঁচাও আগে।”

চণ্ডী লজ্জিত মুখে—“ছিঃ, ছিঃ, শুধু বকেই চলেছি। এখনও আপনাকে চা দিইনি। আপনি কত ক্লান্ত হয়ে এসেছেন। দুই মিনিটের মধ্যেই আপনার চা তৈরী হয়ে যাবে। আপনি মোগলাই পরোটা ভালবাসেন বলে এই একটু আগে আমি তার সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। গ্যাসে দু'মিনিটে তা ভেজে আনছি। আপনার খাবার খেতে খেতে চা'র জল ফুটে যাবে”—বলতে বলতে চণ্ডী দ্রুত পদে খাবারের ব্যবস্থা করতে চলে গেল।

অল্পক্ষণ পরে এক হাতে জল ও প্লেটে গরম মোগলাই পরটার সঙ্গে কিছু আলুর দম ও সন্দেশ নিয়ে চণ্ডী ফিরে এসে টেবিলের উপর খাবার সাজিয়ে রেখে বল্ল "আপনি বাথরুম থেকে মুখটা ধুয়ে আসুন হিমাংশুদা। আপনার সঙ্গে বিশেষ কতকগুলি জরুরী পরামর্শ আছে।"

হিমাংশু হাতমুখ ধোবার উদ্দেশ্যে যেতে যেতে বল্ল "আমারও কিছু খবর তোমাকে দেবার আছে। হয়'ত সেসব তুমি এখনও জানো না। আসছি আমি।"

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে হিমাংশু রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এসে তার জন্য সাজানো খাবারের সামনে বসে বল্ল "এটাই তোমাদের বড় দোষ চণ্ডী। তোমাদের কাছে ক্ষিদের কথা জানালেই তোমরা অমনি এত খাবার এনে হাজির কর যা দেখে মনে হয়, কোন রাক্ষসের ক্ষুধা মিটাবার জন্য এই চেষ্টা। এ ভারী অন্যায়। তবু মেয়েদের কিছুতেই বিশ্বাস করানো যায় না যে ক্ষিদে পেলেও,—আমরা মানুষ, রাক্ষস নই।

দোষ শুধু একা তোমাদের নয়। চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সামনে পেয়ে অসংযত জিহ্বাকে সংযমের রশ্মিতে বেঁধে রাখা যায় না। ফলে উদর মহাশয় সত্যাগ্রহ সুরু করে। পরিণামে এই হতভাগাকে ভুগতে হয়।"

চণ্ডী হাসিমুখে উত্তর দেয়—"আপনার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না। আজ আপনাকে মানুষের অনুপাতে খাবার দেওয়া হয়েছে। গল্প করতে করতে খান্। দেখবেন একটুও বেশী কিছু দেওয়া হয়নি। তাছাড়া এখনই তো সুবোধ বালকের মত বাড়ী ফিরবেন না। দেশোদ্ধার করে সেই তো মধ্যরাত্রে বাড়ী ফেরা হবে। ততক্ষণে যে খাটুনী খাটবেন—তা'তে সব হজম হয়ে যাবে।"

"তা যা বলেছো, যুক্তফ্রন্ট যদিও বা গদী পোলো, কিন্তু ১৪ শরিক নিয়ে সংসার পেতে নাভিশ্বাস উঠবার জোগাড় হয়েছে। তদুপরি

'বাংলা কংগ্রেসে' ঝাঁকের কই এর মত সদস্য করা হয়েছিল, তাদের গুণাগুণ চরিত্র বিচার না করে। পরিণামে আজ আমাদের ভাবতে হচ্ছে কি ভাবে 'বাংলা কংগ্রেস' সদস্যদের কংগ্রেসী প্ররোচনা ও টাকার থলি হতে রক্ষা করা যায়। ইতিমধ্যেই তো পাঁচ জন বাংলা কংগ্রেসী টাকার থলির লোভে পিছন দুয়ার দিয়ে কংগ্রেসে আবার ভিড়েছে। আরও একজনকে নিয়ে টানাটানি হয়েছে। অবশ্য শেষ অবধি আমাদেরই জয় হয়েছে। তাই এখন আমাদের অবস্থা শ্যাম রাখি না কূল রাখি হয়েছে।"

চণ্ডী সুযোগ বুঝে হিমাংশুকে কিছু কথা শুনিয়ে দিল। কারণ হিমাংশু সর্বদা তাকে তার পার্টি নিয়ে "টন্ট" করে থাকে। তাই চণ্ডী এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়লে না। সে বল্লে "জনসাধারণ কিন্তু আজ আপনাদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে। তিলে তিলে প্রত্যাশার অপমৃত্যু দেখতে দেখতে জনসাধারণের মন নিরাশায় ভরে যায়। আপনারা ঢোঁড়া সাপ। শুধু ফোঁস ফোঁস করতে পারেন। ছোব্‌ল মারবার ক্ষমতা নেই। কেবল কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করলেই সমস্যা মেটে না, জনসাধারণ আর ঐ একঘেয়ে বুলি শুনতে নারাজ।

চালের দর দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচ টাকা কিলোতে দাঁড়িয়েছে। চালের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের আকাশ ছোঁয়া দাম। তবু জনসাধারণ নীরবে সব কিছু মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনাদের ১৪ শরিকের কোন্দলে মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। এ যেন ১৭ সতীন নিয়ে আপনারা ঘর বেঁধেছেন। তাই এত কোন্দল। আপনাদের এই কোন্দলে জনসাধারণের বুক নিবাশার আঘাতে ভেঙ্গে যাছে।

কত সম্ভাবনা, কত আশা নিয়ে জনসাধারণ আপনাদের গদীতে বসিয়েছিল। কিন্তু আপনারা তাদের সেই প্রত্যাশার কতটা মূল্য দিতে পেরেছেন ? তাই প্রথম দিকে কালোবাজারীরা আপনাদের

শাসকের আসনে দেখে শঙ্কিত হলেও, পরে বুঝতে পেরেছে আপনাদের তর্জ্জন গর্জ্জনই সার। বিষ নেই। তাই আপনাদেরই চোখের সামনে তারা কালবাজার খুলে বস্‌তে ইতস্ততঃ করছে না।"

"আমরা এই স্বল্প সময়ে কিছুই করিনি এমন অপবাদ দিও না। অবশ্য আমাদের ১৮ দফা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। সে ত্রুটি অবিশ্যই স্বীকার করি। তবে কিছু আমরা করেছি। যেমন —(১) রাজনৈতিক কারণে বরখাস্ত সরকারী কর্মচারী এবং ৬০০ পরিবহণ কর্মীর পুনরায় কাজে বহাল করেছি। (২) বিধান সভার চারিদিক হতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহৃত করা হয়েছে। (৩) অর্থ মন্ত্রী ৪ মাসের মধ্যে ১০৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন। (৪) যুক্তফ্রন্ট সরকার ট্রাম কোম্পানী এবং ন্যাশান্যাল মেডিকেল কলেজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছে। (৫) নক্সালবাড়ীর কৃষক আন্দোলন বিপথগামী হওয়ায় ছয়জন মন্ত্রী তাদের সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেবার জন্য ছুটে গেছেন। (৬) শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। (৭) কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করা হয়েছে···।"

হিমাংশুর কথা শেষ করতে না দিয়ে চণ্ডী বল্ল, "সবই বুঝলাম, হিমাংশুদা। কিন্তু জুলাই মাসে খাদ্যমন্ত্রী যখন পদত্যাগ করবেন মনস্থ করলেন, তখন আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর অনুরোধে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বদলালেন। কিন্তু এখন? ২রা অক্টোবর আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী কিনা দ্বিতীয় থানু পিল্লাই হতে যাচ্ছিলেন। যে মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী "সিকিউরিটি" পুলিশ ছাড়া এত মাস চল্‌তে পারলেন—হঠাৎ রাতারাতি তাঁর সেইফ্‌টির জন্য পুলিশের প্রয়োজন হোল। শুধু পুলিশ নয়। কংগ্রেসের সমর্থনে যিনি নূতন মন্ত্রীসভা পত্তন করতে যাচ্ছিলেন—কেন্দ্রের সহযোগে তিনি মিলিটারী ব্যাটালিয়ানের চাপে সারা পশ্চিমবঙ্গের শ্বাস রুদ্ধ করবার জোগাড় করেছেন। তাঁর মত প্রবীণ বিচক্ষণ, আদর্শবান্ লোকের পক্ষে কি

এরকম দলদ্রোহীতা শোভনীয়? আপনাদের বাংলা কংগ্রেসের আগা হ'তে গোড়া পর্যন্ত মিথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই সবাই টল্‌টলায়মান। কই অন্য কোনও পার্টির মধ্যে তো এমন দলছুটের হিড়িক দেখা যাচ্ছে না।"

"মুখ্যমন্ত্রীর ২রা অক্টোবরের থাম্নু পিল্লাই এর অভিনয় যথার্থই সমর্থনীয় নয়। কিন্তু তাও তো তোমাদের পার্টির জন্যই এত সব কাণ্ড তিনি করলেন। কিছু গোপন তথ্য তোমাদেব পাটি সম্বন্ধে তিনি পেয়েছিলেন—যার পরিণামে তিনি পদত্যাগ করে নূতন মন্ত্রী সভা পত্তনের ব্যবস্থা করছিলেন।"

চণ্ডী হেসে উত্তর দিল, "এ ভারী মজার কথা। কাকে আপনার কান নিয়ে গেছে শুনে আপনি কাকের পিছনে ছুটবেন—নাকি কানে হাত দিয়ে দেখবেন—আপনার কান আছে কিনা।

বাম কমিউনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে কেউ যদি তাঁকে মিথ্যে কিছু তথ্য দিয়ে থাকে,—তবে তাঁর কি উচিত ছিল না সে সম্বন্ধে তাঁর মন্ত্রীসভায় সেই বিষয়ে আলোচনা করে—তাঁদের সোজাসুজি চ্যালেঞ্জ করা। তা না করে তিনি সেই রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠিয়ে—তাদের শরণাপন্ন হলেন। এতে কি খুব বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন?"

"কুল ত্যাগিনীর লজ্জা যেমন ঢাকা যায় না—পার্টির সদস্যদের এই শিশু সুলভ কাণ্ডতে আমাদের মাথা জনসাধারণের সামনে হেঁট হয়েছে। প্রতিবাদ করবার বা তাঁর এই কাজ সমর্থন করবার মত কিছু আর নেই। তাই তোমরা সবাই আজ সুযোগ পেয়ে যা শোনাবে—আমরা তা নীরবে নতমস্তকে শুনে যাব"—বলে বিষণ্ণ মুখে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

চণ্ডী প্রসঙ্গান্তরে আনবার জন্য বল্ল "আপনাকে আর এক কাপ চা দিই, হিমাংশুদা? কই সন্দেশ তো আপনি ছুলেন না?

থাক্ এসব রাজনৈতিক আলোচনা। যে উদ্দেশ্যে আপনাকে এত কাজের মধ্য হ'তে টেনে আনলাম—তা-ই তো বলা হয়নি।

এই রবিবার চন্দ্রব জন্য পাত্রী দেখতে যাব। আপনি বরকর্ত্তা হয়ে যাবেন। সু-াও সঙ্গে যাবে। আমাদের তো আপনি ছাড়া এখন আর কোন অভিভাবক নেই। তাঐমশায় বৃদ্ধ হয়েছেন। তাছাড়া শোকে তাপে জর্জ্জরিত। তাঁকে আব এসব ব্যাপারে টানাটানি করতে চাই না। আশীর্বাদেব দিন তাঁকে নিয়ে যাব।"

"আমায় কেন? তোমাব দাদাটি তো বর্ত্তমান, অন্যান্য দিদিদেব ভগ্নীপতিরাও তো রয়েছেন। তবে কেন এই বেচাবীকে সব অপবাদের বোঝা বইবার জন্য ডাকো? একেই বড়দা আমাব নামে অপবাদ দিচ্ছেন,—আমার কুপবামর্শে বৌদি নাকি তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ কবে—তাঁর সমধর্মী হয়ে "সিয়া" সেবায় ব্রতী হচ্ছেন না। তোমার দাদাও ঐ পথেব পথিক হয়েছেন। এবাব উনিও তোমাকে পথভ্রষ্ট করবার অপবাদ দেবেন।"

চণ্ডী উষ্মা প্রকাশ কবে উত্তব দিল "কেন সব জেনে শুনেও বাব বার একই প্রশ্ন কবেন? আমাদের এই উপকার টুকু করতে যদি আপনার আপত্তি থাকে—বলে দিন্। আমি একাই যাবো। আজে বাজে লোকের সাহায্য নেবাব জন্য বলে আমায় আঘাত করবেন না। দাদার সেদিন দিদিব সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরও কি মনে করেন—তাঁব স্বরূপ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়নি? সি, আই, এর, চব আদর্শচ্যুত লোককে আমি ঘৃণা করি—তা তো আপনি জানেন।"

"যাক্, কথায় কথায় যে খবরটা তোমায় দেব বলে এসেছিলাম—তা আর বলা হয়নি। তাড়াতাড়ি কথাটা বলে আমাকে এবার উঠতে হবে। আমার আবাব পার্টির মিটিং আছে।

তোমাব বান্ধবী সুভার অভয়ের সম্বন্ধে কিন্তু আর অভয়বানী শোনাতে পারবো না। খবর পেলাম শ্রীমানও তোমার দাদা ও আমাব বড়দার সঙ্গে সিয়ার পূণ্যতীর্থে ডুব দিয়েছে। এই "থ্রি মাস্‌কেটিয়াস্" যে দেশটাকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যাবেন বা যাচ্ছেন

—তা জানি না। তদুপরি শুনছি অভয়ের এই দেশদ্রোহীতার বিরুদ্ধে তার সহকর্মীরা ক্ষুব্ধ। এবং কর্মস্থলে তার কি সব গোলমাল সুরু হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মস্ত প্রতারণার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

শোনা যাচ্ছে অভয় গ্র্যাজুয়েট নয়। অন্য একজনের সার্টিফিকেট দেখিয়ে সে এম, এ পাশ প্রমাণ করে এতকাল চাকরীই শুধু করেনি—বি, টিও পাশ করে নিয়েছে এবং অন্যের ডিগ্রী ভাঙ্গিয়ে সে একটা "মালটিপারপাস্ স্কুলের" প্রধান শিক্ষক হয়েছিল। কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে তার বৃদ্ধ সরল বাবা। কারণ যার ডিগ্রী দেখিয়ে সে চাকরী করছে—তার বাবার নামের সঙ্গে অভয়ের বাবার নামের মিল নেই। কোন সূত্রে খববটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভয় তার বাবাকে হঠাৎ কোথায় পাঠিয়ে দেয় এবং কয়দিন পর তার মৃতদেহ এনে খুব শোক দেখিয়ে তাঁর শবদাহ করেছে। জনশ্রুতি যে অভয়ের ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান করতে "সেকেণ্ডারী বোর্ড" লোক পাঠাচ্ছে। আবার যদি অভয়ের বাবা তার এত সাধের ইমারত ভেঙ্গে দেয় তবে না জানি তার কি অবস্থা হবে। তাই সেই পাপকে বিদায় করেছে গুণ্ডা দিয়ে বাপকে হত্যা করিয়ে। বান্ধবীকে তোমার সাবধান করে দিও—এমন কসাই এর ঘরনী হবার সাধ সম্বরণ করতে। তবে অনেক পাপে তাকেও হয়ত ঘটনা বিপর্য্যয়ে লিপ্ত হয়ে পড়তে হবে। যতটুকু আমি জানি সুভা সেই প্রকৃতির মেয়ে নয়। আমি বুঝতে পারছি না—সে কি করে অভয়ের খপ্পরে পড়ল।"

"হিমাংশুদা, মানুষের প্রকৃতি আজকাল এত তাড়াতাড়ি বদ্‌লে যাচ্ছে যে অতি পরিচিত লোকও সময় সময় আনকোরা শাড়ীর মত সম্পূর্ণ নূতন অপরিচিত মনে হয়। এই যেমন মৃণ্ময়দার আজকের প্রকৃতি আর সেই স্বদেশী যুগের মৃণ্ময়দার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাবেন কি? আজকের মৃণ্ময়দাকে দিদি ঘৃণা করে। সেইদিনের মৃণ্ময়দার জন্য দিদি প্রাণ দিতেও পারতো। শুধু দিদি কেন। আমরা

আপনারা সবাই কি সেদিনের মৃণ্ময়দাকে শ্রদ্ধা করিনি—ভালবাসিনি? কিন্তু আজ? তাই তো বলছি বাত্যা বিতাড়িত পত্র গুচ্ছের মতই এরা আজ কোথায় ভেসে চলেছে? আমরা যেন এদের সঙ্গে কদম বাড়িয়ে চল্‌তে পারছি না। তেমনি আজকের অভয়ের সঙ্গে সুভা যে অভয়কে ভালবেসেছিল তার কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

অভয় যে অন্যের ডিগ্রী ভাঙ্গিয়ে মাষ্টারী করছে তা আমি জানি। সুহাসদার ডিগ্রীগুলিই সে নানা কৌশলে সরলা সুভার থেকে হাত করেছে। আপনি হয়ত জানেন না অভয়ের স্কুল কলেজের নামও সুহাস। দুই জনেরই একই নাম ও একই পদবা হওয়ার জন্যই উভয়ের মধ্যে জন্মেছিল গভীর প্রীতির সম্বন্ধ। কিন্তু স্বভাব ও প্রকৃতিতে উভয়েই ছিল ভিন্নমুখী। সুহাসদা ছিলেন ফার্ষ্ট বয়। অভয়কে প্রায় লাষ্ট বয় বলা চলতো। তবে সুহাসদার সাহচর্য্যে কিছুটা উন্নতি তখন তার যদিও হচ্ছিল,—কিন্তু শেষ অবধি ডিগ্রী নেওয়া আর তার হয়ে উঠেনি। যদিও সুহাসদা অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়ে, এম-এও পাশ করেছিলেন।

তবে অভয়ের যে এখানে এসে এত অগ্রগতি হয়েছে যে নিজের বাবাকে পর্য্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধা করল না—এটা জানা ছিল না। মানুষ যে কত নীচে নেবে যেতে পারে তারই উদাহরণ মৃণ্ময়দা, অভয়বাবু। আমার দাদা অবশ্য বরাবরই সুবিধাবাদী এবং অর্থ লিপ্সু। সুতরাং তাঁর ব্যবহারে আমি অবাক্ হইনি। আমি যেমন আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হয়েছি মৃণ্ময়দার পতনে, তেমনি হতবাক্ হচ্ছি আজ অভয়বাবুর ব্যাপারে। পাপের শাস্তি তাকে পেতেই হবে।”

“হয়ত যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকলে অভয়কে তার প্রাপ্য শাস্তি দেওয়া যেতো। কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে আমাদের সরকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান আমরা। আর অভয়কে আমার বড়দা অভয়-

বাণী শুনিয়ে তাঁর পক্ষছায়ায় সব বিপদ হ'তে আড়ালে রাখবেন। তিনি যে এখন কংগ্রেসের সদস্য। তত্নপরি 'সিয়ার' পৃষ্ঠ পোষক। বান্ধবীকে তোমার সাবধান করে দিও। এমন লোকের সঙ্গে যেন গাঁটছড়া না বাঁধে। হয়ত বা কোন দিন তার নিজের স্বার্থে সুভাকেই হত্যা করবে।

যাক্, আজ আমি উঠি,—আর দেরী করবার সময় নেই। রবিবারের কথা তুমি আমাকে ফোন করে মনে করিয়ে দিও। পাবতো বৌদিকেও সঙ্গে নিও। বেচারী বড়ই অসামাজিক হয়ে পড়েছে।"

"এজন্য আর দিদিকে দোষারোপ করছেন কেন? নিজের বড়দার ব্যবহারের কথা মনে করে দেখুন—কেন আমার সদা হাস্যময়ী মিশুকে দিদির হঠাৎ এমন পরিবর্ত্তন ঘটল?"

২৫

মৃণ্ময় তার বাড়ীর হলঘরে বসে আছে। চেইনের মত একটি সিগারেটের আগুনে আর একটি সিগারেট জ্বালাচ্ছে আনমনে।

অম্বিকাবাবুকে দিয়েও চন্দ্রিকাকে বশ করা গেল না। টাকার বশ নাকি ছুনিয়ায় সবাই। কিন্তু চন্দ্রিকার মত একটি সামান্য মেয়ে সেই টাকার প্রলোভন কি করে এত সহজে জয় করতে পারল? একদিকে স্বামীকে ফিরিয়ে পেয়ে সে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত, অন্যদিকে মৃণ্ময়ের সহকর্মী হয়ে টাকার গদীতে গড়াতে পারতো। কিন্তু সে সব উচ্চাশাকেই পদদলিত করে কিসের জোরে সে এমন ভাবে চলে যেতে পারল? সে কি তার সম্ভ্রমবোধ! তার আত্মসম্মান! কি সে? চন্দ্রিকা যতই মৃণ্ময়ের নাগালের বাইরে. চলে যাচ্ছে—ততই চন্দ্রিকাকে জয় করবার ইচ্ছা দুর্বার হয়ে মৃণ্ময়কে পাগল করে তুলছে। যে চন্দ্রিকাকে সামান্য সাধারণ জ্ঞানে সে বড়মাসীর পরামর্শে ত্যাগ করে এসেছিল,—আজ দূর হতে তার যে রূপ, চরিত্র, স্বভাব সে দেখছে—তা মৃণ্ময়কে চন্দ্রিকাকে জয় করবার জন্য,—কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল করে তুলছে। যে চন্দ্রিকার মূল্য কাছে পেয়েও মৃণ্ময় এতকাল বোঝেনি,—আজ দূর হতে তার সেই দীপ্ত, কঠোর, তেজস্বিনী অথচ কোমল প্রকৃতি যেন "ম্যাগ্‌নেটের" মত তাকে চন্দ্রিকার দিকে টেনে নিচ্ছে। কিন্তু চন্দ্রিকার তো তার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ আছে বলে মনে হয় না। পরন্তু অম্বিকাবাবুর কথা হতে মনে হল—সে এখন তাকে ঘৃণা করে।

চন্দ্রিকার এই মিথ্যে অহমিকা ভাঙ্গতেই হবে। প্রথমে মৃণ্ময় স্বামীত্বের অধিকারে তাকে তার কাছে ফিরে আস্‌তে অনুরোধ করে কয়েকখানা চিঠি দেয়। একটিরও উত্তর চন্দ্রিকা দেয়নি। হিমাংশুকে

ডাকিয়ে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় সে জানিয়েছিল—"বৌদি বলেছেন, 'তোমার বড়দার সঙ্গে আমার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেছে যেদিন তিনি চম্পাকে বিয়ে করেছেন। আজ চম্পা তাঁকে পরিত্যাগ করে গেছেন বলে চন্দ্রিকা পুনরায় সেই স্থান পূর্ণ করতে এ জীবনে যাবে না। প্রয়োজন হয় তিনি আরও একাধিবার তাঁর মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু চন্দ্রিকার শ্রদ্ধা, ভালবাসা তিনি হারিয়েছেন। যার প্রতি ঘৃণা জন্মায়—তাঁকে নিয়ে ঘর বাঁধা যায় না। তাছাড়া এই পড়ন্ত জীবনে আমার আর সেই ইচ্ছেও নেই। যে কয় বছর মা বাবা আছেন—তাঁদের সেবা করবো। তারপর আমার পথ ঠিক করা আছে।"

তারপর গুণ্ডা লাগিয়ে চন্দ্রিকাকে পথে ঘাটে শাসানো হয়েছে। ফল কিছু হয়নি। সে তেমনি অনমনীয় রয়েছে। এখন আর তাকে একা পথে ঘাটে দেখা যায় না। হয় কয়েকজন সহকর্মী বা বান্ধবীসহ, অথবা বাড়ীর গাড়ীতে সে চলাফেরা করে। মৃণ্ময় জানে—চন্দ্রিকার সব চেয়ে বড় রক্ষা কবচ মা ও বাবা, এবং চন্দ্রিকার আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁরা সর্বতোভাবে তাকে সহায়তা করবেন।

এরপর অম্বিকাবাবুকে দিয়ে টোপ্ ফেলা হল। সেই টোপেও চন্দ্রিকা ধরা দিল না। দাম্পত্য অধিকারে চন্দ্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলে শাসানো হোল। তবু চন্দ্রিকা অটল। চন্দ্রিকার বিরুদ্ধে নানা রকম অশ্লীল চারিত্রিক দোষ দেখিয়ে মা বাবার মন বিষিয়ে দেবার জন্য কত উড়ো চিঠি সে তাঁদের নামে দিয়েছে। এমন কি হিমাংশুকে নিয়ে অহেতুক চন্দ্রিকার চারিত্রিক দোষারোপ করেছে। আশ্চর্য্য মা, বাবা বা চন্দ্রিকা—সবাই তার এত প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। কিন্তু মৃণ্ময় কাপুরুষের মত বার বার নারীর কাছে পরাজিত হবার গ্লানি আর সহ্য করবে না। চন্দ্রিকাকে যেমন করেই হোক্ তার চাই-ই। এজন্য যত টাকার প্রয়োজন—সে তা খরচ করতে প্রস্তুত।

মৃণ্ময় জানে তার চন্দ্রিকার প্রতি এই মানসিক দুর্বলতার কথা উপলব্ধি করেই জোঁকের মত অম্বিকাবাবু নানা মিথ্যে আশ্বাসে প্রায়ই এসে তার থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। মৃণ্ময় খোঁজ নিয়ে জেনেছে—অম্বিকাবাবু তাকে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে। তবু চন্দ্রিকাকে ফিরে পাওয়া যেন তার কাছে একটা নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অম্বিকার সঙ্গে এ ব্যাপারে আব এক সাক্‌রেদ জুটেছে অভয়। অভয়ও মৃণ্ময়কে শুষে নিচ্ছে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে নিচ্ছে—এই মিথ্যে অজুহাতে যে চণ্ডী তাকে খুবই মান্য করে। সুতরাং চণ্ডীর মাধ্যমে সে চন্দ্রিকাকে একদিন হঠাৎ এনে হাজির করবে। কিন্তু এ যে কত বড় মিথ্যে তা যেন বুঝেও মৃণ্ময়ের মন বিশ্বাস করে না। মানুষ যখন কোন কিছুকে নাগালেব মধ্যে পাবার জন্য মবিয়া হয়ে উঠে,—তখন অবাস্তবকে বাস্তব, অসম্ভবকে সম্ভাব্য বলে মনে হয়। মৃণ্ময়কেও যেন তেমনি মরীচিকায় পেয়ে বসেছে। তাই অম্বিকাবাবু বা অভয়েব অভয়বাণীতে সে এতটা আস্থা বাখছে।

চম্পাকে বিয়ে করে মৃণ্ময় নিজেকে ধন্য মনে কবেছিল। কিন্তু দেখা গেল সেই চম্পাও তাকে ছিন্ন বস্ত্রের মত অনায়াসে ত্যাগ করে মার্কিনীর সঙ্গে ঘর বাধতে গেল। তারপর আবার চন্দ্রিকাকে স্বামীত্বের অধিকারে ফিরিয়ে পেতে গিয়ে পদে পদে কেবল নিজের পরাজয়ের গ্লানি মৃন্ময়কে যেন পাগল কবে তুলছে। তাই চন্দ্রিকাকে তার চাই-ই। এজন্য যত নীচে নাব্‌তে হয়—সে তাতে পশ্চাদ পদ হবে না। এই তার স্থির সঙ্কল্প। একদিকে চম্পাব আঘাত। অন্যদিকে চন্দ্রিকার প্রত্যাখান। দুইটিই যেন তাকে জর্জ্জরিত করে তুলেছে। যার পরিণামে সে নিজের লাঞ্ছিত, অপমানিত জীবনকে ভুলে থাকবার জন্য সুরার নেশায় বিভোর হয়ে রয়েছে। কেবলমাত্র সিগারেট বা সিগারের নেশায় দুই নারীর কাছে পরাজয়ের গ্লানি সে ভুলতে পারছে না। তাই সঙ্গে ধরেছে রাজৈসিক নেশাকে যা সাময়িক কালের জন্য ভুলিয়ে দেয় তাকে সংসারের সব গ্লানি,

বেদনা, অপমান। সব আছে তার। কিন্তু কিছুই নেই। মা, বাবা, ভাইরা, স্ত্রী, সন্তান--কিছুরই তার অভাব নেই। কিন্তু অন্যের পরামর্শে ও নিজের দোষে সব সুখ হতে সে বঞ্চিত হয়ে—সমাজে কারো উপহাসের পাত্র, কারো বা করুণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২৬

'বাংলা কংগ্রেস' অফিসে হিমাংশু বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে বসে নানা বিষয় নিয়ে বিশেষ করে খাদ্যমন্ত্রী দলত্যাগী কয়েকজন এম, এল, এ সহ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ত্যাগ করে পি, ডি, এফ পার্টি গঠন করার ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত।

২৯শে নভেম্বর রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করে দলত্যাগী প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও তাঁর অন্য ১৭জন সমর্থক দলত্যাগী এম, এল, এর সাহায্যে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়ে শপথ গ্রহণ করালেন। নূতন মন্ত্রীসভা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা মহানগরী সেনাবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হোল। শহরে ১৪৪ ধারা জারী হোল। ২২শে নভেম্বর বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলী প্রভৃতি স্থানেও ১৪৪ ধারা জারী করা হোল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আহ্বানে ব্রিগ্রেড প্যারেডে নূতন বে-আইনী মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু হাজার হাজার জনতার উপর পুলিশী জুলুম চলে। এমন কি এই সভায় যোগ দিতে প্রাক্তন আইন মন্ত্রী ও সেচ মন্ত্রী আসছিলেন —তাঁরাও পুলিশের হাতে নিগৃহীত ও গুরুতর রূপে আহত হন্ ও গ্রেপ্তার হন্। হাওড়াতেও চলে পুলিশের অত্যাচার। ২৩শে নভেম্বর কলকাতা তথা সমস্ত বাংলা দেশে হরতাল হয়। ২৪শে নভেম্বর শান্ত ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশের হাঙ্গামা চলে। ২৭শে নভেম্বর বর্দ্ধমানে পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করে। নূতন মন্ত্রী সভা এক বিভীষিকা রূপ নিয়ে রাজ্যে হাজির হোল। পুলিশী জুলুমে মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হলো। বহু নিরাপরাধ নাগরিক পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারালো।

২৯শে নভেম্বর বিধান সভায় পি, ডি, এফ সদস্যরা শক্তি পরীক্ষা

দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ট্রেজারী বেঞ্চে বসলেন। কংগ্রেসের সমর্থনে পি, ডি, এফ সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রতিপন্ন করাই ছিল নূতন মন্ত্রীসভার উদেশ্য। কলকাতা মহানগরীতে সেদিন যাতে বিরুদ্ধদলগুলি হতে কোন রকম বিক্ষোভ প্রদর্শন করা না হয়—এজন্য বিধানসভার এক মাইল এলাকা জুড়ে চতুর্দিকে মিলিটারী ব্যূহ রচনা করা হোল। পুলিশরা "যুদ্ধং দেহি" ভাব নিয়ে অস্ত্রশূন্য নাগরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ঢাল তুলে তৈরী হয়ে ছিল। কিন্তু কংগ্রেস পার্টি, পি, ডি, এফ পার্টি বা রণ সাজে সজ্জিত পুলিশ—যাবা বিরোধী পার্টিগুলির ঘোষিত রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবাব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল, সবাইকে হতাশ কবে দিয়ে স্পীকার ঘোষণা করলেন পি, ডি, এফ মন্ত্রীসভা বৈধ নয়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভাকে বাতিল ও খাদ্যমন্ত্রীকে মূখ্যমন্ত্রী নিয়োগ এবং নব নিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে বিধান সভা ডাকা সংবিধানী বিরোধী ও অকার্যকর।

স্পীকার তাঁর রুলিং এর প্রামাণ্য দেখাতে যেয়ে ১৯৪৫ সালের অবিভক্ত বাংলার আইন সভার স্পীকার সৈয়দ নৌসের আলি—নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভা সম্পর্কে একগুরুত্বপূর্ণ রুলিং এর উদ্ধৃতি দিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ আইন সভাই হচ্ছে মন্ত্রীমণ্ডলী রাখা বা না রাখার একমাত্র অধিকাবী এবং রাজ্যপাল এই পরিষদের কেবল রেজিষ্টারীং অথোরিটি মাত্র। বৃটিশ আমলের চেয়ে স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম ভারতের আইন সভাগুলির অধিকারের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। স্পীকাবেব মতে সংবিধানের ১৬৪ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যপাল মন্ত্রীসভা বাতিলের যে অধিকার দাবী করেছেন, রাজ্যপালের সেই অধিকার নেই। এবং মন্ত্রীসভা খারিজ করার আইনগত কোন ভিত্তিও নেই।

এই অধিবেশনে চলতি সাংবিধানিক অচলাবস্থার অবসান ও পি. ডি. এফ মন্ত্রী সভার গরিষ্ঠতা পরীক্ষার সম্ভাবনা আশা করা হয়েছিল। এই বিধানসভায় যোগ দিতে গিয়ে রাজ্যপাল সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ

না করে পিছন দরজা দিয়ে বিধান সভায় প্রবেশ করতে গিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হন।

কিন্তু এই অধিবেশনকেও স্পীকার পূর্ব রুলিং অনুসারে পুনরায় মুলতবী ঘোষণা করায় সমস্ত অবস্থাটিই সেই পূর্বের জায়গায় স্থির হয়ে রইল। কোন রকম পরিবর্তন সম্ভব হোল না। পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান হোল না।

স্পীকারের ২৯ শে নভেম্বরের রুলিং-এর পরেই স্পীকারের এই রুলিং নিয়ে এবং বিধানসভার সঙ্কট নিয়ে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করতে লাগলেন।

রাজ্যগাল কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী সভা বাতিলের সরকারী আয়োজন যখন পাকা হচ্ছিল, তখন নয়াদিল্লীতে সংবিধান ও রাজ্যপালের এই ক্ষমতা সম্পর্কে ভাবত বিখ্যাত আইন বিশাবদগণের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এবং এই সভাতে যোগ দিয়েছিলেন আসাম ও রাজস্থান হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচার-পতি. এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন জজ, এলাহাবাদ হাইকার্টের প্রাক্তন বিচারপতি ও কংগ্রেসী সংসদ সদস্য, এলাহাবাদের প্রাক্তন জজ, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, মহারাষ্ট্র হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রভৃতি বিখ্যাত আইন-জীবীদের এই আলোচনা সভায় এই মর্মে "সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত" গ্রহণ করা হয়েছিল যে বিধান সভায় শক্তি পরীক্ষা ব্যতীত কোন মন্ত্রী সভাকে বরখাস্ত করার অধিকার রাজ্যপালের নেই।

২৩ শে ডিসেম্বর পালার্মেণ্টের সদস্য কমিউনিষ্ট নেতা বলেছিলেন পি. ডি. এফ মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করে অন্তবর্ত্তীকালীন নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে যুক্তফ্রণ্টের সত্যাগ্রহ তুলে নেওয়া হবে এবং চলতি হাঙ্গামার অবসান ঘটবে।

তদুত্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছিলেন আন্দোলন তুলে নিয়ে বিধান

সভাকে কাজ করতে দেওয়া উচিত। বিধান সভা না চাইলে পি. ডি. এফ মন্ত্রী সভা চলে যাবে।

৩০শে নভেম্বর নয়াদিল্লীতে সংসদের উভয় সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন—পি. ডি. এফ সভার নিয়োগ ও অবস্থিতি সংবিধান সম্মত ও বৈধ বলে কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন। এই ঘোষণায় কংগ্রেসীরা হর্ষধ্বনি ও বিরোধীরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

১লা ডিসেম্বর লোকসভার অধিবেশনে প্রাক্তন আইন মন্ত্রী পশ্চিম বঙ্গের প্রসঙ্গে নাইজেরিয়ার একটা নজির উদ্ধৃত করেন যে সেখানে মন্ত্রীসভা লঘিষ্ঠ দলে পরিণত হয়েছে বলে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর রাজ্যপাল মন্ত্রীসভাকে ভেঙ্গে দেন্। তিনি রাজ্যপালের কাজ ন্যায্য এবং স্পীকারের রুলিং বিচিত্র নজীর বলে উল্লেখ করেন। যদিও এই বক্তব্য বিতর্কমূলক ছিল।

পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পত্রোত্তরে প্রধান মন্ত্রী লেখেন যুক্তফ্রন্ট বাতিল করে রাজ্যপাল ঠিকই করেছেন। পি. ডি. এফ মন্ত্রী সভা প্রতিষ্ঠা বৈধ ও সংবিধান সম্মত। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের বক্তব্য স্পষ্ট।

প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন মন্ত্রীসভা বাতিল করার ব্যাপারে এভাবে স্বেচ্ছাচারের কাজ করার ক্ষমতা সংবিধান রাজ্যপালকে দেয়নি। এটা পক্ষপাত মূলক আচরণ স্পীকার তাঁর রুলিং দিয়ে যথাযথভাবে বিধান সভার মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন।

প্রাক্তন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বলেন স্পীকারের রুলিং চমৎকার এক সাংবিধানিক সঙ্কট তুলে ধরেছে। একমাত্র সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ কার্য্যকর করা ছাড়া এই সংকট মুক্তির অন্য কোন পথ নেই।

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী নেতা পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষণার এবং জনমত জানার জন্য অন্তবর্ত্তীকালীন নির্বাচনের অনুরোধ জানিয়ে প্রধান মন্ত্রীকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

২রা ডিসেম্বর লোকসভায় কয়েকজন প্রবীণ কংগ্রেসী সদস্য সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ মতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সাসপেণ্ড করে ঐ সভার সব ক্ষমতা সংসদকে অর্পণ করা বা সংসদের নিয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন প্রাক্তন আইন রাষ্ট্রমন্ত্রী।

দ্বিতীয়বার স্পীকারের রুলিং এর পরও কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যা লঘিষ্ঠ পি ডি. এফ মন্ত্রীসভা দিয়েই কংগ্রেসের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের শাসন কাজ চালু রাখতে বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু পি. ডি এফ মন্ত্রীসভার ভাগ্যে ফাট্‌ল ধরলো। তাই এত প্রয়াস ব্যর্থ করে যুক্তফ্রণ্টের দলছুট একটি দল—যাদের শক্তিতে পি ডি. এফ মন্ত্রী সভা গঠিত হয়েছিল এবং কংগ্রেসের কিছু সংখ্যক বিধান সভার সদস্য একটি দল তৈরী করে পি. ডি. এফ মন্ত্রী সভার সমর্থন প্রত্যাহার করে,—তারা একটি নূতন দল গঠন করে। সেই দলের নামোকরণ হয় "ভারতীয় জাতীয় গণতান্ত্রিক দল।"

"ভারতীয় জাতীয় গণতান্ত্রিক দল" পি. ডি, এফ "সরকারকে সমর্থন প্রত্যাহার করে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সমর্থনে সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মতি জানিয়ে একটা দরখাস্ত রাজ্যপালের হাতে দিয়েছিল। এই নূতন দলের নেতা হয়েছিলেন প্রাক্তন একজন স্পীকার ও প্রাক্তন মন্ত্রী। কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্যপাল এই এন, ডি, এফ দলকে যুক্তফ্রণ্টের সমর্থনে সরকার গঠনের কোন সুযোগ দিল না। গত্যন্তর না থাকায় পি. ডি. এফ. মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে "প্রেসিডেণ্ট রুল" প্রবর্ত্তন করা হোল।

প্রেসিডেণ্ট রুল প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট পার্টি তাদের সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে নেয়। পি. ডি. এফ সরকারের পুলিশী জুলুমের অবসান হোল। মানুষের মন হতে সন্ত্রাসের ভাব মুছে গেল। পি. ডি. এফ সরকারের স্বল্পায়ু শাসনকালে প্রশংসনীয় কোন কাজের উল্লেখ করা যায় না। পরন্তু পি. ডি. এফ দল বা যে সব

নেতা এই দলের জন্মকালে ধাত্রীর কাজ করেছিল, তারা দেশের রাজনীতিতে এক দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ বসিয়ে দিল। এই রাজ্যে ঐ সময়ের সমাজচিত্র সমস্ত সৎ ও সাধু চরিত্রের লোকের মনে একটা প্রচণ্ড ঘৃণা ও অবজ্ঞার সৃষ্টি করে ছিল এবং আপামর জনসাধারণের সকল আশা ভরসা ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল।

২৭

চণ্ডী সুতারার অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে এসেছে। সুতারার সঙ্গে কেবল মাত্র দিদির সম্পর্কেই তার সম্পর্ক নয়। মার বান্ধবী, সেই সূত্রে তাঁর অপার স্নেহ চণ্ডীরা পেয়েছে। বিশেষ করে মাতৃহীনা হবার পর হ'তে। তাই তাঁর বিপদে আপদে চণ্ডীর অন্তর সব সময় সাড়া দিয়েছে।

মৃণ্ময় যেমন এক রকম জোর করেই শিশু মৃণালকে সুতাবার ঘাড়ে চাপিয়ে নূতন করে তাঁকে মায়ার বাঁধনে বেঁধেছিল, তেমনি হঠাৎ একদিন জোর করেই মৃণালকে মার বুক হতে ছিনিয়ে নিয়ে,— চন্দ্রিকার জন্য মাকে আঘাত দিয়ে তার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি মিটালো। বৃদ্ধাবস্থায় এ আঘাত নূতন করে সুতারার হৃদয়ে ঘা দিল। এই বয়সে তিনি এই আঘাতটা ঠিক সহ্য করতে পারেননি বলে তাঁকে শয্যা নিতে হয়েছে।

সমরবাবু অবশ্য বার বার সুতারাকে বলেছিলেন "পরের ছেলে নিয়ে এত মায়ায় জড়িও না। একদিন হয়ত এজন্য তোমাকে ভুগতে হবে—দুঃখ পেতে হবে।"

সুতারা বলেছিল "আমার নাতি—একে তুমি পর বলছ কেন? এ যে তোমার বংশধর। তোমারই রক্তকণা এর প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে—মৃণাল যদি পর হয়—তবে আমার আপন আর কে?"

"ওখানেই তো তুমি ভুল করছ সুতারা। পর তোমার আপন হয়েছে। হিমাংশু তোমার আপন হয়েছে। কিন্তু তোমার আত্মজ মৃণ্ময়, তন্ময় যে তোমার পর হয়ে গেছে। মৃণ্ময়ের উপর তোমার কি অধিকার আছে? তোমাকে সমাজে, আত্মীয়কুলে সে নানা ভাবেই বার বার অপদস্থ করবার চেষ্টা করেছে। যে পুত্রবধূ তুমি বরণ

করে এনেছিলে, অবজ্ঞাভরে তাকে ত্যাগ করে সে অত্যাধুনিকের পিছনে ছুটে ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে 'রেসে' তার হার হয়েছে। মৃণ্ময় এখন তার শোধ তুলতে চায়—চন্দ্রিকাকে সেই পর্য্যায় নাবিয়ে নিয়ে, তাকে অপদস্থ করে। আবার কবে সে তার ছেলেকে ছিনিয়ে নবে তার বিশ্বাস কি?"

"কিন্তু আর একটি বিয়ে না করা পর্যন্ত এই ছেলেকে ফিরিয়ে ারনেব মৃণ্ময়ের কি সার্থকতা? পবন্তু মৃণালকে সে এখন নিয়ে গেলে তারই তো নানা রকম অসুবিধে।"

"তুমি তো জান নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা অনেকের স্বভাব, মৃণ্ময়ও তোমার সেই চরিত্রের ছেলে। তাই তাব যত অসুবিধা হোক্—তবু তোমাকে দুঃখ দেবার জন্যই সে হয়ত একদিন শিশুটিকে কেড়ে নেবে। এর উপর তো তোমার কোন অধিকার নেই।"

"স্নেহের দাবীতেও কি আমি একে বেঁধে রাখতে পারবো না?"

"না। আইনের চোখে তার মূল্য দ্বিতীয় পর্য্যায় পড়ে। কোন প্রকারেই তুমি মৃণালেব উপব দাবী করতে পার না বা তোমাব কোন দাবী টিকবে না.—যদি স্বেচ্ছায় মৃণ্ময় তার স্বত্ব ছেড়ে না দেয়।"

সমরবাবুর হুসিয়ারী সুতারা গ্রাহ্য করেননি। শেষ বয়সের সব স্নেহ এই মাতৃহীন শিশুর জন্য উজার করে দিয়েছিলেন। চন্দ্রিকা কাজের অছিলায় নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। শিশুর সব দায় দায়িত্ব এই কারণে সুতারার উপর এসে পড়েছিল।

চন্দ্রিকার উপর প্রতিশোধ নিতে যেয়ে মৃণ্ময় চন্দ্রিকার আশ্রয় দাতা সমরবাবু ও সুতারাকেই আঘাত করলো। মৃণালকে মার বুক হতে ছিনিয়ে এনে সে তাকে এক স্কুল বোডিং এ পাঠিয়ে দিল। স্নেহরিক্ত জীবনের পরিণাম চিন্তা না করেই মৃণ্ময় এই গর্হিত কাজ করলো। যে শিশু জ্ঞান হওয়ার পর হতে স্নেহের সাগরে ডুবে ছিল,

তাকে সেখান থেকে ছিনিয়ে এনে কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখায় মৃণালের মনের পরতে পরতে যেন চির ধরতে লাগলো।

মৃণাল কাঁদে দিদাব জন্য। গোপনে চিঠি লেখে দিদাকে। কিন্তু তার বাপের কড়া হুকুমে কর্ত্তৃপক্ষের নিষেধে অবশেষে তার যেটুকু যোগসূত্র দাছুব বাড়ীব সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে ছিল—তাও আর রইল না। উতলা ঠাকুরমাব হৃদয়। তিনি হিমাংশুকে পাঠালেন গোপনে মৃণালের সঙ্গে দেখা করতে। অনুমতি পাওয়া গেল না দেখা করবার।

সেই হতে অশ্রুধারা সম্বল করে সুতাবা বিছানা নিয়েছেন। সুতারার জীবন আশঙ্কায় হিমাংশু সব অপমান গায়ে মেখে গিয়েছিল মৃণ্ময়কে বুঝিয়ে যে ক'টা দিন সুতাবা বেঁচে আছেন—সে ক'টা দিনের জন্য হলেও মৃণালকে ফিরিয়ে পেতে।

হিমাংশুকে কেবল হতাশ হয়েই ফিরে আসতে হয়নি। অনেক অপমানও সইতে হয়েছে। চন্দ্রিকার বিনিময়ে মৃণালকে দিতে মৃণ্ময় সম্মত।

"কিন্তু তুমি তো বৌদির যোগ্য সম্মান দিতে পারবে না। তুমি তো তোমার ব্যবসার খাতিরে বৌদিকে পেতে চাইছ।"

"নিশ্চয়। তা নয়ত চন্দ্রিকার আর কি গুণ বা রূপ আছে যাতে আকৃষ্ট হয়ে—তাকে ডাকবো। স্ত্রী হিসাবে বহু সুন্দরী মেয়ে আমি এখনই পেতে পাবি।"

"তা তুমি পেতে পার। কারণ ব্যাঙ্কের খাতা তোমার পূর্ণ হতে চলেছে। সুতরাং দরিদ্র সুন্দরী পাত্রাব অভাব নেই। কিন্তু এটাও জেনে রেখো—কাকাবাবু, খুড়ীমার জীবিতাবস্থায় তাঁদের কুলবধূকে দিয়ে তোমার এ হীন মনস্কামনা সিদ্ধ হবে না।

তোমার ছেলের মঙ্গলের জন্যই তাকে ফিরিয়ে নিতে এসে ছিলাম। কেবলমাত্র খুড়ীমার জন্য নয়। বাংলা দেশে যেমন দরিদ্র সুন্দরী পাত্রীর অভাব নেই, তেমনি সৎ বংশ জাত দরিদ্র সুন্দর বুদ্ধিমান ছেলেকে পোষ্য দেবার পিতারও অভাব নেই।

বিশেষ করে তারা যখন জানবে যে তার ছেলে রাজপুত্রের আদরে প্রতিপালিত হবে এবং বিরাট সম্পত্তির মালিক হবে।

তুমি ভুল করলে বড়দা। মৃণালের মাধ্যমে তুমি অনেক কিছু আবার ফিরিয়ে পেতে পারতে। যাক্, তোমাকে একটা চান্স দিচ্ছি। তুমি আবার ভাল করে চিন্তা করে দেখো।"

"টাকার লোভ আমাকে দেখাস্ নে। আজ আর আমার টাকার বা সম্পত্তির অভাব নেই। সুতরাং সম্পত্তির জন্য আমার ছেলেকে পর করে দিতে পারবো না।"

"ঠিক বলেছো। সি, আই, এ-র কৃপায় তোমার টাকার অভাব নেই জানি। তবে নিজের দাদু দিদার কাছে মানুষ হলে তোমার ছেলে মানুষ হতে পারত। পরন্তু আদর্শ স্থানীয় হয়ে উঠত হয়ত। অবশ্য তেমন জোর করে আমি বলতে পারি না। কারণ তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে উশৃঙ্খল বিলাসী চম্পা বৌদির রক্তকণা ও তোমার রক্ত। ছেলেকে ভাসিয়ে দেবে মনস্থ করেছো—এটাই বুঝে যাচ্ছি। ভগবান তোমার সুমতি দিন্—এই প্রার্থনা করে উঠ্ছি।"

চন্দ্রিকা সুতারার জীবন বিনিময়ে হিমাংশুর মুখে মৃণ্ময়ের প্রস্তাব শুনে মৃণ্ময়ের প্রস্তাবে রাজী হতে চেয়েছিল। কিন্তু সুতারা বলেছিল "কি? আমার কুলবধূকে অর্থের জন্যে যথেচ্ছাভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হবে—তা আমি সহ্য করবো?" সমরবাবুও ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন "আমার বংশের ছেলের টাকার প্রতি এত নীচ লালসা! আজ হতে সে আমাদের কাছে মৃত। এ বাড়ীতে কেউ কখনও ঐ নামও আর মুখে আনবে না।"

সুতারা মৃণালকে হারিয়ে ততটা দুঃখ পাননি,—যতটা দুঃখ পেয়েছেন মৃণ্ময়ের নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে এমন হীন প্রস্তাবে। তাই তিনি শয্যা নিয়েছেন। মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা—রোগীর সহযোগিতা ব্যতীত সম্ভব নয়।

চণ্ডী এসেছে সুতারাকে দেখতে। সুতারার রোগ শয্যার পাশে

বসে চন্দ্রিকা সুতারার শুশ্রূষা করছিল। চণ্ডীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই সুতারা স্নেহমিশ্রিত স্বরে বল্লেন "আয় মা এখানে। তোদের সবাইকেই আমি ব্যস্ত করে তুলেছি। তাই কলেজ হতে ছুটে এসেছিস্ এই হতভাগীকে দেখতে। "চন্দ্রিকাকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন "চন্দ্রিকা, যাও মা, চণ্ডীর জলখাবারের ব্যবস্থা কর। হিমাংশুরও আসবার সময় হয়েছে।"

"হিমাংশুদা আজকাল এত তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরেন?"

"হ্যাঁ, আমাব জন্যই সে রোজ অফিস হতে বাসায় ফেরে। আমার তত্বাবধান করে, তারপর নিজের কাজে যায়।

নিজের দুই দুইটা ছেলে কেউই একবার ফিরে তাকায় না। আর হিমাংশু আমার ভাসুরপো হয়ে সেই-ই সন্তানের কর্ত্তব্য করছে। ভগবানের কাছে এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আর জন্মে হয়ত সে আমার নিজের সন্তান ছিল।"

সুতারার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হিমাংশু সুতারার ঘবে প্রবেশ করে বল্ল "আর তোমার ঋণটি আমি কি করে শোধ করবো খুড়ীমা? আব জন্মে না,—এই জন্মেই তো তুমি আমাকে নিজের সন্তান রূপে প্রতিপালন করেছো। বড়দা আব তন্ময় হতে আমাকে ভিন্ন ভাবে কখনও তো দেখনি। পরন্তু আমার, ববি ও কবির উপর তোমার স্নেহাধিক্য বেশী ছিল। কারণ মার অভাব যেন আমরা কোন প্রকারে বুঝতে না পারি।

যাক্, পঞ্চমুখে হিমাংশুর প্রশংসা না করে– এবার বল'ত আজ তুমি কেমন আছো? এতদিন তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ ছিল না। আজ কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি আর আমাকে আগের মত স্নেহ কব না। তা নয়ত বড়দার ব্যাপার নিয়ে তুমি শয্যা নিলে। আর একবার চিন্তা করে দেখছ না তোমার অভাবে আমি আবার নূতন করে মাতৃহারা হবো। এই বুঝি তোমার আমার প্রতি যথার্থ অপত্য স্নেহ। রাতদিন বড়দার দুষ্কৃতির চিন্তা করে মানসিক কষ্ট

পেয়ে শয্যা নিয়েছো। একবারও আমার কথা তুমি চিন্তা করনি। তুমি গেলে কাকাবাবুকে ধরে রাখবার শক্তি আমার থাকবে না। তোমরা উভয়ে চলে গেলে বৌদি ভাই বোনের বাড়ীতে উঠবে। আর এই হতভাগা বাউণ্ডুলে ছেলেটার তখন কি দুর্দ্দশা হবে ভেবেছো কি? যাক্, চণ্ডী চন্দ্রর বিয়ের কতটা আয়োজন হল? ভূরি ভোজের জন্য তো এই পেটুক দিন গুণছে।"

চণ্ডী হেসে উত্তর দিল "ভোজন বিলাসী যে আপনি কত তা আমার জানা আছে। মনে হয় চন্দ্রর কপালও হয়ত শেষ পর্যন্ত আপনার মতই হবে। এত পাত্রী দেখছি কোনটাই মনমত হচ্ছে না। একটা না একটা খুঁত বের হচ্ছে।"

"কেন, এই মেয়েটির তো কোন ত্রুটি আমার চোখে পড়েনি। তা স্বর্গের অপ্সরী তোমরা এই মর্ত্ত্যধামে কোথায় পাবে? বেচারীকে আর কত দিন প্রিয়া বিহীন প্রহর গুণতে হবে। যা হয় তাড়াতাড়ি একটি সুশ্রী, বুদ্ধিমতী, সচ্চরিত্রা, শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দাও চন্দ্রর। বয়স তো কারও পিছিয়ে যায় না। তাকে ধরে রাখাও যায় না। বোনেদের হাতে ভাই এর পাত্রী নির্বাচনের দায়িত্ব থাকলে —ঘরে ঘরে চিরকুমারের ভীড়ে চলা মুস্কিল হত।"

চণ্ডী হেসে উত্তর দিল "আপনার কেবল বোনদের বিরুদ্ধে জেহাদ। আপনার কোন বোন নেই কিনা তাই। থাকলে না জানি বেচারীকে কত নাজেহাল করতেন। আপনার পাত্রী মনোনীত করতে তো কোন বোন ছিল না। তবে আপনার কেন এই দুর্দ্দশা? আমি তো জানি মাঐমা ও দিদি বহু সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী আপনার জন্য মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু আপনি তাদের অপছন্দ করলেন কেন?"

"এবার একটা কথার মত কথা বলেছো বটে। মাঝে মাঝে তোমার এত বছর গাধা পিটানো মর্‌চে ধরা বুদ্ধিতে বেশ সান্ আছে —মনে পড়ে।

বিয়ে করতে ভয় পেলাম বড়দা, কবি, তণ্ময়কে দেখে। তোমরা

মেয়েরা কিন্তু যাছু জানো। নতুবা আমরা পঞ্চ পাণ্ডবের মত একাত্মার পাঁচ ভাই—তোমাদের সঙ্গে গাঁট ছড়া বেঁধে পাঁচ দিকে এমন ভাবে ছিট্‌কে পড়লাম কি করে ?—যার ফলে একে অন্যের মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করে না। সেই ভয়েই তো মেয়েদের থেকে আমি দূরে সরে রয়েছি।"

চণ্ডী উত্তর দিল "রূপ গুণেব জন্য এই পাত্রীকে অপছন্দ কবা হয়নি। কিন্তু তাব চেয়েও একটি বড় বাধা সৃষ্টি কববে এই পবিবাব। কথায় কথায় জান্‌তে পাবলাম পাত্রীব বড় বোনের সঙ্গে অভয়ের বিয়ে হয়েছে সম্প্রতি। অভয় বেশী আড়ম্বর পছন্দ কবে না। তাই রেজিষ্টারী কবে বিয়ে হয়েছে এবং এই বিয়েতে কাউকে ডাকাও হয়নি। আমি যদি আগে এ খবর পেতাম—তবে কখনই পাত্রী দেখতে যেতাম না। এবং সুভাকেও সঙ্গে নিতাম না।

আপনি তো আমাদেব পৌছে দিয়ে—মেয়েটিকে চাক্ষুস দেখে চলে এলেন মিটিং এব দোহাই দিয়ে। তাবপব আমি নানা প্রশ্ন করতে গিয়ে পড়লাম বিপদে। পাত্রীব বড় বোনও একটি স্কুলে প্রধানা শিক্ষিকা। এম, এ, বি, টি পাশ। শুনেছি সুন্দবী। পাত্রীব কোন ভাই নেই। বাপের সম্পত্তি আছে, বাড়ী আছে। দুই মেয়েই তা পাবে। বড় বোনেব বিয়ে কোথায় হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই পরিচয় যা পেলাম—তাতে বুঝলাম—এ আমাদের গুণধর অভয়।

সুভাব অবস্থা তখন কি রকম হয় বুঝুন। তাই ঐ তরফ হ'তে চন্দ্রকে খুব পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও,—আমাদেরও পাত্রী পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও বিধিব বিধানে এ বিয়ে ঘট্‌লো না শেষ পর্যন্ত। যে পবিবাবে জাল, জোচ্চোর, পিতৃহন্তা, 'সিয়ার' স্পাই অভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে,—জেনে শুনে সেই পরিবাবে আমি চন্দ্রর বিয়ে দিতে পারি না। অভয়ের মত আত্মীয়র আত্মীয়তা আমি স্বীকাব কবতে পারবো না। তাই ববণ ডালা সাজানো হলেও— বরণ করা আর হোল না।"

হিমাংশু গম্ভীর মুখে উত্তর দিল "বেচারী সুভা! সব দিক দিয়েই অভয় তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কিন্তু সুভার হাতেও তো প্রতিশোধের অস্ত্র আছে। সেও তো অভয়ের গুণাগুণ সেকেণ্ডারী বোর্ডের কাছে জানিয়ে দিতে পারে।"

"আমি তা বলেছিলাম। কিন্তু সুভা তার উত্তরে বলেছে—'সে নীচে নেবে গেছে বলে কি আমিও নীচে নেবে যাব? আমায় সে বিয়ে কর'বে এই সর্ত্তে তো আমি তাকে ডিগ্রীগুলি দেইনি। একদিন সে আমাদের উপকার করেছিল। সে যখন দাদার ডিগ্রীগুলি চাইল, প্রত্যুপকারে আমি তা না দিয়ে পারিনি।

তাছাড়া যেদিন আমি শুনেছি সে পিতৃ ঘাতক, সেদিন হতেই আমি তাকে ঘৃণা করি। এবং সে আমাকে বিয়ে করতে চাইলেও, আমি তাকে বিয়ে করতাম না কখনই। আমি কোন কিছুর বিনিময়েই এক ঘাতককে বরণ করতে পারি না। যে লোক দেবতুল্য পিতাকে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করে না—সে করতে পারে না এমন কোন কাজ তো নেই।"

"ধন্য তোমরা মেয়েরা! কত উদার তোমাদের মন। আজ সুভা যদি এ ধরণের কিছু করত, তবে এটা স্থির নিশ্চয় জেনো অভয় কখনও তাকে এভাবে মুক্তি দিত না। বৌদিকেও দেখছি বড়দার কত দৌরাত্ম্য তিনি নীরবে সহ্য করে যাচ্ছেন। হয়ত বৌদি যদি এসব দৌরাত্ম্য করতেন বড়দা বৌদির বিরুদ্ধে কোর্টে দৌড়াতেন। কখনই এমনভাবে ছেড়ে দিতেন না।

তাই তো Bovee বলেছেন "Next to God we are indebted to women, first for life itself, and then for making it worth having."

Shakespeare বলেছেন—"women are the books, the arts, the academics, that show, contain, and nourish all the world.

Hargrave বলেছেন—"women are the poetry of the world in the same sense, as the stars are the poetry of heaven—Clear, light—giving, harmonious, they are the terrestrial planets that rule the destinies of man—kind"

চণ্ডী মৃদু হেসে উত্তর দিল—"তবে যে এতক্ষণ বড় মেয়েদের শ্রাদ্ধ করছিলেন—যাদের ভয়ে নাকি আপনি চির কুমার রয়ে গেলেন!"

"এহো বাহ্য, ধীরে ধীরে। তারও উত্তর দিচ্ছি—Aytoun বলেছেন—"woman's love is writ in water, woman's faith is traced in sand."

আরও শুনতে চাও? আরও উদাহরণ দেব—দেশী বিদেশী কার উক্তি বা দৃষ্টান্ত চাও? বেশী দূরে নয় তোমাব ঘরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখো—তোমার দিদির জীবনের কাল নাগিনী চম্পাকে।"

চণ্ডী হাত জোর করে উত্তর দিল "দোহাই আপনার, হিমাংশুদা, আমি সব বুঝেছি। খুব ভাল ভাবেই বুঝেছি। মেয়েদেব সম্বন্ধে আপনার ভাষণ শোনার আর আমার দরকার নেই।"

সুতারা উভয়ের কথোপকথন এতক্ষণ শুনছিল। ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল তাঁর পাণ্ডুর মুখে। তিনি বল্লেন "তোরা এখনও তেমনি ছেলে মানুষই রয়ে গেলি। না বড় হয়েছ আমার হিমু, না তুই।"

হিমাংশু এক হাতের পাঁচটা আঙ্গুল দেখিয়ে উত্তর দিল—"তা হবে না খুড়ামা। ছেলেমানুষের অজুহাত দিতে আর পারবে না। আমি অর্দ্ধ শতাব্দীর নিশানা অতিক্রম করে এসেছি। অবশ্য চণ্ডীও কিছু খুকীটি নেই। তবে মেয়েরা নিজেদের চিরকাল বয়স গোপন করে খুকী সেজে থাকতে ভালবাসে।"

চণ্ডী সুতারার কাছে অনুযোগ জানিয়ে বল্লে "দেখলেন মাঐমা,

আমার নামে কি রকম অপবাদ দিচ্ছেন, হিমাংশুদা। আমি কবে বয়স কমিয়ে খুকী সেজেছি?"

উভয়ের কথোপকথনে কোন উত্তর না দিয়ে স্থতারা প্রসন্ন বদনে চুপ কবে উপভোগ করলেন এদের ঝগড়া।

এমন সময় চন্দ্রিকা এসে তাড়া দিল "চণ্ডী, ঠাকুরপো, তোমরা হাত মুখ ধয়ে খাবার খেতে এসো। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

হিমাংশু উত্তর দিল "ঐ তো তোমরা মেয়েবা জান এক খাওয়া আর খাওয়া।"

"তা ভাই সত্যি বলেছো। তোমরা যে বৈজ্ঞানিক মতে শুধু বায়ু সেবনে বেঁচে থাকতে পার তা আমাদেব জানা নেই। তোমাদের সেই কৌশল হতভাগ্য বাঙালী তথা ভারতবাসীদের শিখিয়ে দিলে বোধ হয় এত হাজাব হাজাব লোক অনাহাবে প্রাণ হারাতো না। যাক্, আমরা যখন তা জানি না,—আমাদের আহার্যেব সদ্ব্যবহারটা কবে যাও ভাই।"

২৮

খাবাব খেতে খেতে চণ্ডী প্রশ্ন কবল "হিমাংশুদা, আপনাদেব যুক্তফ্রণ্টেব দাবী তো অবশেষে কেন্দ্রীয সবকাবকে মেনে নিতে হ'ল। এবাব আপনাদেব কি কমসূচী?"

চন্দ্রিকা চা ঢালতে ঢালতে উত্তব দিল "তা যাই বল ঠাকুবপো, কংগ্রেস বাজত্ব ও যুক্তফ্রণ্ট বাজত্বব থেকে আমবা বাজ্যপালেব বাজত্বে সুখে আছি। আকাশ ছোযা চাল বা শক্তীব দাম মাটিব দিকে নাব্‌ছে। তোমবা অনেক আশাই দিয়েছিলে। অবশেষে গদীতে বসে সব ভুলে গেলে। যেমন সমুদ্রে পডলে কি নদীব জল, ঝর্ণাব জল, বৃষ্টিব জল সবই এক হযে যায—তেমনি গদীতে বসলে কি কংগ্রেস, কি যুক্তফ্রণ্ট সকলেই নিজেদেব প্রতিশ্রুতিব কথা ভুলে যায। সবাব মধ্যেই একই শাসক রূপ দেখা যায।

নিজেবা চুলোচুলি শুরু কবলে আব আমবা যাবা বোকাব দল তোমাদেব গদীতে বসিযেছি—তাদেব ৫৲ কিলো চাল কিনে খেতে হয়েছে।"

একটুক্ষণ চুপ থেকে চন্দ্রিকা পুনবায় মৃদু হেসে বল্লে "আমবা মেযেবাই নাকি দু'জন একত্র হলে চুলোচুলি কবি। কিন্তু দূভাগ্য-বশতঃ যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রী সভা তো নাবী বর্জিত ছিল। তব ১৪ শবিকে কি চুলোচুলি, কোন্দলই না তোমবা দেখালে। এই বুডোবা যদি কয়জন মিলে মিশে কাজ কবতে না পাব, তবে বালক, কিশোব, যুবকদেব দিয়ে কোন যৌথ কাজ কি কবে সম্পন্ন হবে আশা কবতে পাব?"

"সুযোগ যখন আমবা নিজেদেব অদূবদর্শিতাব অভাবে তোমাদের দিয়েছি,—তখন তোমাদেব আব আটকাবো কি করে বল? বাঁধ-

ভাঙ্গা গাঙ্গের জলের মত তোমরা যদি নিন্দার স্রোতে আমাদের ভাসিয়ে দাও,—তবু আমাদের নীরব থাকতে হবে।"

চণ্ডী বল্ল "পি, ডি, এফ মন্ত্রীত্বও ৭৫ দিন এর বেশী টিকল না। যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রীত্বও ৩৬৫ টা দিন টিকিয়ে রাখতে পারলেন না।"

"মাৎ ঘাবড়াও। কেবল পশ্চিম বাংলায় নয়। রাজত্বের ক্ষণ-স্থায়িত্বের নজীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে অনেক দেখতে পাবে। দ্য-গলের পূর্বে ফ্রান্সের মন্ত্রীসভার অবস্থা বর্ত্তমান পশ্চিম বঙ্গের চেয়েও অধিকতর ক্ষণস্থায়ী ছিল। সেই সময় ফ্রান্সে কোন কোন মন্ত্রী সভার আয়ুষ্কাল ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। মন্ত্রী সভার এই ভাঙ্গা গড়ার মধ্যেই ফ্রান্সের প্রশাসন কার্য অনিশ্চিত এবং কখনও সুনিশ্চিত ছিল না। বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের মতই অগণিত রাজনৈতিক দল তখন ফ্রান্সে ছিল বলেই স্থায়ী মন্ত্রীসভা গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। ঠিক এই কারণেই যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভার ১৪ শরিকের সংসারে নিত্য কলহ ও বাদবিসংবাদের সুযোগ নিয়ে বিরোধীরা দল ভাঙ্গার সুযোগ নিয়েছিল। যার পরিণামে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভার কোনটা ৯॥ মাস, কোনটা ৭৫ দিন স্থায়ী হতে পেরেছিল।

"শুনলাম বর্ত্তমানে নাকি আরও অনেক সব নূতন দল হয়েছে—সত্যি নাকি?"

"শুনবে তবে এ যাবৎ কয়টি দল পশ্চিম বাংলায় আছে এবং তাদের নাম কি? অবশ্য আগামী অন্তবর্ত্তী ভোটের পূর্বে তার সঙ্গে আরও ডজনখানেক নূতন দল যদি গড়ে উঠে— তা'তে আশ্চর্য হব না। কারণ দল গঠনে বাঙালীর জুড়ি কোন জাত বোধ হয় নেই। তাই যেখানে বাঙালীর ভীড় সেখানেই দলের সংখ্যাও বেশী। অন্যান্য প্রদেশের মত এরা একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত হয়ে থাকতে পারে না।

আজ অবধি পশ্চিম বাংলায় ২৪টা দল আছে। যথা (১) কংগ্রেস (২) ফরোয়ার্ড ব্লক (৩) ভারতীয় ক্রান্তি দল (৪) বাম কমিউনিষ্ট

(৫) আর, এস, পি (৬) জনসঙ্ঘ (৭) অনুন্নত শ্রেণী সঙ্ঘ (৮) বঙ্গীয় জাতীয় দল (৯) ঝাড়খণ্ড দল (১০) প্রোগ্রেসিভ মুস্লিম লীগ (১১) ওয়ার্কাস পার্টি, (১২) দক্ষিণ পন্থী কমিউনিষ্ট (১৩) এস, ইউ, সি (১) ফরোয়ার্ড ব্লক মাক্সিষ্ট (১৫) বলশেভিক পার্টি (১৬) পি. এস, পি (২৭) লোক সেবক সঙ্ঘ (১৮) ভারতীয় লোক দল (১৯) এস, এস, পি (২০) হিন্দু মহাসভা (২১) স্বতন্ত্র পার্টি (২২) ভারতীয় গণতান্ত্রিক দল (২৩) ঠাকুর পন্থী আর, এস, পি দল (২৪) বাংলা কংগ্রেস।"

"এত দলাদলি বলেই তো সুষ্ঠুভাবে দেশের উন্নতির চিন্তা কেউ আপনারা করতে পারেন না। তাই তো বাংলা তথা ভারতের আজ এই দুর্গতি। কেবল কি বিভিন্ন পার্টিই—শুনছি বিভিন্ন রাজ্যে নানান সেনা বাহিনীও আপনারা সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। সত্যি নাকি ?" চণ্ডী বল্লে।

"শোন তবে, 'হিন্দী সেনা বাহিনী' এস, এস, পি ও জনসঙ্ঘ সমর্থন পুষ্ট। 'আংরেজী হটাও' দাবীতে এই সেনা বাহিনীর জন্ম। কাশী ও উত্তর প্রদেশ আরও ২।১টি শহরে এদের কার্যকলাপ।

'শিব সেনা বাহিনীর' জন্ম মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের মারাঠী প্রধান অঞ্চলের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে। এরা দক্ষিণী বিদ্বেষী। এই সেনা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী থ্যাকার। 'মহারাষ্ট্র মারাঠী'দের—এই জিগির তুলছে এরা। ছত্রপিত শিবাজীর নামে নামোকরণ হয়েছে এই বাহিনীর।

'সর্দ্দার সেনা বাহিনীর' নামোকরণ হয়েছে বল্লভ ভাই প্যাটেলের নামে। শিবসেনার পাল্টা গুজরাটের সর্দ্দার সেনা। সমস্ত অগুজরাটি ব্যবসায়ে ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে গুজরাটির সন্তানদের দাবী সর্বপ্রথম গণ্য করতে হবে। নতুবা তল্পি তল্পা গুটিয়ে গুজরাট হতে চলে যেতে হবে। বোম্বাই হ'তে পশ্চিম রেল পথের সদর দপ্তর গুজরাটে আনা চাই।

'গোপাল সেনা বাহিনী' কেরলে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছে। শ্রীগোপালনের প্রেরণায় এই বাহিনী গঠিত হওয়ায় এর নামোকরণ গোপাল সেনা।

'সেঙ্গুত্তুবান সেনা বাহিনী' হিন্দী বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্তরালে এর জন্ম। রক্তবর্ণ "তামিল্লাগাম" লেখা শ্বেত পতাকা সেঙ্গুত্তুবান সেনা বাহিনী উত্তোলন করেছে। এই সেনাবাহিনীর পক্ষ হতে সার্বভৌম তামিলনাদ রাষ্ট্র স্থাপন উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

'নাগ সেনা বাহিনী'র উদ্দেশ্য মধ্যপ্রদেশের দ্বিখণ্ডিতকরণ এবং নাগপুর ও তৎসন্নিহিত এলাকা নিয়ে বিদর্ভ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। নাগসেনা বাহিনীর কার্যকলাপ এখনও বাহ্যতঃ উগ্র রূপ নেয়নি।

'লাসিত সেনা বাহিনী' অসমীয়া ভাষীদের সমর্থন পাওয়ার জন্যই লাসিত সেনার ইস্তাহারে "আসাম অসমীয়াদের" বলে দাবী করা হচ্ছে।

'বিজয় সেনা বাহিনী'র জন্ম পশ্চিম বাংলার ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে। বাংলা ভাষার সমর্থন ও প্রসারই এ বাহিনীর উদ্দেশ্য।"

চন্দ্রিকা নীরবে উভয়ের কথোপকথন শুনছিল। এবার সে মুখ খুল্লে "এই হাজার দল, হাজার সেনা বাহিনীই একদিন দেশের সর্বনাশের মূল হবে। তাই আজ শরিক দলগুলি তাদের স্বীয় পার্টির অস্তিত্বের কথাই বেশী চিন্তা করছে। সে তুলনায় ঐতিহাসিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তারা পারেনি। এবং এই সঙ্কীর্ণ দলনীতিই সব কিছু পতনের মূল। জনজীবনের সার্ব্বিক কল্যাণ কেউ চায় না। শুধু মিটিং এর পর মিটিং। এবং 'আমার দলই শ্রেষ্ঠ দল', 'আমার পথই চূড়ান্ত পথ'—এই বক্তৃতা দিয়েই চলেছে সবাই।

কেউ হাঁকছে 'গান্ধীর অমৃত বাণীতে কাজ হয় না'। অন্যদল জিগির তুলেছে 'মাও-সে-তুং' জিন্দাবাদে পেটের ক্ষিদে মরে না।' সবাই আজ দেশকে বিকিয়ে দিতে বসেছে। পার্থক্য কেবল পরাধীনতার শিকলের মার্কা ঈগল হবে,—না ড্র্যাগন হবে—না ভল্লুক হবে অথবা সিংহ হবে। এতে কিছু যায় আসে না। শিকল শিকলই। তোমাদের সব পার্টির ইডিওলজির কচ্‌কচিতেও সাধারণ মানুষ আজ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। শিকল তা সোনারই হোক বা রূপারই হোক, বা পিতল বা লোহারই হোক্‌—যে ধাতুরই তৈরী হোক্‌ না কেন-তার একই ধর্ম। পরাধীনতার গ্লানি সব ধাতুর শিকলেই উপলব্ধি করা যাবে।

দেশকে কোন পার্টি ভালবাসে না। ভালবাসে তার পার্টিকে। এজন্য দেশকে যদি বিদেশের নূতন শিকলে বদ্ধ করতে হয়—তাতেও কোন পার্টি পিছিয়ে যাবে না—এমনই হতভাগ্য আজ বাংলা তথা ভারতের। কার উপর আস্থা রাখবো? কার পদানুসরণ করব? সবাই যে আমাদের বিভ্রান্তির মুখে বার বার ঠেলে দিচ্ছে। শেখাচ্ছে বিদেশীর বুলি কব্‌চাতে—বিদেশীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জন্মভূমিকেও সেই আদর্শের ছাচে ঢেলে নিতে। বিদেশের যা কিছু তা ভাল। আর আমাদের ঐতিহ্য পূর্ণ অতীত কি আজ এমনি ভাবে আমেরিকা, রাশিয়া, চীনের প্রভাবে ঢাকা পড়বে? আমরা কি ঐ সব দেশের মত আমাদের আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরতে পারবো না? এমনিভাবে পরানুকরণের মোহে আমাদের দেশবাসীর চোখ আর কত কাল ঝাপ্‌সা হয়ে থাকবে? কতকাল আর মানুষ নিজের ভালমন্দ বিচারশক্তি হারিয়ে বিভ্রান্তির পথে ছুটে বেড়াবে।"

"দুঃখ কর না বৌদি। দেশে যত বেশি দল গড়ে উঠছে,—ততই দেশ বিপ্লবে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তোমার স্বপ্ন একদিন স্বার্থক হবে। জেগে উঠবে প্রতিটি ভারতবাসীর

ঘুমন্ত চেতনা। বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে প্রতি রাষ্ট্রেই এমনি হট্টমেলা হয়ে থাকে—তার নজির পাওয়া যায় ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

যাক্ আমায় আর এক কাপ চা দাও। তোমার মটরশুঁটির কচুরিটা-আজ বেশ হয়েছে। খান কয়েক আরও দাও। ফিরতে আজ আমার দেরী হবে। মিটিং আছে, কাকাবাবু ও খুড়ীমা জিজ্ঞেস করলে বলো। আর প্রয়োজন হলে পার্টি অফিসে আমাকে ফোন করে দিও।

২৯

চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে মহানগরীর বুকে। ঘন আঁধারের সাথে সাথে কলকাতার রাজপথে চমকপ্রদ রং-বেরং এর বিজ্ঞাপনের নিয়ন লাইট তারার মত ঝল্‌মলিয়ে উঠল। দোকান, হাট, বসত বাড়ী—সব গুলির দ্বার ও গবাক্ষ পথ দিয়ে আলোর রশ্মি রাজপথে ছিট্‌কে পড়ে রাজপথকে আলোতে আলোময় করে তুলেছে। ট্রাম, বাসের এক ঘেয়ে আর্তনাদে রাজপথকে মুখর করে রেখেছে।

সহরের কোলাহল মুখরিত আনন্দ স্রোতে উদ্ভাসিত রাজপথের গুঞ্জনধ্বনি ভেসে আসছিল মৃন্ময়ের গবাক্ষপথ দিয়ে। শুধ্ কলকাতার মহানগরীই নয়। মৃন্ময়ের গৃহটিও আলোক মালায় কক্ষে কক্ষে সজ্জিত হয়েছে। কেবলমাত্র দোতালার একটি কক্ষে মৃন্ময় নিজেকে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

আজ বিকেলে মৃণালের স্কুল বোর্ডিং হতে এক ভয়াবহ সংবাদ এসেছে। যে খববে মৃন্ময় কেবল দুঃখিত ও চিন্তান্বিতই হয়নি, তার সব চিন্তা যেন কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে না এর পরিণতি কোথায়? কি সে করতে পারে? নিজের ত্রুটি সে উপলব্ধি করতে পারছে। নিজের বিবেকের কাছে তা স্বীকার করলেও পরিচিত সমাজে তা স্বীকার করবার মত মনোবল তার নেই। নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে সে একি করল?

রূপালী পর্দ্দার ছবির মত এক এক করে সব ঘটনা তার মনের পর্দ্দায় ভিড় করে দাঁড়াল।

চম্পার অপত্যস্নেহের অভাবে মৃন্ময় যখন মৃণালকে তার মার কাছে পাঠিয়ে ছিল তখন মৃণাল সবে এক মাসের শিশু। সে সময় হতে দিদা, দাদু, হিমাংশু, চন্দ্রিকার স্নেহচ্ছায়ায়, সঙ্গীসাথীদের

প্রীতি ভালবাসার বন্ধনের মধ্যে মৃণাল শুক্লপক্ষের চাঁদের মত একটু একটু করে বেড়ে উঠছিল।

কেবলমাত্র চন্দ্রিকার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে মৃণালকে সে ছিনিয়ে এনেছিল। প্রথম যেদিন আয়া ও ড্রাইভারকে চিঠি দিয়ে মৃন্ময় পাঠায়—সেদিন ঠাকুরমা ও নাতির অচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা সে শুনেছিল আয়া ও ড্রাইভারের মুখে। কিশোর মৃণাল ঠাকুরমার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলে ছিল—"না, না দিদা, তোমাদের ছেড়ে আমি অন্য কোথাও যাবো না।"

মা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন "ওরে আমার মাণিক, তোকে ছেড়ে দিতে কি আমার প্রাণ চায়? তুই যে আমার শেষ জীবনেব একমাত্র মায়ার বন্ধন। কিন্তু তোর বাবা যদি নিষ্ঠুরেব মত তোকে ছিনিয়ে নেয়, তবে কিসের দাবীতে তোকে আটকে রাখতে পারি?"

"আমি বাবাকে চিনি না। কে আমার বাবা—জানি না। তোমরাই আমার সব। এতোকাল তোমরা আমায় ভালবেসেছো, আদর যত্ন করেছো, আজ কে আমার বাবা সেজে আমাকে তোমাদের কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে?"

"ছিঃ, ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই, সোনা। তিনি যে তোমার বাবা হন্। তিনি ডাকলে যেতে হয়।"

"কই এত বছর তো তিনি ডাকেননি? বা একবার আমার খোঁজও করেননি,—তবে আজ কেন লোক পাঠিয়েছেন নিয়ে যেতে? তুমি জান না দিদা, আমায় একবার তোমাদের কাছে থেকে ছিনিযে নিয়ে গেলে, আর আমাকে তোমাদের কাছে কখনো আসতে দেবে না। আমি মরে গেলেও যাব না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি দিদা, আমাকে কারো কাছে পাঠিও না। আমি তোমাদের কাছে থাকবো। আমি কোথাও যাবো না। তুমি বল্লে এরা চলে যাবে। তুমি একবারটি বল না এদের চলে যেতে।"

সুতারার কণ্ঠস্বর কান্নার জলে মাখামাখি হয়ে উত্তর দিলেন,

"ওরে, তোর বাবার বাড়ীর কেউই যে তোর দিদার কথা শুনবে না। তোর বাবাই শুনলো না। আর অন্যরা কেন শুনবে? তোর দাতুর বাড়ীর রীতি তো তোব বাবার বাড়ীতে চলবে না। তোর দাতুর বাড়ীর সব কিছুই আজও এই বৃদ্ধার অঙ্গুলি হেলনে চলে। কিন্তু তোর বাবার বাড়ীতে সে কেউ নয়।

দেখি তোর কাকুকে একবার তোর বাবার কাছে পাঠাবো। তাতে যদি কোন কাজ হয়।"

ব্যাকুল ভাবে ভয়ার্ত্ত কান্না জড়িত স্বরে মৃণাল বলে, "না—না দিদা, তোমাব কথা যিনি শোনেন না। কাকুব কথা তিনি কখনই শুনবেন না। তোমায় কাগজ কলম এনে দিচ্ছি দিদা। লক্ষ্মী দিদা, তুমি লিখে দাও দিদা, আমি কিছুতেই যাবো না। ওখানে গেলে আমি মরে যাবো। তোমাকে যে ভালবাসে না, তোমার কথা যে শোনে না, সে আমায় নিয়ে গিয়ে ভীষণ মারবে। আমি তোমাদের ছাড়া আব কাউকে তো চিনি না, দিদা।"

মৃণালের অনুনয়ে ও মাতৃহৃদয়ের অন্ধ স্নেহের টানে সুতাবা মৃন্ময়ের মত অধম সন্তানের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন—সব মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে।

সেই চিঠিখানা আজও যেন মৃন্ময়ের চোখের সামনে ভাস্‌ছে। সেই চিঠিভরা ব্যাথাতুর মাতৃহৃদয়ের করুণ ক্রন্দন আজও তার কাণে বাজ্‌ছে। মা লিখেছিলেন—

স্নেহের মৃন্ময়,

তোর ছেলে মৃণালকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলি। কিন্তু আমি তাকে প্রাণে ধরে ছেড়ে দিতে পারলাম না। সেও আমাদের মায়া কাটিয়ে যেতে চাইছে না। সে ভীষণ কান্নাকাটি করছে।

মৃণাল এখনও কিশোর বালক। স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসার বন্ধনের মধ্যেই তার এই সময়টা কাটানো প্রয়োজন। মানুষের

জীবনের এই বয়সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বয়সের প্রভাবের উপর নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ জীবন। এই সময় যদি তাকে স্নেহ, ভালবাসার শাসনে চালিত করা যায়—ভবিষ্যৎ জীবনে তবে সে সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে। অন্যথা বিপরীত কিছু ঘটবার সম্ভাবনা আছে।

মৃন্ময়, তোর বাড়ীতে এই কিশোর বালক একা একা কি করবে? ওখানে যদি মৃণালের কোন মা থাকতো—তবে মৃণালের জন্য আমার চিন্তার কোন কারণ থাকতো না। এখানে মৃণাল মাতৃস্নেহ পাচ্ছে। কি সুন্দররূপে সে ফুটে উঠছে দেখে আমরা আনন্দিত হাচ্ছি। পড়াশুনা, খেলাধূলা, অন্যান্য সব রকম গুণের জন্যই সে বাসার, প্রতিবেশীদের স্কুলের ও সঙ্গীসাথীদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। সবাই প্রশংসায় শতমুখ। মৃণালের গর্বে আমরাও গর্বিত। সে যে আমাদেরই বংশধর।

কিন্তু হঠাৎ তাকে এই সময় তোর ঐ শূন্য পুরীতে নিয়ে গেলে, সে ঠিক সামঞ্জস্য রেখে চল্‌তে পারবে না। তুই তো সারাদিন তোর কাজকর্ম নিয়ে বাইরে বাইরে থাকিস্। কে মৃণালের তত্ত্বাবধান করবে? আয়া বা চাকরদের থেকে টাকার বিনিময়ে কাজ পেতে পারিস্। কিন্তু তাদের মধ্যে তোর ছেলের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্নেহ, মায়া মমতা জাগবে কেন? তাই বলছি, এই কচি লতাটিকে স্নেহের আশ্রয় হতে নিয়ে কোথায় রাখবি? জল, ঝড়, রোদে বা অযত্নে যে তা শুকিয়ে যাবে।

মৃন্ময়, তোর ছেলে চিরকাল তোরই থাকবে। যথা সময়ে সে তার বাবার কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু এই বয়সে তাকে বিপরীত পরিবেশের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিস্ না।

আজ যদি মৃণালের মা বা কোন কাকা কাকীমা ওখানে থাকতো তবে মৃণালের ভবিষ্যতের জন্য এতটা উদ্বিগ্ন হতাম না।

রায়বাহাদুর সীতেশবাবুর নাতিদের পরিণাম আশা করি তুই ভুলিসনি। আমি চাই না তোর একটু ভুলের মাশুল দিতে এমন সুন্দব কিশোরের ভবিষ্যতে তেমন কিছু ঘটে।

পরিচারক পরিচারিকা পরিবৃত তোর বাড়ীটা মৃণালেব এই বয়সে তাব কাছে জেলখানা মনে হবে। এই নির্জ্জন বাসের বয়স এটা নয়। এব পরিণাম সুখকব হতে পাবে না। হয়ত উপযুক্ত শাসনের অভাবে সে পথভ্রষ্ট অথবা অত্যাধিক স্বাধীনতায় সে উশৃঙ্খল হয়ে উঠবে।

কুঁড়িটা যখন ভালভাবে ফুটছে, বিকশিত হবার সুযোগ দে। তাবপর তোর ফুল তুই তুলে নিয়ে তোর ঘর সাজাস্। মৃণালের স্ত্রী ও মৃণাল তোব গৃহোদ্যান মনোরম শোভায় উদ্ভাসিত করে তুলছে শুনে আমাদেব আনন্দ বাড়বে। তুইও সুখ শান্তি পাবি আদর্শ পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে।

কিন্তু অসময়ে কুঁড়িটি ছিঁড়ে নষ্ট করে দিস্ না। আজ এই সময় তার যে বক্ষণ, শাসন, স্নেহ, ভালবাসার প্রয়োজন, তার কিছুই তোর ওখানে সে পাবে না। তাই আমার মৃণালের জন্য আশঙ্কা।

আমি আজ বৃদ্ধা। সারা জীবনের অভিজ্ঞতার পরশ পাথরে মৃণালেব ভবিষ্যৎ যাচাই করে তোকে এই নিষ্ঠুর কাজ হতে বিরত হতে বলছি। নতুবা আমার কোন স্বার্থ এতে নেই।

যখন সংসারের নানা ঘা খেয়ে মন আমাব কন্‌ক্রিটের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন তুই-ই জোর করে মৃণালের দায়িত্ব আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছিলি। শেষ বয়সে কি এক মায়ার বন্ধন! কিন্তু জানি, এই মায়ার বন্ধনও একদিন ছিন্ন হবে, এজন্য নিজেকে তৈরীও করছি। কিন্তু আজ আমি তোর কাছে এই যে চিঠি দিচ্ছি, তা একমাত্র মৃণালের অন্ধকার ভবিষ্যতের আশঙ্কায়।

আত্মীয় পরিজন বিহীন তোর বাড়ী তার কাছে কয়েদখানার

মতই মনে হবে। এই কিশোর বয়সে এই বিরাট নির্জনতা হয়ত তার মনের ভারসাম্য রক্ষার প্রতিকূল হবে। তাই বলছি—মৃন্ময়, মৃণাল তোরই আত্মজ। বিশেষ কারো প্রতি আক্রোশের বশবর্ত্তী হয়ে এই অবোধ কিশোরের জীবনটার উপর তার প্রতিশোধ নিস্ না। এতে যে তোরই ক্ষতি হবে সব চেয়ে বেশী।

আশা করি তুই আমার যুক্তিগুলি চিন্তা করে কাজ করবি।

স্নেহাশীর্বাদ নিস্।

ইতি

তোর শুভার্থিনী মা"

কিন্তু মার এই আকুল আবেদন মৃন্ময়ের মনে দাগ কাটেনি। মদোমত্ত হাতী যেমন পদ্মবন দলিত মথিত করে, তেমনি স্নেহ বিগলিত মার স্নেহের হৃদয়কে টুক্‌রো টুক্‌রো করে—মৃণালকে তার আশৈশবের স্নেহের আশ্রয় হতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল মৃন্ময়। মৃণালের বিদায়-কালীন করুণ কান্নায় সুতারা সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন।

মৃন্ময় মৃণালকে জোর করে মার স্নেহাঞ্চল হতে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে নিজের বাড়ীতে রাখেনি, একটি মিশনারী স্কুলের বোর্ডিং এ তাকে পাঠিয়েছিল।

মৃণালকে নিজে সে কখনও দেখাশোনা করতে হোষ্টেলে যায়নি বা মৃণাল যার থেকে সামান্যতম স্নেহের পরশ পেতে পারে—এমন কোন লোকের সঙ্গে মৃণালকে দেখা করবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। মৃণালের খরচপত্র নিয়মিত সে পাঠিয়ে দিয়েছে। মৃণালের কাপড় চোপড় বা আবশ্যিক দ্রব্যাদি কিনবার টাকাও সে হোষ্টেল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিত।

প্রথম দিকে মৃণালের চরিত্র ও স্বভাব সম্বন্ধে খুবই ভাল প্রশংসা-পত্র বোর্ডিং-এর কর্তৃপক্ষ পাঠাতেন। এমন কি মৃণালকে স্কুলে "বেষ্ট বয়" নামে আখ্যাও দেওয়া হয়েছে স্কুল হতে। ক্রমেই তার চরিত্র ও স্বভাবের পরিবর্তন সম্বন্ধে রিপোর্ট আসতে সুরু করে।

মৃন্ময় এই পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় না করে—মৃণালের প্রতি কর্তৃপক্ষকে কঠোর হবার আদেশ দিতে থাকে।

মৃণালের জন্য টাকা খরচ করা ব্যতীত তার যে আর কোন কর্তব্য থাকতে পারে—যে সম্বন্ধে মৃন্ময় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল এতকাল। ভেবেছিল বাড়ীতে তার তত্ত্বাবধানের অসুবিধা থাকায়—এইভাবে সে হোষ্টেলে মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারে না। তাই স্কুলের "বেষ্ট বয়" বলে যে মৃণালের প্রথম দিকে রিপোর্ট আসতো—সেই কিশোর বালক কিনা হত্যা করলো তারই প্রিয় সহপাঠীকে।

আজ এই খবর পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে মিশনারী স্কুলের ফাদার মস্ত একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল এবং সেই চিঠির ছত্রে ছত্রে তিনি মৃন্ময়ের বিরুদ্ধে দোষারোপ করেছেন।

তিনি জানিয়েছেন মৃণাল মৃণালের মতই কোমল সুন্দর স্বভাব নিয়ে হোষ্টেলে এসেছিল। কিন্তু মৃন্ময়ের অদূরদর্শিতা, স্নেহ মায়াহীন ব্যবহারই মৃণালের চরিত্রে এত দ্রুত পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তিনি লিখেছেন,—তিনি মৃণাল হতে রিপোর্ট পেয়েছেন মৃণাল তার দাদুর বাড়ীতে সবার খুব আদরের ও স্নেহের পাত্র ছিল। সেখান হতে মৃন্ময় তাকে ছিনিয়ে এনে হোষ্টেলে দিল। মৃণাল তার আবাল্যের স্নেহনীড় হারিয়ে তাদের কাছে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিল। সে তাঁদের উদ্দেশ্যে চিঠি দিত। তাঁরাও প্রত্যুত্তরে তাকে স্নেহ আদর জানাতেন। মৃণালের কাকা কয়েকবার তার সঙ্গে দেখা করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ মৃন্ময়ের আদেশ পালন করতে গিয়ে মৃণালের প্রতি নির্মম হয়েছিল অকারণে। তার সঙ্গে দাদুর বাড়ীর পত্র যোগাযোগও রাখতে দেয়নি।

কিশোর মৃণালের মনে এই নির্মমতা গভীর রেখাপাত করে। সে দেখেছে "ভিজিটিং ডে"তে সবার কাছেই কোন না কোন ভিজিটার আসতেন দেখা করতে। একমাত্র মৃণালের কাছে এই কয়মাস

হোষ্টেল জীবন বন্দী জীবন, স্নেহ মায়া মমতা বর্জ্জিত নির্মম কারা-জীবন হলো।

যে ছেলেটিকে মৃণাল ছুরি দিয়ে হত্যা করে—সে মৃণালের একান্ত বন্ধু ছিল। কিন্তু সেই ছেলেটি বাড়ীর সবার স্নেহ, আদর পেতো। প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা করতে তার মা, বাবা, আত্মীয় স্বজন আসতেন। আসতো তার জন্য নানা রকম সুখাদ্য, খেলনা ও উপহার। সে মৃণালকে ভাগ না দিয়ে কিছুই ভোগ কর'ত না।

ক্রমে মৃণালের মনে ছেলেটির এত আদর, ভালবাসার জন্য মনে মনে ঈর্ষা জাগে। এই ঈর্ষাই এমন প্রচণ্ড রূপ নিতে আরম্ভ করে তার মনে। সে তাব বন্ধুকে সহ্য করতে পারে না। ভাবে তার বন্ধু যেন তার প্রাপ্য আদর, স্নেহও কেড়ে নিয়েছে। ক্রমে সে কেমন বিমর্ষ হয়ে থাকতো। বন্ধুব সঙ্গেও মিশতো না। তার দেওয়া খাবার খেতো না, তার খেল্‌না সে ইচ্ছে করে সব ভেঙ্গে দিত। রঞ্জনের প্রতি মৃণালের ভালবাসা ঈর্ষ্যায় পরিণত হলো। ক্রমেই মৃণাল হিংস্র স্বভাবের হয়ে উঠ'ল। রঞ্জনকে সে সহ্য করতে পাবতো না।

মৃণালের মনে কেবলই একটা কথা মনে হোত—সে তো তাব বন্ধুর মতই এমনি আদর স্নেহ ভালবাসা দাদু, দিদা, কাকা, চন্দ্রিকার কাছে পেয়েছে। কেন হঠাৎ তাকে এখানে এনে ফেলা হোল? এখানে তাঁদেব কাউকে আসতে দেওয়া হয় না। তাকেও তাঁদের কাছে যেতে দেওয়া হয় না। এটাই তার কোমল মনে গভীব রেখাপাত কবতো। সে সব সময় অন্যমনস্ক ভাবে কাগজ কলম সামনে পেলেই লিখতো—'দিদা আমাকে এখান থেকে তোমার কাছে নিয়ে যাও।' 'দাদু আমার এখানে ভাল লাগছে না।' 'কাকু আমাকে তুমি শীগ্‌গির নিয়ে যাও।' 'চন্দ্রি, আমার এখানকাব খাবার ভাল লাগছে না। তোমার হাতের রান্না খাবো। আমায় নিয়ে যাও তোমাদের কাছে।' কারো সাথে সে কথাবার্ত্তা শেষেব

দিকে বলতো না। আপন মনে সে রাতদিন কি চিন্তা করতো। আগে যে মৃণাল পড়া, লেখা, স্বভাব, চরিত্রে সব কিছুতে ফার্ষ্ট হয়েছে, —সেই মৃণাল যেন ক্রমে কেমন জড় ভরতের মত হয়ে পড়লো।

মৃণালের বন্ধু রঞ্জন বাড়ীর সবার প্রিয়। এটাই মৃণালের তার প্রতি আক্রোশের হেতু। এবং এই কারণেই অবশেষে মৃণাল রঞ্জনকে বাবুর্চ্চিদের মাংস কাটবার ছুরি দিয়ে হত্যা করে।

ফাদার রঞ্জনের জন্য শোক প্রকাশ করেছেন। মৃণালের মত কচি কিশোবের অপরাধ প্রবণতার জন্য মৃন্ময়কে দোষী সাব্যস্ত করে মন্তব্য করেছেন যে-মৃন্ময় তাদের প্রতিষ্ঠানের চোখ খুলে দিয়েছে। ভবিষ্যতে তারা এমন হৃদয়হীন পিতার সন্তানদের তাদের প্রতিষ্ঠানে বেখে— প্রতিষ্ঠানের কলঙ্কের কারণ হবে না। শিশু মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তারই পবিণামে দু'টি কিশোর জীবন ব্যর্থ হল।

মৃণালের মত কিশোর যে একদিন ভারতের যোগ্য নাগরিক হতে পারতো, যে একদিন তার পরীক্ষার ফলের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের নাম যশ ছড়িয়ে দিতে পারতো, যে ছেলে একদিন আপন কৃতিত্বে দেশের উন্নতি ও পবিবারের খ্যাতি বৃদ্ধি করতে পরতো,—সেই ফুলের মত সুন্দব, কুসুমের মত কোমল মৃণাল তার পিতার নির্মমতা ও হৃদয়-হীনতায় হয়ে উঠল কিশোব খুনী। এর থেকে অধিকতর পরিতাপ ও লজ্জার কথা মৃন্ময়ের কাছে কিছুই হতে পারে না ইত্যাদি নানা কথায় মৃন্ময়কে অভিযুক্ত ও ভৎর্সনা করেছেন। জানিয়েছেন মৃন্ময়ের শিশু মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত থাকা উচিত ছিল। তবে মৃণালের এই পরিণতি হত না।

মৃণালকে "জুভেনাইল কোর্টে"—বিচারের জন্য পাঠান হয়েছে। কোরকে যে কুসুমের কীট প্রবেশ করেছে—সেই কোরক কি কখনও প্রস্ফুটিত হতে পারে ? নিজের প্রতি·মৃন্ময়ের ধিক্কার এলো। পত্রিকায় বড় বড় হরফে এই সংবাদ আগামী কাল প্রকাশিত হবে। পরিচিত

সমাজের সামনে মৃন্ময়ের মুখ কত নীচু হবে। এ খবর পেয়ে বাবা মা কি নিদারুণ আঘাত পাবেন—হয়'ত অসুস্থ মার জীবন সঙ্কটাপন্ন হতে পারে। চন্দ্রিকার মনের ভাব কি হবে? সে কি মৃণালের পরিণামে হাসবে না খুসী হবে? মৃন্ময় নিজের মনেই বলে—না তা কখনও হতে পারে না। মৃণালকে সেও স্নেহ করতো, ভালবাসতো হয়ত। অতি যত্ন করে খাওয়াতো—তাই তারই কাছে মৃণাল হোষ্টেলের খাওয়ার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতো। কিন্তু অভিমানী চন্দ্রিকা মৃণালকে তাকে 'মা' ডাকতে শেখায়নি। চন্দ্রিকা মৃণালের এই পরিণতিতে দুঃখ পাবে—কিন্তু হাস্তে পারে না। মৃণালই যে মৃন্ময়কে চরম পরিহাস করে গেল লোকচক্ষে। অবশ্য এজন্য কিশোর মৃণালকে দোষারোপ করা যায় না। দোষ মৃন্ময় ও চম্পারই।

শিশু মন প্রস্ফুটিত হয় স্নেহবারি সিঞ্চনে। কিন্তু হতভাগার অদৃষ্টে নিষ্ঠুর পিতামাতার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করায় সে তার থেকে বঞ্চিত। যেটুকু স্নেহ সে দাদুর বাড়ী হতে পেয়েছিল স্বার্থপর মৃন্ময় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে চন্দ্রিকার জন্য পিতা মাতাকে জব্দ করতে গিয়ে সে নিজের সন্তানের প্রতি নির্মম ব্যবহার করেছে। যার পরিণতিতে জীবনের প্রথম সোপানেই সে 'খুনী' নামে কলঙ্কিত হলো।

৩০

অনেকদিন সারকুলার রোডেব সেই রেঁস্তোরাতে হিমাংশু যায়নি। মৃণালেব খবর আকস্মিক ভাবে এক প্রতিবেশীনির মুখে শুনে স্নুতারা দাকুণ মর্মাহত হয়ে হার্টফেল করে মাবা গেছেন। সমববাবু যেন প্রস্তরের মত স্থবির হয়ে গেছেন। তাঁর বর্ত্তমানে তাঁর বংশধরের এই পবিণতিতে তিনিও নিদাকুণ 'শক্' পেয়েছেন। তবে তাঁর মন ঘা খেয়ে খেয়ে তা পাষাণে পরিণত হয়েছে। এজন্য তিনি মৃণালকে অভিযুক্ত করেননি। মনে মনে মৃন্ময়কেই অভিসম্পাত দিয়েছেন।

হিমাংশু ও চন্দ্রিকার মনেও দাকুণ আঘাত লেগেছে। তারা ব্যথা সহ্য করবার শক্তি রাখে। মৃণালকে সবাই স্নেহ করত। তাব মত কিশোর যে কখনও এমন দুষ্কর্ম করতে পাবে—এ যে অচিন্তনীয়। কিন্তু তারাও জানে এটা তার দোষ নয়। স্নেহ, ভালবাসা বঞ্চিত কিশোরের জীবন মরুভূমির মত। স্নেহের মন্দাকিনী ধারা হতে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে অমন নির্মমভাবে একক নিষ্ঠুর জীবন যাপন করাবার পরিণতিই এরূপ।

এসব নানা কারণে হিমাংশুর মন ভাল ছিল না। তাই সে তাদের প্রিয় মিলনচক্রে আসেনি। কিন্তু মানুষকে পবিবেশকে মেনে নিয়ে জীবনের গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়—সুখ দুঃখ শোক তাপ ভুলে গিয়ে। মানুষ জীবনের এই সব ঘাত প্রতিঘাত ভুলে যেতে পারে বলেই--সে টিকে থাকতে পারে। নতুবা মানুষ পাগল হয়ে যেতো। মানুষের পক্ষে যদি দুঃখের, শোকের ব্যথা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব না হ'ত—তবে মানব জীবনে কি চরম দুর্গতি হোত তা কল্পনা করা যায় না।

হিমাংশু সুতারাকে হারিয়ে মাতৃহারা হয়েছে আবার নূতন করে।

তার নিজের মার কোন স্মৃতি তার মনের পর্দ্দায় সে কোনদিন খুঁজে পায়নি। মার কথা যখনি সে চিন্তা করেছে—সেখানে ফুটে উঠেছে স্নেহময়ী সুতারার বাৎসল্য রসপূর্ণ লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি। চন্দ্রিকাও সুতারাকে হারিয়ে নিজের মাতৃবিয়োগের ব্যথা নূতন করে উপলব্ধি করেছিল।

সমরবাবু আরও বেশী আঘাত পেয়েছিলেন। দুই পুত্র ও ভাগ্নেকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও কেউই সুতারার শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে আসেনি। হিমাংশুই সুতারার মুখাগ্নি করেছিল। এতে সমরবাবু খুবই দুঃখিত হয়েছেন। নিজের দু'টি সন্তান জীবিত থাকতেও সুতারাকে ভাসুরপোর হাতের মুখাগ্নি গ্রহণ করতে হ'ল। হিমাংশু অবশ্য বল্ল "মাতৃঋণ শোধ করবার একটি সুযোগই খুড়ীমা আমাকে দিয়ে গেলেন।" হিমাংশুই সুতারার শ্রাদ্ধাদি যথারীতি সম্পন্ন করল।

হিমাংশুকে রেঁস্তোরাতে প্রবেশ করতে দেখেই কিরীটি বলে উঠল—"হিমাংশুদা আজ অনেক কাল পর আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হোল।"

"হ্যাঁ ভাই, আমার উপর দিয়ে যে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। তা'তো তোমরা জান।"

"জানি মানে? আমরা তো আপনার খুড়ীমার শ্রাদ্ধে ভুরিভোজও করে এসেছিলাম। তখন আপনি শ্রাদ্ধের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বৌদিকে বলে চলে এসেছিলাম। তিনি খুব যত্ন করেছেন আমাদের। এমন রত্নের মর্য্যাদা মৃন্ময়দা দিলেন না।"

"থাক্, ভাই এসব আলোচনা। আজ আমি এসব পারিবারিক শোক দুঃখ ভুলে থাকবার জন্যই এখানে এসেছি।

তোমাদের রাজনীতির কথা বল কিছু শুনি।"

রজনী বল্লে "রাজনীতির কথা কি বলব বলুন? পশ্চিমের অত্যাধুনিক সভ্য দেশ যুক্তরাষ্ট্রের দিকে আজ পৃথিবীর দৃষ্টি। ভাবছি ঐ দেশের পরিণতি কি হবে?

ব্ল্যাক মুসলীম নেতা ম্যালকম এক্সকে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৩ সনে প্রেসিডেন্ট জন কেনেডীকে হত্যা করা হোল। সেই মৃত্যু রহস্য আজও অন্ধকারে। দোষী বুক ফুলিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ষড়যন্ত্র চাপা পড়ে গেল। শোনা যায় এই ষড়যন্ত্র লুকাবাব জন্যও বহু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। দুর্জ্জনেরা বলে সি, আই, এ-ই নাকি জন কেনেডীকে হত্যা কবিয়েছে।

তারপব এই সেদিন নিগ্রো নেতা নবেল পুবস্কাব অধিকারী কিং মার্টিন লুথারকে হত্যা কবা হোল। সেই রহস্য উদ্ঘাটিত হবার পূর্বেই আবাব সেনেটাব ববার্ট কেনেডী,--কেনেডী পবিবারেব তৃতীয় পুত্রও বাজনৈতিব বলি হল। এব ষড়যন্ত্র বহস্যও অপর দুটিব মত চাপা পড়বে।

ভাবছি ধর্ম ওদেশে নেই জানি। কিন্তু ভগবানও কি ঐ দেশকে ভুলে গেছেন? নতুবা তাঁর দৃষ্টিতে এত অনাসৃষ্টি কি করে সম্ভব?”

“ভগবান কাউকেই ভোলেননি। সময়ে ঐ দেশের পরিণতি তোমরা দেখবে। কোন দেশই অনাচার, ব্যাভিচারকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ রাজত্ব চালাতে পাবে না। এরাও পাববে না।”

চপলাকান্ত বলে “আমেবিকানবা কেবল নিজেব দেশের সৎ সাধু সজ্জনকে হত্যা করেই সন্তুষ্ট নয়। পৃথিবী ব্যাপী একটা অরাজকতা সৃষ্টি, সর্বত্র দ্বিতীয় ভিয়েৎনাম সৃষ্টিতে তৎপব। গৃহবিবাদ বাধাতে তাদের মত ওস্তাদ বোধ হয় কোন জাত নয়।”

মহেন্দ্র উত্তর দিল “হবে না কেন তাই বলুন? দেশে দেশে যুদ্ধ না হলে যে তাদের যুদ্ধাস্ত্র বিক্রী হবে না। তাই একদিকে তারা যেমন যুদ্ধের নানারকম অস্ত্র তৈরীতে তৎপব, তেমনি অন্যদিকে এই যুদ্ধাস্ত্রকে কাজে লাগাবার জন্য গৃহযুদ্ধ সৃষ্টিতেও তৎপব। যে দেশে এই আমেরিকা জাতি অনুপ্রবেশ কবেছে, সেই দেশের শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে এবং হবেই।”

হিমাংশু উত্তর দিল “কথাটা সত্য। গ্রীসেব সামরিক নেতৃত্বের

ক্ষমতা দখল ব্যাপারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে তা আমেরিকার বিভিন্ন পত্র পত্রিকাও ইঙ্গিত করেছে।

'গ্রীসের সামরিক অভ্যুত্থান ও গণতন্ত্র হত্যার ঘটনা পৃথিবীর কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে শাসনগোষ্ঠী ক্ষমতা হারাবার সম্ভাবনা দেখলে ঐ রকম চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইতিহাসে তার একাধিক প্রমাণ আছে। গ্রীক রাজা কনস্টেন্টাইন ও বর্ত্তমান সামরিক গোষ্ঠী উভয়েরই মধ্যে রয়েছে গণতন্ত্র হত্যার লালসাবৃত্তি। তবু সামরিক গোষ্ঠী রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করল কেন? সম্ভবতঃ কোন্ পথে এই হত্যার কাজ সমাপ্ত করা হবে—সেই সম্পর্কে মতদ্বৈধ হয়েছিল। হয়ত মার্কিন প্রভুর সমর্থন ছিল সামরিক গোষ্ঠীর পিছনে। মদৎ জুগিয়েছিল সি, আই, এ। তা না হলে এত অল্প সময়ের মধ্যে গ্রীক নাটকের এই পরিণতি সম্ভব হল কি করে?"

অলক বল্লে—"ঠিক বলেছেন হিমাংশুদা। এই দেখুন না ভারতকে নিয়ে 'সিয় র' কত মাথা ব্যথা!

'ভারতের চতুর্থ নির্বাচনের পর ১৭টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৯টি রাষ্ট্রে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস পার্টি বিচলিত হয়ে পড়ে। বিষণ্ণতার ছাপ এসে পড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাবেদারী রাষ্ট্রগুলির উপর। ষড়যন্ত্র চলে এই অকংগ্রেসী সরকারগুলির উৎখাত করার। উদ্দেশ্যও তাদের সিদ্ধ হয়। টাকার খেলায় দল ভাঙ্গাভাঙ্গির রঙ্গমঞ্চে সংখ্যালঘু দল কংগ্রেস সমর্থনে মন্ত্রীত্ব লাভ করে। এরা গায়ে পরেছে গণতন্ত্রের নামাবলী। আর বারে বারে সাহায্য নিচ্ছে সামরিক বাহিনীর। এখানকার গণতান্ত্রিক মানুষদের হত্যা করে নিজেদের শাসন ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য গ্রীক্ রাজার মতই সংবিধানকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলবে। হয়ত সেই দিন আর বেশী দূরে নেই। ইতিমধ্যে সংবিধানকে ধূলিসাৎ করে কেন্দ্রীয় সরকার অকংগ্রেসী রাষ্ট্রগুলিতে যথেচ্ছা চালাচ্ছে। এইভাবেই ভিয়েৎনাম ও ভারতকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে

দিচ্ছে নেপথ্যে অন্য একটি রাষ্ট্র—যার তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় অকংগ্রেসী রাজ্যগুলিকে গদীচ্যুত করার জন্য নানা ষড়যন্ত্রে।"

বাসুদেব বলে "সামরিক গোষ্ঠী শাসিত গ্রীক এমন একটি জায়গা, সেখানকার শাসন শক্তির বর্বরতাকে একমাত্র নাৎসী জার্মানীর হিংস্রতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এবং তার পরিণতি হয়ত ইউরোপীয় ভিয়েৎনাম। গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী জর্জ্জ পাপেনক্রর পুত্র আন্দ্রিয়াম পাপেনক্রু এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে গ্রীস এখন এক সামরিক গুণ্ডা দলের দ্বারা শাসিত হচ্ছে।'

'নাৎসী আমলের পর ইউরোপে এমন হিংস্র শাসন ব্যবস্থা আর কখনও ঘটেনি। কিছুদিন আগে একজন বিশিষ্ট গ্রীক মহিলা ওয়াশিংটনের জাতীয় গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সমক্ষে বলেছিলেন যে—গ্রীক যদি তার মুক্তি অর্জ্জনে কোনও মিত্রশক্তির সাহায্য না পায়, তা হলে তাকে সশস্ত্র প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হতে হবে, যা আমাদের পক্ষে, ইউরোপের পক্ষে এবং আপনাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর। সে প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব নিতে চেষ্টা করবে কমিউনিষ্টরা এবং তখন চীৎকার উঠবে—'গ্রীসকে কমিউনিজম থেকে বাঁচাও।' যার ফলে ইউরোপে পূর্ণাঙ্গ ভিয়েৎনামের উদ্ভব ঘটবে।

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র আমেরিকার সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাহায্যে পুষ্ট বর্ত্তমান গ্রীস--এই ভয়ঙ্কর গ্রীস।"

হিমাংশু বলে—"থাইল্যাণ্ডে ১৯৪৭ সন হতে ১৯৫৭ সালের মধ্যে দুইবার ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে।

'এই অঞ্চলে যে সমস্ত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে তার সবগুলির পেছনেই মার্কিন ও পশ্চিমী সাহায্য ছিল। এরা অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে দেশের চরম দক্ষিণপন্থী সামরিক নেতাদের ক্রয় করে ফেলে এবং তাদের সাহায্যেই সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।'

'ভিয়েৎনাম যুদ্ধে থাইল্যাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতন অংশীদার এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সামরিক সংস্থা "সিয়াটোর" অন্যতম সদস্য।'

'একদিকে যেমন থাইল্যাণ্ডের নেতৃবৃন্দের এক অংশ কম্যুনিস্ট বিরোধী জেহাদে লিপ্ত, অন্যদিকে তেমনি দেশের জনগণের অপরাংশ কম্যুনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত। কিছুদিন হল কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে থাইল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক জনসাধারণ সামরিক চক্রকে উৎখাত করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। প্রধানতঃ ভিয়েৎনাম যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই এই গণ জাগরণের সূত্রপাত।

ভিয়েৎনামের ব্যাপারে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বেশীর ভাগ দেশেই মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি দূর প্রাচ্যের জাপান সরকারও সরাসরি ভিয়েৎনামে সৈন্য পাঠাতে সাহসী হননি।'

'থাইল্যাণ্ড সরকার ভিয়েৎনামের অসামরিক জনগণকে হত্যার জন্য মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে হাত মেলানোর ফলেই দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। দেশ বিদেশে অবশ্য এই বিক্ষোভকে একান্তই কম্যুনিস্ট বিদ্রোহ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যদিও আসলে ব্যাপারটা হল থাইল্যাণ্ডের জনগণ গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছেন এবং তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল বর্ত্তমান সরকারকে গদীচ্যুত করা। থাইল্যাণ্ডের ৭১টি প্রদেশের মধ্যে প্রায় ৪০টি প্রদেশে গেরিলা বাহিনী সংগঠিত হয়েছে। এবং এই বাহিনী সামরিক বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে।'

কম্যুনিস্ট গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই শিক্ষাদানের জন্য মার্কিন সরকার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। থাই সরকার গ্রামের পুলিশবাহিনীর হাতে ভারী অস্ত্র দিয়েছে—যাতে তারা গেরিলা বাহিনীকে পরাভূত করতে পারে। মার্কিন দেশ হতে বহু বিশেষজ্ঞ আমদানী করা হয়েছে। এরা গেরিলা দমন যুদ্ধ শিক্ষা দেবে।

লাওস ও ক্যাম্বোডিয়ার সীমান্তে অবস্থিত অরণ্য ঘাঁটিগুলি হতে রোজই সরকারী সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। অবস্থাটা অনেকটা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম যুদ্ধের প্রথম দিককার মত। গেরিলা বাহিনী পুরোপুরি লড়াইয়ে নেমে পড়লেই দেশের মধ্যে

স্পষ্টতঃ দুটি ভাগেব সৃষ্টি হবে। একভাগ মার্কিন সামরিক বাহিনীর সাহায্য পরিপুষ্ট থাই সরকার বাহিনীর কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। অন্য ভাগ চলে যাবে গেরিলা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। তারপর ভিয়েৎনামের মত এখানেও একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ঘাঁটি তৈরী হবে।”

কিরীটি বল্লে “উত্তর কোরিয়াতেও ভিয়েৎনামের দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলবার ব্যবস্থা করা হবে বলে মনে হচ্ছে।”

হিমাংশু বল্লে “আমেরিকার মত ক্ষমতা লিপ্সু চীনও ব্রহ্মদেশে দ্বিতীয় ভিয়েৎনাম ফ্রন্ট খুলবার অপচেষ্টা করছে। 'এই দুই জাত পৃথিবীর শান্তি কেড়ে নিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া, কেনিযা, নেপাল, হংকং প্রভৃতি আফ্রোএশীয় দেশগুলো হতে চীনকে তার 'উগ্রনীতির উপযুক্ত শিক্ষা পেতে হয়েছে।

রাজনৈতিক সমীক্ষকদের ধারণা চীন ব্রহ্মদেশের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদের জন্য কিছুদিন হতেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। তার কারণ বর্মী কম্যুনিস্ট পার্টির শ্বেত পতাকা (হোয়াইট ফ্ল্যাগ্) দলে মাও পন্থীদের সংখ্যা গরিষ্ঠতায়ও বিদ্রোহীতা করে। শান কাচিন এবং আরাকানি সংখ্যা লঘুদের সাহায্যে চীন ওখানে দ্বিতীয় ভিয়েৎনাম সৃষ্টি করতে চায়।

ব্রহ্মের উত্তরাংশের জঙ্গল এলাকার অধিকাংশই এখন ব্রহ্মের কম্যুনিস্ট পার্টির দখলে। ঐ এলাকায় শ্বেত পতাকা দলের প্রায় দশ হাজার গেরিলা সৈন্য আছে। শুধু তাই নয়। কম্যুনিস্টরা মান্দালয়ের চারিধারে এবং রেঙ্গুনের কাছে অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামেও যেমন দিয়েম এর শাসনকালে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি ভিয়েৎকংদের দখলে ছিল, ব্রহ্মেও শ্বেত পতাকা দলের অধীনে তেমনি দুটী গ্রাম রয়েছে। ঐ সব গ্রাম ও জঙ্গলের মধ্য দিয়েই চৈনিক সাহায্য শ্বেত পতাকা দলের কাছে এসে পৌঁছাবে

আর ঐ সাহায্যের দ্বারাই ওখানে দ্বিতীয় ভিয়েৎনামের সৃষ্টি করা হবে।

চৈনিক অপকৌশলের ফলে নে উইনের সরকারকে সব রকম শান্তির আশা ছেড়ে শীঘ্রই হয়ত অস্ত্র ধরতে হবে। ফলে ইন্দোনেশিয়ার মত ব্রহ্মদেশেও হয়ত লক্ষ লোকের রক্তে মাটি লাল হয়ে উঠবে—কম্যুনিজম্ বিস্তারের আশা শূন্যেই মিলিয়ে যাবে।"

হিমাংশু দীর্ঘ অলোচনার পর অল্পক্ষণ নীরব থেকে বল্লে "গলা বড় শুকিয়ে গেছে। চা ও কিছু খাবার আনতে অর্ডার দিন।"

অলক বয়কে চায়ের অর্ডার দিয়ে বল্লে "হিমাংশুদা, আমেরিকার আকাশের সূর্য্য বোধ হয় অস্ত যাবার সময় হয়েছে। তাই নিগ্রোদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে। তাই Divide and rule policy গ্রহণ করেছে। শিক্ষিত কিছু সংখ্যক নিগ্রোকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করে তাদের আন্দোলন বন্ধ করবার অপচেষ্টা করছে।"

হিমাংশু উত্তর দিল "কিন্তু তাদের সেই আশা পূর্ণ হবে না। দেশ বা জাতি যখন একবার জাগে, তাদের আর কোন রকম 'মরফিয়া' বা 'স্লিপিং পিল' খাইয়ে ঘুম পারিয়ে রাখা যায় না। সুতরাং আমেরিকার সিয়ার জাল যা দেশে দেশে ছড়িয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি বা গৃহ বিবাদ ঘটানোর প্রচেষ্টা হচ্ছে, সে জাল ছিঁড়িবার আর বোধ হয় বেশী দেরী নেই। নিজেদের গৃহযুদ্ধ থামাতেই হয়'ত এবার আমেরিকাকে হিম্‌সিম্ খেতে হবে।

মর্টিন লুথার কিং বা রবার্ট কেনেডীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে —কিন্তু তাঁদের লক্ষ লক্ষ অনুরক্ত, শিষ্য রয়েছে—যারা এসব হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

যাক্ বিশ্বরাজনীতির প্রসঙ্গ। এবার শুনি আগামী অন্তবর্ত্তী নির্বাচনের জন্য তোমরা কতটা প্রস্তুত হচ্ছ?

অমল বলে "সত্যি কথা বলতে কি হিমাংশুদা, এবারে আর কোন

কাজে আমরা উৎসাহ পাচ্ছি না। ১৪ শরিকে গতবার যে কলহ, দ্বন্দ্ব হোল,—তার পরিণাম কি হয়েছে দেখলেন তো? তাই কারও মনে আর আস্থা নেই।"

হিমাংশু কাটলেটের খানিকটা অংশ মুখে দিয়ে বল্লে "কথাটা তুমি সত্য বলেছো। আত্মকলহেই আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। আশা করি গতবারের কার্য্যকলাপ হতে তাদের শিক্ষা হয়েছে। এবার তারা সতর্ক হবে।

উত্থান পতন রাজনীতিতে অনিবার্য্য। এজন্য ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। আমাদের এবারও জিত্‌তে হবে" বলে হিমাংশু সব সভ্যদের উদ্দেশ্যে বল্ল "কিন্তু এত অল্পে আপনারা উৎসাহ হারালে চলবে কেন? কংগ্রেসের দীর্ঘ বিশ বছর রাজত্বের তুলনায় যুক্তফ্রণ্টের অতি স্বল্প কালের শাসন কালের ফলাফল কি অধিকতর উৎসাহের সঞ্চার করে না? একবার সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলেই দেখতে পাবেন যুক্তফ্রণ্ট দেশবাসীকে প্রকৃত হতাশ করেনি।

কংগ্রেস স্বাধীনতা উত্তর একাদিক্রমে বিশ বছর শাসন কার্য্য পরিচালনা করেছে। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ স্বাধীন ভারতের যে উজ্জ্বল ছবি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছিল—সেই লক্ষ্যে কতটুকু পৌছেছে? বা কংগ্রেস কোন দিন সেই লক্ষ্যে পৌছতে পারবে কিনা—এ সমীক্ষার সময় আজ এসেছে।

সমাজতন্ত্র স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন ছিল। দেশে উচ্চনীচ ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ থাকবে না। দেশে অভাব, অনটন থাকবে না। বেকার সমস্যা থাকবে না। কালবাজারী বা এই প্রকার সমাজ-দ্রোহী বা দেশদ্রোহীদের প্রকাশ্য রাজপথে ল্যাম্প পোষ্টে ফাঁসি দেওয়া হবে।

স্বাধীন ভারতে গরীবদের স্বার্থই বেশী দেখা হবে। অবৈতনিক বাধ্যতা মূলক শিক্ষা সমস্ত ভারতবাসীর দরজায় দরজায় পৌঁছিয়ে

দেওয়া হবে। অশিক্ষিত প্রাপ্ত বয়স্কদেরও অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হবে।

গ্রাম উন্নয়নই হবে কংগ্রেসের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। গ্রামবাসীদের মনে আর ক্ষোভ থাকবে না তারা অবহেলিত, অবজ্ঞাত। গ্রামগুলির এমন উন্নতি করা হবে যে সহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না। গ্রামে বাস করেও জনসাধারণ নাগরিক সব রকম সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ বিলাস উপভোগ করতে পারবে। গ্রামে গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো, নলকূপ ইত্যাদি খনন করে রাস্তা ঘাট সংস্কার করে গ্রামের নূতন চেহারা দেওয়া হবে।

দেশে দেশে শিল্পোন্নতির দ্বারা দেশ স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে। কুটীর শিল্পগুলিকে উৎসাহিত করে গ্রামবাসীর সমৃদ্ধির পথ খুলে দেওয়া হবে।

কৃষি উন্নয়নের আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দরিদ্র কৃষকের ঘরে পৌছিয়ে কৃষি প্রধান ভারতকে উজ্জীবিত করা হবে।

অন্যান্য স্বাধীন দেশবাসীর মতই আমাদের দেশের শ্রমিক, কৃষক, মজুরদল তাদের মেহনতির বিনিময়ে সমাজে যোগ্য সমাদর পাবে। তাদের অর্থনৈতিক মান এবং জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করা হবে।

কিন্তু বস্তুতঃ কংগ্রেস এসব প্রতিশ্রুতি সফল করেছে কি? কেবল বক্তৃতাব লহরী, পরিকল্পনার বিরাট আড়ম্বর, অলীক আশ্বাসবাণী দেশ বাসীকে উপহার দেওয়া হয়েছে ১৯৪৭ সালেব ১৫ই আগষ্ট হতে আজ পর্যন্ত।

অবৈতনিক বাধ্যতা মূলক শিক্ষা প্রসারের পরিবর্ত্তে দিন দিন শিক্ষা খাতে ব্যয় সঙ্কোচন করা হচ্ছে। শিক্ষার নামে অপরিণত ছাত্র সমাজের ঘাড়ে দূর্ব্বোধ্য, কঠিন পাঠ্য সূচীর ভার চাপিয়ে তাদের অযোগ্যতা বৃদ্ধি করে,—তাদের উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। পাঠ্য সূচীকে এই নূতন ছাঁচে ঢালবার কারণই হলো—শিক্ষিত

বেকার সমস্যার এইভাবে সমাধান। অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষা পাবার যোগ্যতা মুষ্টিমেয় ভারতবাসীই কেবল পাবে।

বিশ বছর অতীত হয়েছে। সেই অনুপাতে শিল্পোন্নতির কিছুই প্রায় হয়নি। এখনও বহু ক্ষেত্রে ভারত বিদেশের মুখাপেক্ষী। বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি বিদেশ হতে বেশী মূল্যে আমদানী হচ্ছে। আর ভারতে বসে আমরা সেই সব যন্ত্রপাতি একত্রিত করে ভারতীয় শিল্পজাত জিনিষ বলে তা বাজারে চালু করছি।

কারখানা গুলির মুনাফা লুটছে মালিকেরা। দরিদ্র শ্রমিক তারা ন্যায্য শ্রমের যোগ্য পারিশ্রমিক পাচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গেলেই মালিক "লক্ আউট" ঘোষণা করে কারখানা বন্ধ করে—শ্রমিকদের পঙ্গু করে দিচ্ছে। আর কংগ্রেস সরকার মালিকদের এসব কাজে মদৎ দিচ্ছে। একদল বিশ্বাসঘাতক শ্রমিককে হাত করে অতি স্বল্প দাবী তাদের মিটিয়ে—যারা এইসব ধর্মঘটের মুখপাত্র বা নেতা ছিল—মালিক তাদের ছাটাই করে দিচ্ছে। ফলে দ্বিতীয়বার আর সেই কারখানায় রুটির জন্য শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে সাহস পাচ্ছে না। এবং মালিকদের লুঠের দরজা কণ্টক শূন্য হচ্ছে।

গ্রাম উন্নয়নের খাতে লাখে লাখে টাকা সরকারী তহবিল হতে বের হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গ্রামগুলির অবনতিই দিন দিন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পথ চলাচলের অযোগ্য। আজও ভাবতের গ্রামাঞ্চলগুলি যে তিমিরে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ছিল—সেই তিমিরেই রয়েছে মাদ্রাজে শতকরা ৫৪ শতাংশ গ্রামে, কেরালায় ৪০ শতাংশের কিছু বেশী, পাঞ্জাব ও হরিয়াণায় ২৫.৩ শতাংশ, মহীশূর ১৯.৬ শতাংশ মহারাষ্ট্র ১৬.৭৫ শতাংশ, আর হতভাগ্য পশ্চিম বাংলায় মাত্র ৩.. শতাংশ গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো এসেছে। সেখানে অন্যান্য স্বাধী দেশগুলির প্রায় প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক আলোর রশ্মি গিয়ে পৌঁছিয়েছে।

দাতব্য চিকিৎসার নামে গ্রামে কোথাও কোথাও হয়ত দুই একটি

কক্ষ যুক্ত বাড়ী আছে। কিন্তু হয় তাতে চিকিৎসার সাজ সরঞ্জাম নেই। অথবা সাজ সরঞ্জাম থাকলেও সরকারী ডাক্তার বা নার্সকে কখনও হাসপাতালে পাওয়া যায় না। তারা বাইরের বেশী ফি'র 'কলে'র প্রতি বেশী আকৃষ্ট। আর সরকারী হাসপাতালে কাজ না করেও মাসান্তে টাকাটা তারা পাবে—এটা তারা ভাল ভাবেই জানে। কারণ কংগ্রেস শাসনে প্রতি বিভাগেই তো চলেছে এমন অন্যায়ের রাজত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতা।

প্রাকৃতিক দূর্য্যোগ ও জোতদারদের চাপে পড়ে গরীব কৃষক আজ অনাহার ক্লিষ্ট। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নতির কোন ব্যবস্থাই বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চলে করা হয়নি। কিন্তু তা যদি যথার্থই করা হত,—তবে ভারতের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে রপ্তানী করে প্রচুর বিদেশী অর্থ উপার্জ্জন করা যেতো। সেই সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করেছে আমেরিকার ষড়যন্ত্র।

স্বাধীনতার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কৃষি প্রতিষ্ঠানের উন্নতির ভার যে সব নেতাদের বা অধিকর্ত্তাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল, 'সিয়া' কিনে নিলো তাদের মোটা টাকার বিনিময়ে। ফলে বিশ্বাসঘাতক দেশবাসীর চক্রান্তে শস্যশ্যামলা ভারত আজ উষর মরুভূমিতে পরিণত হতে চলেছে ও কত ক্ষেত অনাবাদী হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু কৃষি খাতে মঞ্জুরী টাকা সরকারের তহবিল হতে বেরিয়ে গিয়ে অধি-কর্ত্তাদের বা নেতাদের বা মন্ত্রীদের সমৃদ্ধ করছে। কৃষি অবহেলিত ও অবজ্ঞাত রয়েছে—যেমন বৃটিশ আমলে ছিল।

ফলে ভারত ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সমগ্র পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে হাস্যাস্পদই কেবল হচ্ছে না, ভারতভূমির ললাটে অপমানের ও অবজ্ঞার কাল তিলক এঁকে দিচ্ছে একদিকে, অন্যদিকে অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকৃষ্টতম খাদ্যশষ্য অগ্নি মূল্যে বা ধার করে কিনে ঋণের ভারে জর্জ্জরিত হয়েই কেবল পড়েনি, স্বাধীন ভারতের গলায় আবার নূতন করে পরাধীনতার শিকল পড়ছে। যেমন উত্তমর্ণ আমেরিকার

অনুশাসনে উত্তর ভিয়েৎনাম বা কিউবার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না।

উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে ভারতের প্রসিদ্ধ কুটীর শিল্পগুলি নষ্ট হতে বসেছে। সেই স্থান অধিকার করছে বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্য।

দেশের আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি চিকিৎসাও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ রাশিয়া, জাপান ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা এদেশে এসে এইসব চিকিৎসা পদ্ধতির কলা-কৌশল জেনে নিয়ে নিজ নিজ দেশে তার উন্নতি করছে।

বহু মেধাবী ভারতীয়র গবেষণার মূল্য ভারত সরকার দিচ্ছে না। ফলে আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ এইসব মেধাবী ভাবতীয়দের মোটা টাকা দিয়ে নিজের দেশে নিয়ে—তাদেব ফরমূলা কিনে নিচ্ছে। এবং এই সব ফরমূলার ফলের দ্বারা অন্যান্য দেশ হতে কোটি কোটি টাকা আমদানী করছে। যথার্থই এই কোটি কোটি টাকা কি ভারত সরকার আমদানী করতে পারতো না? কিন্তু তা ভারত সরকার করে নি বা করছে না। পরন্তু উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রদের গবেষণার সুযোগ না দিয়ে—যাদের দেওয়া হচ্ছে,—তাদের মেধার জোর নেই, আছে মামার জোর। ফলে এইসব গবেষণার ফল কোনদিনই কার্যকরী হয় না। যদি বা হয়—তা'তে সরকারের কোটি কোটি টাকা নষ্ট করে। আর অন্যান্য দেশ ভারতায় গুণীদের লুফে নিচ্ছে। ফলে এইসব মেধাবী ভারতীয়রা উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে তাদেব গুণাবলী বিকাশের সুযোগের দ্বারা সেই পরদেশের গৌরব বৃদ্ধি করছে। এবং গৌরবময় নোবেল পুরস্কারের মুকুট মাথায় দিয়ে সেই দেশেরই সম্মান বৃদ্ধি করছে। আর হতভাগ্য ভারত বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অবহেলিত তার সেই সন্তানের দিকে। যেমন নোবেল পুরস্কার অধিকারী ডাঃ হরগোবিন্দ খোরানা। কিন্তু হতভাগ্য ভারত তাদের মূল্য দিচ্ছে না শুধু নয়, যারা জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে বিদেশের মোটা অর্থের লোভেও নিজের ফরমূলা বিক্রি করছে

না,—তাদের পরিণতি হচ্ছে জীবনের ব্যর্থতার ফলে পাগল বা আত্মহত্যা অথবা অনাহারে মৃত্যু। এই কারণে ভারতীয় ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বা সোসিয়েল ওয়ার্কাররা যদি একবার বিদেশে যাবার সুযোগ পায়, তবে সেই দেশেই চাকরী নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করে থাকে। দেশে আর ফেরে না। কেন ফিরবে, দেশ যদি তাদের যোগ্য সমাদর না দেয়, তাদের ডিগ্রীর মান না রাখে ?

আজ কতিপয় 'সিয়ার' অর্থপুষ্ট নেতা বা তাদের অনুচরবৃন্দের সহায়তায় ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক কৃষ্টিও লোপ পেতে বসেছে। সেই স্থান অধিকার করেছে আমেরিকার উলঙ্গ কৃষ্টি। আমাদের দেশের যুব সম্প্রদায়কে নানাভাবে যৌনবৃত্তির দিকে আকৃষ্ট করে, তাদের মধ্যে যে স্বাদেশিকতা বোধ, সংগ্রাম মুখর প্রাণ ছিল,সেটা বন্ধ করে দিচ্ছে। দেশের কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতী আজ বিভ্রান্ত তাদের পোষাকে পরিচ্ছদে, আচার ব্যবহারে, রুচিতে।

এইভাবে কংগ্রেস দলের তথাকথিত কয়েকজন 'সিয়ার' অর্থপুষ্ট নেতা—ভারতকে ঠেলে দিচ্ছে কোন পঙ্কে ? একবার ভেবে দেখুন এই বিশ বছরে আমাদের কতটা পতন হয়েছে।

অথচ এই বিশ বছর সময় কিছু কম নয়, জাপান, জার্ম্মানী, চীন —এরা প্রত্যেকটি রাষ্ট্র নিজের দেশের বড় বড় যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের উপর আবার পূর্ণোদ্যমে জাতির ও দেশের উন্নতির সৌধ নির্ম্মাণ করে নাই কি ? আবার তারা আর দশটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মত মাথা তুলে দাঁড়ায়নি কি বিপর্য্যয়ের ঘোর মেঘ কাটিয়ে ?

কিন্তু অনায়াস লব্ধ স্বাধীনতাই তো ভারতের বিপর্য্যয় ডেকে এনেছে কংগ্রেস সরকারের ভুল 'পলিসি' ও কতিপয় 'সিয়ার' অনুগৃহীত নেতা। ভারতের মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, দরিদ্র ভারতবাসীর অবস্থা দিন দিনই দরিদ্রতম হয়েছে এই বিশ বছরে। আর মুষ্টিমেয় তথা কথিত আধুনিক নেতা যাঁদের প্রাক্ স্বাধীনতায় কেউ নামও শোনেনি, তাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়ছে জোয়ারের জলের মত। আজ স্বাধীনতা

আন্দোলন সংগ্রামের নেতারা বেশীর ভাগই নেই। যাঁরা এখনো জীবিত আছেন, তাঁরা অনেকেই কোণ ঠাসা হয়ে পড়ে আছেন। ভারতের নেতৃত্ব কেড়ে নিয়েছে একদল স্বার্থপর দেশদ্রোহী। যারা নিজের স্বার্থের জন্য জন্মভূমিকে বিকিয়ে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করছে না।

দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বা পররাষ্ট্র নীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেস শাসনের "এচিভমেণ্টের" এই তো খতিয়ান।

এই দীর্ঘ বিশ বছর কংগ্রেস কুশাসনের বা অপশাসনের ফলে অনেকগুলি Frankenstein এর জন্ম হয়েছে। যেমন—কালোবাজার, মুনাফাখোর, মজুতদার ইত্যাদি। একটি Frankenstein-এর ভারে স্থষ্টি কর্ত্তাকে হিমসিম খেতে হয়। আর এতগুলি Frankensteinকে কংগ্রেস সামলাবে কি করে?

কংগ্রেসের ২০।২১ বছর শাসনের পাশে যুক্তফ্রণ্টের ৯॥ মাস শাসনের খতিয়ান যদি দেখা যায়, তবে দেখবেন এই স্বল্প সময়ে এই অকংগ্রেসী সরকারের দেশসেবার প্রয়াস কিছু উপেক্ষার নয়।

প্রথমেই দেখুন যুক্তফ্রন্ট সরকার গৃহহীন কৃষকদের জমি পাইয়ে দিয়েছে। পল্লী অঞ্চলে সেচের জল ও চাষের সার সরবরাহ বৃদ্ধি করেছে, বস্তীর কর ভার হ্রাস করেছে। সরকারী জমি বিলি করেছে।

হাজার হাজার অস্থায়ী কর্মচারীকে স্থায়ী করেছে। সর্বস্তরের সরকারী কর্মচারীর মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধি করেছে। সর্বস্তরের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের ভাতা ও বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে। সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা ইত্যাদির পুনর্বিন্যাসের জন্য পে-কমিশন গঠন করেছে।

নিরাপত্তা আইনের অবসান ঘটিয়েছে এবং ঐ আইনে ধৃত সকলকে মুক্তি দিয়েছে। খাদ্য আন্দোলনের মামলা ও ছাত্র বিক্ষোভ সংক্রান্ত সব মামলা প্রত্যাহার করেছে।

রাজ্য সরকার ও রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বরখাস্ত শত শত কর্মীকে

পূনর্বহাল করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পুলিশের হস্তক্ষেপ বন্ধ করেছে। সরকারী কর্মচারীদের সংগঠিত হবার অধিকার দান করেছে।

বর্গাদারদের বে-আইনী উচ্ছেদের প্রতিকার করেছে। প্রশাসনিক গাফিলতি দূর করবার কতকগুলো ব্যবস্থা করেছে।

কতকগুলি শিল্পে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করেছে। তাঁত শিল্পীদের সুবিধা করেছে। ক্ষুদ্র শিল্পীকে সাহায্য দান করেছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার করেছে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রকল্প রচনা করেছে। বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের চেষ্টা করেছে, খাদ্য সমস্যার দ্রুত সমাধানের কার্য্যক্রমও নিতে ছিল।

খরা অঞ্চলে বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, প্রভৃতি খরাক্লিষ্ট জেলায় লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা করেছে।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার ৯॥ মাসে এতগুলি কাজ করেছে। কেবল মাত্র কৃষক, শিক্ষক, কর্মচারী বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থই এই সরকার দেখেনি। ট্রাম কোম্পানী ও ন্যাশান্যাল মেডিকেল কলেজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছে।

বৃটিশ রাজত্বের সময় হতে বিধান সভার চারদিক জনসাধারণের আঁওতার বাইরে ছিল। কংগ্রেস শাসনেও ১৪৪ ধারা জারি করে বিধান সভা হলকে একটি দূর্ভেদ্য দূর্গ করে রেখেছিল। কংগ্রেস শাসনে নামেই আমরা স্বাধীন বা স্বাধীনতার কোন কিছুই উপলব্ধি করতে পারিনি। যুক্তফ্রণ্ট সরকারই বিধান সভার চারিদিকের ব্যূহ ভেদ করার অধিকার জনসাধারণকে দিয়েছে।

ছোট বড় আরও অনেক কাজই যুক্তফ্রণ্ট সরকার করেছে—যা আপনাদের অজানা নেই। সুতরাং আপনারা তাদের গৃহবিবাদকে বড় করে না দেখে—যথার্থ ই সমালোচকের দৃষ্টিতে কংগ্রেস শাসন ও যুক্তফ্রণ্ট শাসনের বিচার করুন। শুধু তাই নয়। এই অকংগ্রেসী

সরকারকে গদিচ্যুত করতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনের সুরু হতে যে বিভিন্ন দল, প্রতিষ্ঠানের ষড়যন্ত্র চলেছিল—তা আপনাদের সবারই জানা আছে। অতি দ্রুত এবং কৌশলে যুক্তফ্রন্ট সরকার সেই সব পরিস্থিতি আয়ত্বের মধ্যে এনেছিল। নতুবা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গদিচ্যুত করতে যে আগুন জ্বালানো হয়েছিল বারে বারে—সেই সব গুপ্ত ঘাতকদের অভিষ্ট যদি ব্যর্থ করা সম্ভব না হত,—তবে বাংলা দেশ সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার দাবানলে ভষ্মীভূত হয়ে যেতো।

দীর্ঘ ২০।২১ বছর পর আজ আমরা কি দেখছি? সঙ্কট। চারিদিকে জীবন ধারণের সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে দেখা দিয়েছে। রুটি ও অন্নের সঙ্কটে ভারতের জনসাধারণের জীবন বিড়ম্বিত। কোটি কোটি মানুষের উদরে জ্বলছে ক্ষুধার অগ্নি। ভারতের জনসাধারণের মাথার আচ্ছাদনের জন্য নেই কোন ছাউনি, পরিধেয় বস্ত্র শতছিন্ন। ভারতের শিশু রুগ্ন, পঙ্গু, মৃতপ্রায়। ভারতের কিশোর যুবক সম্প্রদায় আজ পথভ্রষ্ট। প্রবীণ বিভ্রান্ত! বৃদ্ধ হতবাক্। এটাই কংগ্রেস শাসনের প্রকৃত ছবি নয় কি?

এই দু'টো শাসকদলের নিজ নিজ "এচিভমেণ্টের" ফর্দ্দ আপনাদের সামনে রাখলাম। এখন আপনারা বিচার করে নিজেদের রায় দেবেন। আর একটি কথা না বল্লে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হবে না।

কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত কোন জাতির জীবন সুন্দর ও সুস্থ হতে পারে না এবং দেশের দরিদ্র, বেকারী ও নিরক্ষরতা দূর হতে পারে না। অর্থ-নৈতিক স্বয়ং সম্পূর্ণতা বা স্বাধীনতা ছাড়া কোন জাতি নিজের পায়ের উপর শক্ত ভাবে দাঁড়াতে পারে না। পরের কাঁধে ভর দিয়ে মানুষ অধিককাল দাঁড়াতে পারে না। তাই ঋণের বোঝায় ভারত আজ ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে গর্ব করবার কিছু

নেই। দায়মুক্ত, ঋণমুক্ত হতে না পারলে ভারতের উন্নতি সুদূর পরাহত।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ আমাদের লক্ষ্য। অর্থনীতি ও যোজনা সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করতে হবে। পঞ্চবার্ষিক এই সমস্ত পরিকল্পনার দ্বারা আমরা ভারতের সম্পদ ও শক্তিকে বিজ্ঞান সম্মত পন্থায় আহরণ করে আমাদের জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করবো। বিজ্ঞান, কারিগরি শিক্ষা ও শ্রম শিল্পায়নের দ্বারা আমরা বলিষ্ঠতর জাতীয় জীবন গঠনের জন্য ব্রত গ্রহণ করব। সমস্ত দেশে শিক্ষা বিস্তার ও গবেষণাগার প্রসারের জন্য আমরা চেষ্টা করব,—এই হবে আমাদের প্রকৃত দেশপ্রেম এবং প্রকৃত মাতৃপুজা!

আমাদের আর একটি দারিদ্র্য আমাকে নির্মমভাবে আঘাত করে। সেইটি হচ্ছে সত্যিকারের দেশাত্মবোধের অভাব। আমরা কি সত্যিই আমাদের দেশকে ভালবাসি? সত্যিই কি আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে ভালবাসি? যতদিন আমাদের মধ্যে সত্যি-কারের দেশাত্মবোধ না জাগবে, ততদিন কোন দলই—কংগ্রেসী বা অকংগ্রেসী এ দেশের সুশাসক হতে পারবে না।

আমাদের দেশের কৃষ্টি, আমাদের দেশের ঐতিহ্য, আমাদের দেশের ইতিহাস,—অন্য দেশের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্য দেশের বুলি কবচিয়ে, অর্থনীতি নিংড়িয়ে,—আমাদের দেশের রাজনীতির রূপ দিতে যাওয়া ভ্রান্ত পথে চলা। আমরা তো অন্য কোন দেশ হতে কোন অংশে হীন নই। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শৌর্য্যে, বীর্যে, সাহসে আমরা কারুর চেয়ে কম নই। আমাদের পরানুকরণ মোহই আমাদের খাট করে রেখেছে। এই অনুকরণ প্রিয়তার অভ্যাস আমাদেব ঝেড়ে ফেল্‌তে হবে এবং নিতে হবে The urge for discovery and invention and the vow—"Do or Die".

আমাদেব পূর্বপুরুষ রাজা রামমোহন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঋষি অরবিন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, মাইকেল

মধুসূদন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষ—কি ধর্ম, কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে, কি দর্শনে কি রাজনীতিতে এক একজন দিক্‌পাল ছিলেন। আমরা তাঁদের উত্তরপুরুষ এবং তাঁদের উজ্জ্বল প্রতিভার উত্তরাধিকারী। আমরা কেন পরমুখাপেক্ষী হবো? তাঁদের প্রদীপ্ত প্রতিভা আমাদের জীবনে কেন ম্লান হতে দেবো?

আমরা দেশকে ভালবাসি। দেশবাসীকে ভালবাসি। আর ভালবাসি আমাদের স্বাধীনতাকে। আমরা দেশের উপযুক্ত ছাঁচে রাষ্ট্রনীতি ঢেলে সাজাবো যাতে দেশে কোন প্রকারের ভেদাভেদ থাক্‌বে না; মানুষ মাত্রেই মানুষের মর্যাদা পাবে। এবং তার এক মাত্র পরিচয় হবে সে আমাদের দেশের লোক, সে আমাদের ভাই, সে ভারতবাসী। এইভাবেই প্রকৃত সমাজতন্ত্র আমরা গড়তে পারবো।”

সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত হিমাংশুর কথা শুনছিল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে হিমাংশু চেয়ার হতে উঠে বল্ল “এবার আমি উঠি। কাকাবাবুর শরীর ভাল না। আমার দেরী হলে উনি আজকাল বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।”

৩১

চন্দ্রিকা কলকাতার উপকণ্ঠে একটা কালী মন্দিরে এসেছিল। ছোট্ট কাল কষ্টি পাথরের কালী মূর্ত্তিটি চন্দ্রিকার ভারী ভাল লাগে।

এটা এখনও বারোয়ারী মন্দিরে পরিণত হয়নি। তাই জন সমাগম এতে কম। এই মন্দিরটা ছিল আদি কলকাতার এক জমিদারের। তারই বংশধররা পুরুষানুক্রমে এখনও এই মন্দিরে পূজা অর্চনা করে আসছে।

মন্দিরের দুইপাশে ১২টি শিবলিঙ্গের মন্দিরও আছে। আনুমানিক ৪০০।৫০০ বছরের পুরানো এই মন্দির। জমিদারের জমিদারী আজ আর নেই। কোন রকমে নিজেদের চলে যায়। মন্দিরের পূজা দেবীর অনুগ্রহেই হয়। জাগ্রত দেবীর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে কিছু ধনী মাড়োয়ারীর উপর। তারই ফলে পূজার ব্যয় ভার বহন করে তারা। তাছাড়া পাড়া-প্রতিবেশীরাও কেউ কেউ এখানে পূজা দিতে আসে। এইভাবেই মা কালী তাঁর নিজের পূজা নিজেই যোগাড় করে থাকেন!

ধনীর মন্দিরের মত বাহ্যিক আড়ম্বর এই মন্দিরে নেই। চারিদিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোন গৃহস্থ বাড়ীর সংলগ্ন বর্হিভাগে এই মন্দির। মন্দিরের প্রাচীনত্বর নিদর্শন স্বরূপ শিব মন্দিরগুলির প্রাচীর গাত্র ভেদ করে অশ্বত্থ গাছ মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

চন্দ্রিকার মন যখন সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে—সে তখন এই কালী মন্দিরে এসে দেবীর সামনে শান্ত চিত্তে খানিকক্ষণ বসে থাকে। বসে বসে তার মনে জাগে অতীতের কত মধুর স্মৃতি—যা আজও মূর্ত্ত হয়ে রয়েছে তার মনে। কিন্তু এই স্মৃতিকে সম্বল করে তো সে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভেলায় চলতে পারে না। পরন্তু সে চায় অতীতকে ভুলে যেতে।

যে মৃন্ময় একদিন তাকে প্রাণের অধিক ভালবেসেছিল, তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে যে মৃন্ময় সর্বদা তাকে উৎসাহিত করেছে, দেশ যার কাছে প্রাণাধিক ছিল, আজ সেই মৃন্ময় তার সেই জন্মভূমিকে 'সিয়ার' মাধ্যমে পরের কাছে বিলিয়ে দিতে সহায়তা করছে।

যে মৃন্ময় একদিন তার মা বাবাকে দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করত, সেই মৃন্ময় আজ একই দেশে বসবাস করে মা'র রোগে একবার তাঁকে দেখতে আসেনি, এমন কি তাঁর শেষকৃত্যও সম্পন্ন করেনি। এমন কি তাঁর শ্রাদ্ধও করেনি। পরন্তু পরোক্ষে সেই তার মার মৃত্যুর কারণ। মৃণালকে তাঁর বুক হতে ছিনিয়ে নিয়ে সে তাঁকে নিদারুণ আঘাত দেয়। যার পরিণামে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। মৃন্ময়ের নির্মম ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কিশোর মৃণাল নরহত্যা করে। এ আঘাত তিনি সহ্য করতে না পেরে চলে গেলেন।

চন্দ্রিকা ভেবেছিল মৃণালের অপরাধ মৃন্ময়ের মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন আনবে। কিন্তু এখন সে জানছে ফল উল্টো হয়েছে। মৃন্ময়ের মধ্যে কোন প্রকার অনুতাপ বা অনুশোচনা তো আসেইনি—পরন্তু মৃন্ময় যত্রতত্র বলে বেড়াচ্ছে মৃণালকে সে মার কাছে মানুষ করতে এত বছর রেখে ভুল করেছে। অতি প্রশ্রয় ও আদরে তার এত অধঃপতন সম্ভব হয়েছে। যদি সে নিজের কাছে রেখে মানুষ করতো,—তবে কখনই মৃণালের এই পরিণতি সম্ভব হোত না। মার মৃত্যুতেও তার এতটুকু অনুশোচনা নেই। পরন্তু হিমাংশুর কাছে চন্দ্রিকা শুনেছে মৃন্ময় নাকি মৃণালের পরিণতির সংবাদে মার মৃত্যুসংবাদ শুনে উপহাস করে বন্ধু মহলে বলে বেড়াচ্ছে—"এ আর কিছু নয়—আদিখ্যেতা"।

চন্দ্রিকা ভাবে একই মানুষের একই জীবনে কত পরিবর্ত্তন সম্ভব। তাই আজকের মৃন্ময়ের মধ্যে চন্দ্রিকা যে মৃন্ময়কে ভালবেসে বিয়ে করেছিল—তার বিন্দুমাত্র মিল খুজে পাচ্ছে না। মৃন্ময়ের জীবনে

এই পরিবর্ত্তন কি করে সম্ভব হল? তবে কি চম্পা তাকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার আঘাতই তাকে এমন নির্মম করে দিয়েছে। কিন্তু যতটুকু খবরাখবর চন্দ্রিকা মৃন্ময় ও চম্পার দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে জেনেছে তা'তে কেউই সুখী হতে পারেনি। চম্পার অত্যাধুনিক মন মৃন্ময়ের সংস্কারগ্রস্ত মনকে ভালবাসতে পারেনি। মৃন্ময়ের কর্ত্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে চম্পার স্বেচ্ছারিতা মৃন্ময় সহ্য করতে পারেনি। তাই আধুনিক যুগে নেহাৎ পারিবারিক ঠাঁট বজায় রাখতে এই কয়টি বছর উভয়ে এক বাড়ীতে বসবাস করেছে।

মৃণালের প্রতি মৃন্ময়ের ছিল না কোন আকর্ষণ বা স্নেহ। এই কারণেই মৃণালের এই পরিণতি সম্ভব হয়েছে। প্রেমের মাধ্যমে যে শিশুর জন্ম হয় না,—তার পরিণাম এমনি ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। এখনও স্নেহের পরশে হয়ত কিশোর মৃণালের চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটানো সম্ভব হোত। কিন্তু মৃন্ময়ের সে দিকে দৃষ্টি নাই। তার দৃষ্টি কিভাবে সে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়াবে। গণ্যমান্য দশের একজন সে কি ভাবে হতে পারবে—তা সে যে কোন উপায়েই হোক্ না কেন?

সুতারার মৃত্যুতে সমরবাবুর মধ্যে এক বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা গিয়েছে। তিনি যেন কেমন আপনাতে আপনি ডুবে গেছেন। বাহ্যিক কোন কিছুতেই আর তাঁর আগ্রহ, উৎসাহ বা কৌতূহল নেই। সংসারে বা দেশে কি ঘটে যাচ্ছে—সে দিকে তাঁর দৃকপাত নেই। রাতদিন তিনি ধর্মপুস্তকের মধ্যে ডুবে থাকেন। পার্থিব বা সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁর কোন পরামর্শের জন্য গেলে তিনি নির্লিপ্ত ভাবে উত্তর দেন্ "তোমরা যা ভাল বোঝ—তাই করো। আমায় আর এর মধ্যে টানাটানি করো না। সংসারের অনেক ঝড়ই বয়েছি। এখন আর কোন ঝড় বইবার মত শক্তি ভগবান এই বৃদ্ধাবস্থায় রাখেননি। নৌকা আমার পাড়ে পৌছাতে বেশী দেরী নেই। এর মধ্যে আর আমায় পিছু ডেকো না।"

চন্দ্রিকা ভাবে সুতারার মৃত্যু বেদনাই সমরবাবুকে এমন উদাসীন

করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই মৃত্যু সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বলেছেন—"মৃত্যু যেন তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া—যারা তীরে দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাটুকু যে রইল, এবং যে গেল উভয়েই ভুলে যাবে ; হয়তো এতক্ষণে অনেকটা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বেদনাটুকু ক্ষণিক, এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী ; কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্যি। বিস্মৃতি সত্য নয় ; এক একটা বিচ্ছেদ ও এক একটা মৃত্যুর সময় মানুষ সহসা জানতে পারে এই ব্যথাটা কী ভয়ঙ্কর সত্য ! জানতে পারে যে, মানুষ কেবল ভ্রমক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকে। কেউ থাকে না এবং সেইটে মনে করলে মানুষ আরো ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কেবল, যে থাকবে না তা নয়, কারো মনেও থাকবে না।"

মৃত্যু অনিবার্য্য। এই সত্য উপলব্ধি করেই মানুষ প্রতিদিন প্রতিক্ষণে প্রতি পলে নিজেকে মৃত্যুর গহ্বরে অজান্তে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবার মত বেদনা আর নেই। তাই মানুষ বংশরক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। বংশানুক্রমিক নিজেকে মানুষ উত্তর পুরুষদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখে। ভাগ্যের ক্রীড়নক মানুষ। যে কোন মুহূর্তে ভাগ্যের পরিহাসে এই পৃথিবী হতে মানুষ মুছে যেতে পারে। এই জন্য মানুষ অবিশ্রান্ত বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করছে। বৈজ্ঞানিক নিত্য নূতন গবেষণার মাধ্যমে সৃষ্টি রহস্য ভেদ করে—মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়াবার জন্য করছে অবিরত সংগ্রাম। শিল্পী তার শিল্পের মধ্যে অমর হয়ে থাকতে চায়। সাহিত্যিক তার সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে বেচে থাকার প্রয়াস। সাম্রাজ্য, সভ্যতা, সামাজিক জীবন, বিজ্ঞান এদের মাধ্যমে সবাই বাঁচতে চায়। মানুষেব এই চিরন্তন ব্াঁচার অনন্ত পিপাসাই মানুষকে খ্যাতির দিকে, যশের দিকে, বংশ রক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে !

মানুষ এই পৃথিবীর পান্থশালার পথিক মাত্র। প্রয়োজন মিটে

গেলে মানুষ যেমন পান্থশালা ত্যাগ করে আপন গন্তব্যস্থলে যায়, তেমনি আত্মা এই তুনিয়ার হিসাব নিকাশ শেষ করে অদৃশ্য শক্তির নির্দ্দেশে চির সুন্দরের তথা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এই তুনিয়ার পান্থশালা ত্যাগ করে যায়।

(মানুষ জানে এই তুনিয়ায় সে স্থায়ীভাবে থাকবে না। জীবনের কেনা বেচার হাট হতে একদিন তাকে বিদায় নিতেই হবে। তবু ক্ষণভঙ্গুর এই জীবনের প্রতি মানুষের কত মায়া! এই পান্থশালাকে সাজাবার কত প্রয়াস। এই জীবনকে মানুষ ভুলতে পারে না। ভুলতে চায় না বা অপরেও যে তাকে ভুলে যাক্‌—তাও সে চায় না। তাই সৃষ্টির মধ্যেই মানুষ চিরন্তন অমরত্ব লাভ প্রয়াসী। তাই অন্তরাত্মার উপলব্ধির বহি প্রকাশের রূপ দেবার জন্য মানুষ ব্যাকুল।

জীবন অর্থই তুঃখ পরিপূর্ণ যন্ত্রণা জর্জর পথের ক্লেশ। তবু মানুষের এই জীবনের প্রতি কি অনন্ত পিপাসা। বেঁচে থাকার সব ক্লেশ, সব জ্বালা,যন্ত্রণা, তুঃখ সহ্য করেও সে চায় এই ভব সংসারে টিকে থাকতে। এই মর্ত্তালোক হ'তে চির বিদায় নিতে হবে—এই চিন্তাও যেন ভোগী মানুষের কাছে তুঃসহ হয়ে উঠে, পীড়াদায়ক হয়ে উঠে। তাই অনিবার্য্য পরিণতির দিকে মানুষ যতই এগিয়ে যায়—বেঁচে থাকবার দূর্বার প্রেরণা তাকে নব নব সৃষ্টিতে প্রলুব্ধ করে। সৃষ্টির আনন্দে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়। তাই এই জগতে হাজার তুঃখ পেলেও মানুষ এই জাগতিক তুঃখ হতে অব্যাহতি পেতে চায় না। মানুষের মধ্যে আছে এক বিচিত্র তুঃখাসক্তি।

মানুষের অতৃপ্ত বাসনাই তার তুঃখপূর্ণ জগতে জন্মান্তর লাভের কারণ। কিন্তু এই অতৃপ্ত বাসনাই মানুষের মনে বিতৃষ্ণা জাগায়—তখনই মানুষের মধ্যে দেখা দেয় বৈরাগ্য। মানুষ তখন মোক্ষ লাভের জন্য, চিরসুন্দরের সঙ্গে মিলনের জন্য তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করে। সাধন ভজনে জীবন অতিবাহিত করে। গীতায় বলেছে—"অজ্ঞানে নাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"—অর্থাৎ অনুমোহ মেঘের মতন

ঢেলে রেখেছে আমাদের অন্তরের জ্ঞানের জ্যোতিকে—তাই মানুষ অন্ধকারে এত দুঃখ পায়। এই মোহমুক্তি হলেই মানুষের এই ধরার পান্থশালার প্রতি আসক্তি চলে যায়। তখনই মানুষ বৈরাগ্য সাধনে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে।)

প্রিয় বিবহের যন্ত্রণা মানুষকে তখন ভোগ করতে হয় না। মানুষ তখন উপলব্ধি করতে পাবে আত্মা অমর। আত্মা পবমাত্মারই অংশ বিশেষ। এই জগৎ হতে বিদায় নেওয়ার অর্থই পার্থিব দুঃখ ভোগ হতে অব্যাহতি পাওয়া। পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনই স্থূল দেহের মৃত্যু।

চন্দ্রিকা ভাবে মানুষ মরণকে ভয় কবে। কিন্তু সুতারা তো মরণকে যেন সাদব সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। মৃত্যু দুয়ারে জেনেও তাঁর মুখে এতটুকু ভয়ের ছায়া বা আতঙ্কের ছায়া পড়তে দেখা যায়নি। জীবনের মত মৃত্যুকেও যেন তিনি সাদরে ডেকেছিলেন।

দাদু বলেছেন—মরণ তেঁ তুঁ না ভরই মবণা অংত নিদান
রে মন মরণা সিরজা কহিলে কেবল প্রাণ ॥

অর্থাৎ মরণকে কিসের ভয়। মরণই তো জীবনের যথার্থ পরিণতি, পূর্ণতা, মৃত্যুর সৃষ্টি হয়েছে কেবল এই কথাটি প্রকাশ করবার জন্য যে 'হে প্রাণ তুমিই সত্য।'

কবীর বলেছেন—

জনম মরণ বীচ দেখ অন্তর নহী দছে ঔর বাম যুঁ এক আহী,
কহৈঁ কবীর যা সৈন গূংগা তঁঙ্গ বেদ কাবকী গম্যনাহী ॥

অর্থাৎ জীবন ও মরণেব মধ্যে কোন প্রভেদই নেই, দক্ষিণ ও বাম সে তো একই কথা। মায়ের এ কোল আর ও কোল। কবীর বলেন, এ সন্ধান যিনি পেয়েছেন তিনি সে কথা প্রকাশ করে বলবার ভাষা পাননি।) বেদ, কোরানের অতীত এ সব গভীর তত্ত্ব।

সমরবাবুর মধ্যেও আজ জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে এই উপলব্ধি এসেছে। তাই গার্হস্থ্য জীবনে বসবাস করেও—সব কিছু হতে নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। মৃণালের পরিণতি সুতারার মৃত্যুর

কারণ। সমরবাবুর জীবনে আজ তা আঁচড় কাটতে পারেনি। কারো প্রতি যেন তাঁর আর কোন মায়ার বন্ধন নেই। তাই সংসার সাগরের ধাক্কায় কোন দিক্ ধ্বসে গেল, কোন দিক ডুবে গেল—সেই দিকে তাঁর দৃকপাত নেই।

চন্দ্রিকা জানে এই সমরবাবুর ও সুতারার সন্তানগত মনপ্রাণ ছিল। যার জন্য কেবল নিজের সন্তানদের নয়—সন্তানস্থানীয় ভাগ্নে, ভাইপোও নিজ সন্তানসম স্নেহে যত্নে প্রতিপালন করেছেন। কিন্তু একমাত্র হিমাংশু ব্যতীত সেই ঋণ কেউই মনে রাখেনি বা শোধ করবার চেষ্টা তো করেই-নি। পরন্তু তাঁদের প্রতি নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও তারা সজাগ নয়। কিন্তু এই কৃতঘ্নতা যারা দেখাচ্ছে—জীবনে সুখ শান্তি তারা কেউই পায়নি। মানুষ বার বার নিজের অপরাধের শাস্তি পেয়েও—চৈতন্য লাভ করেনা। নিজেদের অপরাধের সম্বন্ধে যখন তারা সজাগ হয়—তখন আর ত্রুটি সংশোধন করবার সময় থাকে না। হয়ত সমরবাবুর সন্তান ও সন্তানস্থানীয়দেরও একদিন সেই ভুল ভাঙ্গবে। তখন সুতারার মত সমরবাবুও আর এই পৃথিবীতে থাকবেন না।

কালী মন্দির হতে ফিরবার পথে এমনি নানা আনমনা চিন্তার ভিড় যখন চন্দ্রিকার মনের কন্দরে বিরাজ করছে, তখন বাসটা রাসবিহারীর মোড়ে এসে থামতেই চন্দ্রিকা অন্যমনস্ক ভাবে নেবে যেতেই পিছন হতে তার নাম ধরে কে ডাকছে মনে হওয়ায়,—পিছন ফিরে তাকাল।

একটি মেয়ে। তাকে বিগতাযৌবনা বলা যায়। মুখে বয়সের ভাজ পড়ে গেছে। কিন্তু সেই মুখে মেক আপ ও চুলের রং লাগিয়ে যুবতীদলে ফিরবার প্রয়াস। দৈহিক মেক আপের সঙ্গে প্রসাধনের চাকচিক্যও কমে নাই। গোলাপী রং এর বেণারসী শাড়ী পরনে। সেই রং এর বুক, পেট, পিঠ কাটা ব্লাউস তথা কাঁচুলী। শাড়ীর পাড়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রূপালী রং এর নাগরাই। মাথায়

পরচুলার সংযোগে বিরাট খোপা। তারই মধ্যে রূপার একটা ফুল যার থেকে ঝালর ঝুলে পড়ছে। ডান হাতের রিষ্টে একটা রিষ্টওয়াচ। বাঁ হাতে একগুচ্ছ গোলাপী রং এর চুড়ি। তারই সামনে নেপালী ফ্যাসেনের রূপার মোটা একটা বালা। গলায় রূপার চেইনে নেপালী লম্বা পেনডেন্ট। কানে রূপার বড় মাকড়ী। ঠোঁটে গালে নখে রং এর প্রলেপ। চোখে সুর্মা। ভ্রূ টানা। গোলাপী টিপ্, এক কথায় সর্বাঙ্গে আর্টিফিসিয়ালিটির ছাপ।

প্রথম দৃষ্টিতে চন্দ্রিকা মেয়েটিকে চিন্তে না পেরে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর রাস্তার উপরেই পাশ্চাত্য কায়দায় চন্দ্রিকাকে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি বলে—"চন্দ্রি, কত দিন পব তোমার সঙ্গে দেখা। হাউ লাভ্লি ইউ লুক্! কান্ট ইউ বেকগ্নাইজ মি?"

"না ঠিক চিনতে পারছি না।"

হোয়াট্ এ শিলি গার্ল ইউ আর! আই অ্যাম ইয়র ক্লাস ফ্রেণ্ড নীটা কোঙার। ইয়ব হাজবেণ্ড মৃন্ময় ইজ এ গুড ফ্রেণ্ড অফ মাইন। হি ইজ এ লাভলি জেণ্টেলম্যান।"

নীতা নাম শুনেই চন্দ্রিকা যেন মনে মনে শিউরে উঠল। নীতা ছিল স্কুলে কুখ্যাত মেয়ে। এমন কোন দোষ নেই—যেটি তার চরিত্রকে ফাঁকি দিতে পেরেছে। চারিত্রিক দোষের জন্য সে স্কুলে বহুবার সমগ্র স্কুলের সামনে শাস্তি পেয়েছে। শুধু তাই নয়। স্কুল হতেও সে বিতাড়িত হয়েছে। সেই মেয়ে আজ রাজপথে তার সঙ্গে এভাবে অন্তরঙ্গতা দেখিয়ে কথা বলবার সাহস যে কি করে পেল —তা নীতার কথাতেই উপলব্ধি করতে পেরেছে।

নীতার মত নিম্নশ্রেণীর মেয়ের সঙ্গে মৃন্ময়ের অন্তরঙ্গতার কথা মনে হতেই ঘৃণায় চন্দ্রিকার মন কুঞ্চিত হলো। চন্দ্রিকা নীতাকে এড়িয়ে যাবার জন্য বল্ল "আমার একটু তাড়া আছে। আমি এখন যাচ্ছি। তুমি এখন কি করছ? কোথায় থাক?"

"ওঃ হোয়াট্ এ ফুলিস্ কোশ্চেন! ডোণ্ট ইউ নো ছাট্ আই অ্যাম লিভিং উইথ মৃন্ময় ইন্ হিজ হাউস?"

এ ধরণের উত্তরের জন্য চন্দ্রিকা প্রস্তুত ছিল না। কারণ মৃণালের পরিণতি ও সুতারার মৃত্যুতে এ বাড়ীর কারোরই মৃন্ময় সম্বন্ধে আর কোন কৌতূহল ছিল না। সেই কারণে তার খবরাখবরও কেউ রাখতো না। তাই নীতার উত্তর শুনে চন্দ্রিকা এটাই বুঝে নিল যে নীতা মৃন্ময়ের তৃতীয়া স্ত্রী। তবু নীতার চরিত্র সে জানে বলেই, তাই সন্দিগ্ধ মনে প্রশ্ন করল "তুমি কি তাঁকে বিয়ে করেছো?"

"ওঃ হোয়াট্ এ শিলি কোশ্চেন! ডোণ্ট ইউ নো আই হেইট ম্যারেজ। হি টু অফ দি সেইম্ ওপিনিয়ন। মৃন্ময় বলে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করা স্ত্রীরা 'আনগ্রেটফুল' হয়। তার দুটো বিবাহিত স্ত্রী-ই তার সঙ্গে ট্রেচারী করেছে। তাই বিয়ের বন্ধনে আমরা কেউ কাউকে ধরে রাখা পছন্দ করি না। যতদিন মনের মিল, ব্যবসায়ের মিল হবে— ততদিনই আমি তার সঙ্গে থাকবো। তারপর যেদিন বনিবনা হবে না, সেদিন যে যার পথে সরে পড়বো।"

চন্দ্রিকা ব্যঙ্গ করবার কৌতূহল দমন করতে না পেরে বল্ল "ওঃ তবে তোমরা 'শেষ প্রশ্নের কমলের আদর্শে নীড় বেঁধেছো। যাক্, এসব কথা শুনে সময় নষ্ট করবার মত আমার অফুরন্ত সময় নেই।

মৃন্ময়ের মত লোকের বেষ্ট ফ্রেণ্ড হয়ে তুমি ট্রাম বাসে চড়চ্ছ কেন?"

"আমার অনেক প্রাইভেট প্লেসে যেতে হয়—যা মৃন্ময় জানে তা আমি চাই না। তাই সে সব জায়গায় যাবার সময় আমি তার কার ইউস করি না।"

সামনেই একটা ট্রাম এসে থামতে—চন্দ্রিকা নীতাকে এড়িয়ে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি প্রায় চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ে সামনেই একটা খালি সিট্ পেয়ে—সেই সিটে বসে পড়ল। সাধারণতঃ এমন ফাঁকা ট্রাম পাওয়া যায় না।

ট্রাম ছুটে চলেছে। চন্দ্রিকাও চিন্তার জাল বুনে চলেছে মৃন্ময়ের অবশেষে এত অধঃপতন যে নীতার মত মেয়ের সঙ্গে সহবাস করতেও তার সামাজিক বা পারিবারিক সম্ভ্রমে বাঁধলো না। কিছুদিন আগেও নীতার কলঙ্কের একটা ঘটনা পত্রিকায় বের হয়েছিল। সমাজে এখন এই সব সম্ভ্রমহীন লাজলজ্জা বিহীন মেয়েদের আধিপত্যই বেড়েছে। নীতাকে মৃন্ময় তার 'সিয়ার' জুয়ারে জুয়ারী করবাব জন্যই নিয়েছে—সে তা বুঝল। কিন্তু নীতার মত মেয়ে যে মৃন্ময়কে কোথায় নাবিয়ে নিয়ে যেতে পারে—মনে হতেই চন্দ্রিকা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু যে নিজে ডুবে যেতে চায় তাকে কোন প্রকারে চেষ্টা কবলেও কেউ রক্ষা করতে পারে না।

৩২

সমরবাবু অসুস্থ। রোগ তাঁর দেহে তেমন নয়। বার্দ্ধক্য জনিত শরীরের সব স্নায়ু যেন শিথিল হয়ে পড়েছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জোরও যেন কমে এসেছে। (মানব জীবনের এই সময় ধন, জন সব থাকা সত্ত্বেও মানুষ পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। বার্দ্ধক্যাবস্থাই মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা করুণ। অসহায় শৈশবাবস্থা আবার ফিরে আসে। অথচ যেহেতু বার্দ্ধক্যাবস্থায় কোন শক্তি থাকে না—সেহেতু পুত্র কন্যা বা অন্যান্যেরা বৃদ্ধবৃদ্ধাকে তেমন ভয় ভক্তি করে না। অবশ্য এটা আধুনিক যুগের দৃষ্টান্ত। পরন্তু সেযুগে বার্দ্ধক্যাবস্থাতেও মানুষ সংসারের কর্ত্তা রূপেই থাকতেন। সবাই শ্রদ্ধা করতো, তাঁদের আদেশেই সংসার চলতো। অথর্ববাবস্থাতেও তাঁরা সংসারের হাল ছাড়তেন না। তাই সে যুগে সংসারে ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলা। লক্ষ্মীও গৃহে বাঁধা থাকতেন।

কিন্তু এ যুগে বার্দ্ধক্য অবস্থার জন্য মানুষ শঙ্কিত হয়ে থাকে। যদি ধনী পিতা মাতা হন্ এবং সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা আগেই করে থাকেন অর্থাৎ উইল যদি আগেই করা হয়ে থাকে, তবে কত তাড়া-তাড়ি সেই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে পৃথিবী হতে সরানো যায় তার জন্য তার উত্তর পুরুষ বা তাদের বধূরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন অবহেলা, অনাদরে জীবনের প্রতিটি প্রহর তাঁদের হয়ত বা চোখের জলে কেটে যায়। আর যাঁরা ওপারে যাবার আগেও এপারের সব কিছু গুছিয়ে রাখেন না—তাঁদের জীবনও অতিষ্ঠ হয়ে উঠে সম্পত্তির মালিকানা কাকে দিয়ে যাবেন তা নিয়ে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে চলে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। কোথাও কোথাও অবশ্য ব্যতিক্রমও হয়। অর্থাৎ অত্যাধিক আদর ও যত্নেও তাঁদের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। অবশ্য এই যত্ন আত্তি

আন্তরিকতা পূর্ণ কিনা এ প্রশ্নও মনে জাগে। সম্পত্তি হাত করবার মতলব—তা তাঁরা বোঝেন। আধুনিক যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় পুত্রবধূরা শ্বশুর শাশুড়ীর শেষ অবস্থায় পরিচর্য্যা করে না। হয়ত যদি সঙ্গতি থাকে—তবে নার্স রেখে তাদের কর্ত্তব্য শেষ করে। এক-মাত্র মেয়েরাই শেষাবস্থায় মা বাবার আশা ভরসার স্থল। যেখানে কোন কারণে মেয়েদের দ্বারা মা বাবার পরিচর্য্যা সম্ভব নয়—সেই মা বাবার দুর্গতি যারা দেখেন—তাঁরা তাঁদের শেষ দিনটিকে ত্বরান্বিত করবার প্রার্থনা করে থাকেন।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বৃদ্ধাবস্থার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেবার জন্য নানা রকম 'হোমস্' আছে। আত্মীয় পরিজন বর্জ্জিত বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের তখন এইসব 'হোমসের' অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। মাসান্তে যদি বা কোন পুত্র পৌত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা বা দৌহিত্র দয়া করে দর্শন দিয়ে যায়—তবেই তাঁরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাকি তাও হয় না। তাই কি দুঃসহ মনোবেদনা নিয়ে চার্চের সেই এক নাগারে শমন বার্তা ধ্বনি শুনবার প্রতীক্ষায় বসে থাকা ছাড়া—তাদেরও করণীয় আর কিছু থাকে না।

আমাদের দেশে এমন ভয়াবহ অবস্থা সেকালে ছিল না। কিন্তু মানুষ যতই সভ্য (?) হচ্ছে—ততই ঐ দেশের দোষগুলিই সব সাদরে বরণ করে নিচ্ছে। কিন্তু যৌবনে যখন তারা বৃদ্ধদের "ওল্ড ফুল" বা "ওল্ড গাই" শব্দে বিশেষিত করে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, তখন ভুলে যায় একদিন তাদেরও এই অবস্থায় আসতে হবে। সন্তানদের সামনে যে দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করছে—তাই হয়ত তাদের অদৃষ্টে ঘুরে আসবে। সে যুগে শুনেছি বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের ঘরের লক্ষ্মী বলা হোত এবং সেইভাবেই তাঁরা সমাদর পেতেন। এ যুগে বৃদ্ধদের মনে করা হয় গলগ্রহ। তাদের যদি সম্পত্তি থাকেও তবু তাঁদের প্রতিপালন করাকে অর্থের অপব্যবহার করা হয় মনে করা হয়ে থাকে। তারই পরিণতিতে গৃহে গৃহে অশান্তির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।

কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। গৃহে, দেশে কোথাও শান্তি নেই। এজন্য কেবল কিশোরদের অভিযুক্ত করলেই চলবে না। এর জন্য দায়ী তাদের পিতামাতা ও রাষ্ট্রনেতারা যারা আজ আদর্শচ্যুত। যারা নিজেদের সন্তানদের সামনে আদর্শস্থানীয় না হয়ে কৃতকর্মের জন্য তাদের সমালোচনার পাত্র হয়—তারা কিভাবে সন্তানদের সুপথে চালিত করবে অথবা সন্তানরাই বা তাদের শ্রদ্ধা করবে কেন?

রাষ্ট্র নায়কদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। তারা এই সব কিশোরদের দিয়ে তাদের নির্বাচনী প্রোপাগণ্ডা চালায়। সেই সময় তারা প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ নায়কের বিরুদ্ধে যেসব বিষ উদ্গারণ করতে শেখায়,—তার পরিণতিতে দেশের নেতাদের প্রতি তাদের কোন শ্রদ্ধা থাকে না। তাদের আদর্শে তারা উদ্বুদ্ধ হতে পারে না।

সমরবাবু যাতে কখনও নিজেকে একাকী মনে করতে না পারে—এজন্য হিমাংশু ও চন্দ্রিকা সর্বদা সজাগ। নেহাৎ কর্ত্তব্য ছাড়া তারা বাড়ীর বাইরে যায় না। চণ্ডিও সময় পেলেই এসে বৃদ্ধের পাশে বসে তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করে থাকে। এই সমরবাবু ও সুতারা দেবীর প্রশংসায় তার মা ও বাবা উচ্ছ্বসিত ছিলেন। মানুষের কত উপকার এঁরা করেছেন। কত সরল ও উদার তাঁদের মন। তবু ভগবানের অদৃশ্য খড়্গ এঁদের উপরও পড়েছে।—তাই পুত্ররাও পরগাছার মত যারা তাঁদের উপর ভর করে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, তারাও আজ ভুলে গেছে কিসের জোরে তারা দাঁড়িয়েছে। (যাঁরা সৎ সাধু সজ্জন—এ যুগে তাদের অদৃষ্টেই যত দুর্ভোগ। আর যারা ঠিক তার বিপরীত গুণাগুণ নিয়ে—এ দুনিয়ায় বরণীয় হয়ে রয়েছে, তাদের অদৃষ্টেই যত সুখ সমৃদ্ধি লেখা হচ্ছে। হয়ত পার্থিব জগত হতে তাঁদের মনকে অপার্থিব জগতের দিকে টেনে নেবার জন্যই ভগবান এইভাবে সাংসারিক নানা ঘা দিয়ে তাঁদের মন মায়াযুক্ত করেন। এবং পরমাত্মার প্রতি তাঁদের মন নিবদ্ধ করেন।

তাই দেখা যায়—এ জগতে যিনি যত ধর্মকে আঁকড়িয়ে থাকেন—তাঁর অদৃষ্টেই তত বিধাতার নির্মম কশাঘাত নিয়ম।)

যদিও সমরবাবু মৃণালের পরিণতিতে মনে মনে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন, কিন্তু কখনও কার কাছে তার নামোল্লেখ করতেন না। পরন্তু কেউ তাঁকে মৃণালের হয়ে সমবেদনা জানাতে এলে তিনি কথাটা চাপা দেন্।

চন্দ্র ও চণ্ডী এসে সমরবাবুকে প্রণাম করে। চণ্ডী বল্লে তাঐ-মশায় চন্দ্রকে আশীর্বাদ করুন। আগামী কাল তাকে তার ভাবী শ্বশুর বাড়ীর থেকে আশীর্বাদ করতে আসবে। সে যেন আপনাদের মতই আদর্শ ও সুখী দাম্পত্য জীবন লাভ করতে পারে।"

সমরবাবু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন "আমাদের মত হতভাগ্য হবার আশীর্বাদ আমি করব না, মা। তবে চন্দ্র তার জীবন সঙ্গিনী নিয়ে সুখে ও শান্তিতে বাস করুক—এই আশীর্বাদই করব।"

"কিন্তু আপনার ও মাঐমার মত সুখী দাম্পত্য জীবনই তো অভিপ্রেত। এমন আদর্শ সুন্দর দাম্পত্য জীবন কোথায় পাওয়া যায়?"

খানিকক্ষণ নীরব থেকে তিনি উত্তর দিলেন "ঠিক বলেছো মা, তোমার মাঐমার মত স্ত্রী রত্ন দুর্লভ। তাঁর মত আদর্শ স্ত্রী পেয়েছিলাম বলেই আমি জীবনে এত উন্নতি করতে পেরেছিলাম। এত ঝড়, ঝঞ্ঝা, এত আঘাত, এত মানসিক কষ্ট সহ্য করতে পেরেছি। কিন্তু আমার হতভাগ্য তাঁকে আমি শান্তি দিতে পারিনি। সন্তানরা কেউই তাঁর মানুষ হোল না। যাক্, আমাদের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। চন্দ্র তুমি কোথায় বিয়ে করছ? চণ্ডীর সহকর্মীর আত্মীয়া নাকি?"

চন্দ্র লজ্জায় অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। চণ্ডীই উত্তর দিল "না, তার সঙ্গে সম্বন্ধ করলাম না। কারণ শুনলাম মেয়েটির দিদিকে

অভয় বিয়ে করেছে। আপনি তো অভয়ের সব কীর্ত্তি জানেন। অভয়েব সঙ্গে কোন রকম আত্মীয়তার বন্ধন হোক আমি চাই না।

সুভার মৃত্যুসংবাদ আপনাকে এতদিন দিইনি। অভয়ের প্রসঙ্গ যখন উঠল—তখন সুভার অপমৃত্যুর কথাটাও আপনাকে আজ বলবো।

অভয় অন্যের ডিগ্রী দেখিয়ে একটা প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা হয়ে আছে।—সে নিজের কাজের আর কোন প্রতিবন্ধক না থাকার জন্য বাবাকে হত্যা করলো। বাবাকে হত্যা করেও হয়ত যে মনে কবলো, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হতে পারেনি। সুভাকে সে ছোটবেলা হতে বিয়ে কবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ছিল এবং সেই কারণেই সুহাসের ডিগ্রীগুলি হাত করে চাকরী বহাল রেখেছে শুধু নয়, এই চাকরীব দৌলতে নিজস্ব বাড়ীও তৈরী করে একটি সরলা, সুশ্রী, এম, এ, বি, টি পাশ মেয়েকে প্রবঞ্চনা করে বিয়ে করেছে। এবং তারই ছোট বোনের সঙ্গে চন্দ্রের বিয়ের প্রস্তাবে সুভা মেয়ে দেখতে যাওয়ায় অভয় বুঝেছে পিতৃহত্যা করেও সে এখনও নিরাপদ হতে পারেনি। তাই গুণ্ডা দিয়ে, একদিন সুভা যখন স্কুল হতে ফিবছিল, তখন তাকে হত্যা করেছে।

শুনে বৃদ্ধ সমররাবু ক্রোধান্বিত হয়ে কম্পিত স্বরে বল্লেন "দেশ কি মগের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে? এভাবে একটা গুণ্ডা, লম্পট প্রবঞ্চক একের পর এক হত্যা করে যাচ্ছে। তাব কোন শাস্তি হচ্ছে না। দেশে আইন, শাসন কি নেই?"

"আইন শাসন হয়ত আছে। কিন্তু তা বড়লোকের জন্য। গরীবের জন্য নয়। আজ সুভার অভাবে তাদের পরিবারে যে আর্থিক দুরাবস্থা হয়েছে কে তার প্রতিকার করবে? তেমন আর্থিক স্বচ্ছলতা তাদেব নেই যে পুলিশ তোষণে অভয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারবে। মোটা ঘুষ দিয়ে অভয় তো আগেই থানাকে হাত করে নিয়েছে। সুতরাং তার মত শক্তিশালী না হলে কে তার এই

কুকর্মের বিরুদ্ধে লড়তে যাবে। হয়ত তাকেও এই দুনিয়া হতে সরে যেতে হবে।

অভয়ের দৃষ্টি বোধ হয় এবার আমার উপর। তাই তো তাড়াতাড়ি চন্দ্রর বিয়েটা দিয়ে বৌ-এর হাতে সংসারের ও চন্দ্রের দায়িত্বটা বুঝিয়ে দিতে চাই। নতুবা হয়ত চন্দ্রকে সারা জীবন একা একাই মেসেব জীবন কাটাতে হবে।"

চন্দ্রিকাব ইঙ্গিতে চন্দ্র আস্তে আস্তে সেই কামরা ত্যাগ করলো। কিছুক্ষণ মৌণ থেকে সমববাবু উত্তর দিলেন "মনে হয় আমরা এ যুগের অনুপযুক্ত। কিন্তু ভগবান যে, কেন আমাকে আরও দুঃখ কষ্ট সহ্য করনাব জন্য রেখেছেন--তা জানি না। এসব অন্যায় আমি সহ্য করতে পারতাম না। আজ যদি বার্দ্ধক্যে পঙ্গু হয়ে না পড়তাম— তবে সুভাব মৃত্যুর সুবাহা আমি করতাম। অভয়কে বুঝিয়ে দিতাম স্বাধীনতাব নামে দেশে অরাজকতার প্রতিষ্ঠা হয়নি। এবং তার প্রাপ্য শাস্তি আমি অবশ্যিই পাইয়ে দিতাম।"

৩৩

শীতের সূর্য্য পশ্চিম আকাশের ঢালু পথে খানিকটা নেমে গেছে। রোদ এখন নিষ্প্রভ, নিস্তেজ। উত্তুরে হাওয়া এলোমেলো ভাবে ছুটোছুটি করছে। দেখতে দেখতে পশ্চিমাকাশের শেষ রশ্মির রক্তিমাভা সরে গেছে। চারিদিকে কুয়াশার ধূমায়িত চাদর কে যেন বিছিয়ে দিয়ে গেল। আর কিছু দেখা যায় না প্রকৃতিব মধ্যে। কুয়াশাবৃত আকাশের কোলে আস্তে আস্তে জ্যোৎস্নার আলো ফুটে উঠলো। একটা শান্ত সমাহিত ভাব আকাশে বাতাসে অনুরণিত হচ্ছিল। কুয়াশার শিশির বিন্দুতে স্নাত সমরবাবুর আঙ্গিনার গাছ-গুলি যেন আঁচল ভ'রে জ্যোৎস্নার ঢেউ গ্রহণ করছে। মেঘশূণ্য আকাশ। পূর্ণালোকে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে তারাগুলি। আলোকের ঝর্ণাধারায় পৃথিবীকে পুণ্যস্নান করাবার জন্য যেন প্রকৃতি তৎপর। আকাশের সেই পবিত্র মৌনতা যেন কোলাহল মুখরিত মহানগরীকে নীরব করে দিয়েছে। প্রকৃতির এই অপরূপ অতি বড় বস্তুবাদী বা প্র্যাক্‌টিক্যাল মানুষের অজ্ঞাতে ক্ষণেকের জন্য হলেও অপাঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলকাতার শীত, তেমন হাড় কাঁপুনী শীত নয়। তবু শীতের আমেজে বসে এই জ্যোৎস্নালোক দেখতে ভাল লাগে চন্দ্রিকার।

চন্দ্র বৈকালিক চা পান করে বের হয়েছে। গুরুজনদের আলাপ আলোচনার মধ্যে বসে থাকা সে পছন্দ করে না। কারণ আধুনিক বাচাল ছেলেদের হাওয়া তার গায়ে লাগেনি। তাই বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে সে ফিরবে। রাত্রের খাবার খেয়ে সে চণ্ডীকে নিয়ে যাবে। চণ্ডী বসে গল্প করছিল সমরবাবুর সঙ্গে। হিমাংশুব জন্য অপেক্ষা করছে চন্দ্রিকা। হিমাংশু এলেই দুই বোন ও হিমাংশু চা পর্ব সুরু করবে।

চন্দ্রিকা শোবার ঘরের সামনের "ব্যালকনিতে" খোলা আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে আনমনা ভাবে বসে ছিল। অতীতের অনেক স্মৃতি তার মনকে নাড়া দিচ্ছিল। এমন কত জ্যোৎস্না সে মৃন্ময়ের সঙ্গে প্রেমালাপে অতিবাহিত করেছে। এমনি কত পূর্ণিমা রাতে সেই বাগান বাড়ীতে অস্ত্র চালনা শিখেছে। ভবিষ্যতের রঙ্গীন ছবি তখন তাকে কত প্রেরণা দিয়েছে। মনে মনে সে নিজের ভাগ্যকেই যেন নিজে ঈর্ষ্যা করেছে। কিন্তু জীবনের অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত করে এসে আজ তার জীবনের মোড় কেন এভাবে ঘুরে গেল? কি করে মৃন্ময়ের এমন পরিবর্ত্তন সম্ভব হোল?

বড় মাসীর কুটিল জটিল স্বভাব জেনেও কেন সে তারই গহ্বরে পা দিল। যে মৃণাল হয়ত একদিন মৃন্ময়ের জীবনের ধারা বদ্‌লে দিতে পারতো। হয়ত এই মৃণালই তাদের স্বামী স্ত্রীর মিলনের যোগ সূত্র হতে পারতো, সেই মৃণালের মধ্যেও এমন পাশবিক চরিত্র ফুটে উঠলো কেন? এখানে মৃন্ময়ের মার কাছে থাকলে মৃণাল একটি আদর্শ ছেলে হয়ে উঠতো। উপযুক্ত নাগরিক হোত। কিন্তু মৃন্ময় ক্ষেপা কুকুরের মত একে তাকে দংশন করবার জন্যই মৃণালকে টেনে নিয়ে গেল। মাকে আঘাত দিল সে চন্দ্রিকাকে বশে আনতে না পারার অপরাধে। কিন্তু এতে তো মৃন্ময়েরই ক্ষতি বেশী হোল।

চম্পাকে নিয়ে মৃন্ময়ের অনেক আশা ছিল। তাই চন্দ্রিকার আবাল্যের প্রেমকে সে অপমান করে—ছুটে ছিল চম্পা আলেয়ার পিছনে। কিন্তু চম্পার সঙ্গে মৃন্ময় তাল রেখে চলতে পারেনি। রাশ সে এত আল্‌গা করে দিয়েছিল যে চম্পা ছুটে গেল ইয়াংকির সঙ্গে। অত্যাধুনিক হবার খেসারৎ দিতে হলো মৃন্ময়কে। চম্পা এই যাওয়া মৃন্ময়ের মনে কোন দাগ কেটেছে কিনা বোঝা যায় না। কারণ চম্পার জন্য কেউ কখনও মৃন্ময়কে শোক বা আক্ষেপ করতেও শোনেনি।

মনে হয় মৃন্ময় এখন গাঁটছড়া বেঁধেছে টাকার সঙ্গে। তাই রক্তে

মাংসের মানুষ এত দীর্ঘকালের প্রেমিকা স্ত্রী চন্দ্রিকাকে ত্যাগ করে যেতে যেমন তার মনে কোন দাগ পড়েনি, তেমনি আধুনিক সমাজের প্রতিবিম্ব চম্পা যখন তাকে পরিত্যাগ করলো -তখনও তার মনে কোন দাগ কাটেনি।

আজ সে জীবন ব্যবসায়ের সঙ্গী করেছে অতি জঘন্য চরিত্রের মেয়ে নীতা কোঙারকে। যে মেয়ে টাকার জন্য না পারে এ হেন দুষ্কর্ম নেই। তবে এবার মৃন্ময় কিছুটা বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। আইন সঙ্গত ভাবে নীতার মত নিম্নস্তরের মেয়েকে সে তার জীবন গ্রন্থিতে বাঁধেনি। হয়ত পূর্বে এমন চরিত্রের মেয়ের সঙ্গে ঘৃণায় মৃন্ময় কথা বলা দূরে থাক তার ছায়াও মাড়াত না। আজ সেই মেয়েকে অর্থা- গমের জন্য কেবল সহ্যই করেনি, তাকে তার গৃহেও স্থান দিয়েছে। 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি'।

মাঝে মাঝে চন্দ্রিকার মনে হয়—হয়ত মৃন্ময়ের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। নতুবা এমন কেন হবে? নাব্‌তে নাব্‌তে কত নীচে সে নেবে গেছে হয়ত সে নিজেই জানে না। তার কি যথার্থই কোন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু নেই—যারা মৃন্ময়কে টেনে তুলতে পারে এই কর্দ্দম হতে? যথার্থ বন্ধু এ যুগে দুর্লভ। বন্ধুর মখোস পরে যারা আসে, ঘটনার ঘুর্ণিপাকে এক একজনের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই বন্ধুকে বিশ্বাস করে মানুষ ঠকে। সর্বস্ব হারায়। প্রিয়জনের স্নেহ ভালবাসাও হারায়।

চন্দ্রিকা যখন আপন চিন্তায় বিভোর, তখন হিমাংশুর হাঁক ডাকে তার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। চন্দ্রিকা 'ব্যালকনি' হতে উঠে খাবার ঘরের দিকে যেতে যেতে প্রশ্ন করে "আজ তোমার এত গলা শোনা যাচ্ছে কেন? পার্টির কিছু সুসংবাদ আছে নাকি? যুক্তফ্রণ্ট গদীচ্যুত হওয়ার পর তো কেউ তোমার গলার স্বর শোনেনি, ঠাকুরপো।"

"পার্টির জন্য আর আমার মাথা ব্যথা নেই। দেশ

জাহান্নামে যাচ্ছে—যাবে। আমার একার শক্তিতে তা রুখতে পারবো না।”

চন্দ্রিকা মৃদু হেসে বল্ল “এ যে ভূতের মুখে রাম নাম শুনছি। যে দেশসেবার জন্য সারা জীবনে বিয়ে করবার সময় পেলে না। পার্টির সেবায় তোমার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করলে,—আজ তার সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য প্রকাশ! ব্যাপার কি?”

কপট গাম্ভীর্য দেখিয়ে হিমাংশু উত্তর দিল “তুমি কেবল রাতদিন আমাকে ‘টিস্’ করে আমার ‘মুড্’টাই নষ্ট করে দাও। মজার খবর আর দেওয়াই হয় না।”

“তা কি করবো ঠাকুরপো? আমার জন্য একটি বোন এনে দিতে বলছি—তাও তো দিচ্ছ না। সে এলে হয়ত তোমাকে বাদ দিয়ে তাকে নিয়েই চলতো আমার সব ঠাট্টা তামাসা। কিন্তু তুমি তো তাও করলে না।”

এমন সময় চণ্ডী ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে বল্ল “হিমাংশুদার গলা আজ এত উচ্চগ্রামে উঠল কেন? কি সুসংবাদ? তাঐমশায় পাঠিয়ে দিলেন আমাকে এই বলে যে—“যাও মা, হিমু এসেছে—তার গলা পাচ্ছি। তোমাদের তো এখনও চা খাওয়া হয়নি। চা খাবার খেয়ে এসো।”

“কাকাবাবু একটা অছিলা করে সবাইকেই এ সময় ভাগান। এ সময় তিনি একা থাকতে ভালবাসেন। কেন তা অবশ্য জানি না। তবে তাঁর এই মৌন থাকবার অন্তর্নিহিত নিশ্চয় কোন কারণ আছে।”

“যাক্, তাঁর সমালোচনা বা তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ না করে তোমার উচ্ছ্বাসের কারণটা জানতে পারি কি?”

“নিশ্চয়ই তা জানবার জন্য তো আমার এত হাঁকডাক। শোন তবে। কাকাবাবু ও খুড়ীমার ভবিষ্যৎ বাণী এক এক করে আরও দু’টো মিলেছে। শ্রীমান্ তন্ময় স্ত্রী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন। স্ত্রী নূতন

সাথী জুটিয়ে নিয়েছে শুধু নয়, তন্ময় এখন গভীর চিন্তায় তন্ময়। বড়দার পদাঙ্কুসরণ করতে যেয়ে তার ভাগ্যও তাকে এভাবে উপহাস করবে, তা সে ভাবেনি। তাই এই আঘাত সে এখনও হজম করতে পারেনি। পরন্তু শুনলাম আঘাতটা নাকি তার বেশ গভীর ভাবে লেগেছে—যার জন্য লম্বা ছুটি ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশান্তরী হয়েছে। বড়দার মত এতটা গা সওয়া হয়ে উঠতে পারেনি এখনও।"

চন্দ্রিকা গম্ভীর মুখে উত্তর করলো 'কেন যে এরা এইভাবে উড়ন্ত প্রজাপতিদের পিছনে ছুটে জানি না। এ দেশের জল হাওয়ার সঙ্গে যেসব মেয়েদেব স্বভাব চরিত্রে মিল নেই,—তাদের নিয়ে নীড় বাঁধতে যাওয়াই তো ভুল। তারই পরিণতিতে চম্পা, মিস শিবদেশানীর দল ঘর ভাঙ্গবার সুযোগ পাচ্ছে। এবং এসব দৃষ্টান্তে আমাদের বাঙ্গালী ঘরে ঘরেও আগুন জ্বলছে। যে দেশের যে আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, সেটাই শোভনীয়। তার ব্যক্তিক্রম কিছু ঘটাতে গেলেই—এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। এদের নিয়ে সাময়িক স্ফূর্ত্তি করা চলে, কিন্তু জীবনসঙ্গিনী করা চলে না। তোমার ভাইদের ভুল হয়েছে ঐখানে।"

চণ্ডী জিজ্ঞাসা করলো—"অন্য জনের খবর কি? তাঁর গৃহ ঠিক আছে তো? কারণ, 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'।"

"তাঁরও একই গতি। তবে তিনি সন্তানদের নিয়ে অন্যত্র সরে গেছেন। এখনও নূতন করে কারও গৃহ অলঙ্কৃত করতে যাননি। 'কালস্য কুটিলা গতিঃ'। সুতরাং এখন তার সম্বন্ধে ধৈর্য ধরে সব দেখে যাওয়াই ভাল।

ভাইরা সব অদূরদর্শিতার কারণে গৃহ হারা হয়েছে বলে আমি খুসী নই। কিছুদিন আগে বড়দা বলেছিলেন এরা নিজেদের মনোনীত পাত্রার পাণি গ্রহণ করে সুখে আছে। সে কথাটা যে মিথ্যে প্রমাণিত হোল এবং কাকাবাবু খুড়ীমার ভবিষ্যত বাণী যে সত্য হোল —এটাই আমার খুসীর কারণ।"

চন্দ্রিকা চণ্ডী ও হিমাংশুর জন্য খাবার সাজাতে সাজাতে গম্ভীর ভাবে বল্লে "ঠাকুরপো, আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?"

"অনুরোধ নয়—বল আদেশ। কখন তোমার আদেশ অমান্য করেছি বল ? আমার মত লক্ষ্মণ দেওর আর কলিযুগে দুটি জন্মাবে না। দুর্ভাগ্য বশতঃ উর্মিলার জন্ম কলিযুগে হয়নি—তাই লক্ষ্মণ চরিত্রটি ষোল কলায় পূর্ণ করা সম্ভব হবে না।"

"ঠাট্টা নয় ঠাকুরপো। তুমি একবার তন্ময় ও কবির কাছে যাও। এবার যদি তাদের আবার ঘরে ফিরিয়ে আনতে পার। বাবা থাক্‌তে থাক্‌তে তারা ফিরে এলে তাঁর ভাঙ্গা হাট আবার জোড়া লাগবে। যাবার আগে তিনি আবার হাসিমুখে যেন বিদায় নিতে পারেন।

সেই ছোটবেলার মত সব ভাইরা তোমরা আবার তেমনি মিলে মিশে কি থাকতে পার না ? কি সুন্দর ছিল তখন পরিবারের ছবিটি।"

"তোমার আদেশের অপেক্ষা না করেই এই অধম তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যর্থকাম হয়েছে। তারা ভাঙ্গবে,—তবু মচ্‌কাবে না—এই তাদের নীতি। তাই জীবনের ব্যর্থতা নিয়ে বাবার সামনে দাঁড়াতে তাদের এত লজ্জা। বল্লাম 'কাকাবাবুর শত বার্ষিকী উদ্‌যাপন করবো—তোরা চল্‌। এটাই হবে তাঁর জন্মদিনের সব চেয়ে বড় উপহার।'

তন্ময় বলে 'ঐসব সেন্টিমেন্টের ধার ধারি না। আগে বাবার থেকে সম্পত্তির অংশ লিখিয়ে দাও, তবে যাব।' কবি বল্ল 'সব হাত করে এখন ভাল মানুষী নাই বা করলে ? সুসন্তান সেজেছো, তাই থাক। তবে আমরাও জানি বড়দার ঘর ভেঙ্গেছে কে ?"

চন্দ্রিকার মুখ নিমেষে কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। উচ্ছ্বাসের মুখে হিমাংশু সব বলে ফেলে। হঠাৎ চন্দ্রিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্ল "বৌদি, আমায় মাপ কর। এই অশ্লীল মন্তব্যটা তোমার সামনে

বলা আমার উচিত হয় নি। তবে ওদের কথায় তুমি গুরুত্ব দিয়ে কেন দুঃখ পাচ্ছো? যারা তাদের মা বাবা বা মামা মামীমার বিরুদ্ধে নানা নোংরা কথা বলতে পারে, তারা যে আক্রোশের বশবর্ত্তী হয়ে আমাদের বিরুদ্ধেও বলবে—তা'তে আশ্চর্য্যের কি আছে?"

"কিন্তু আমার জন্য তুমি মিথ্যে অপবাদ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছ ঠাকুরপো। কেন তুমি বিয়ে করে এই মিথ্যে অপবাদ হতে রেহাই পেতে চাও না?"

"ওখানেই তো তুমি ভুল করছ বৌদি। নিষ্কৃতি ওরা আমাকে মোটেই দেবে না। পরন্তু সেই বেচারীর মনে এমনি একটি নোংরা সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে তার জীবনটাও দূর্বিসহ করে তুলবে।

তাছাড়া জীবনের সন্ধ্যায় এসে কোন আহাম্মক নূতন করে ঘর বেঁধে ওপারে যাবার শান্তিটুকু নষ্ট করে?"

চণ্ডী এবার মুখ খুল্লে, "দেখ দিদি, দুর্জ্জন লোকদের কোন যুক্তির অভাব নেই। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূণ্য গোয়াল ভাল। এসব দেওরদের থেকে তোমার দূরে থাকাই ভাল। এদের এসব নোংরামীর পিছনে রয়েছে হিমাংশুদা, আপনার বড়দা। নিজের অপকর্মের ফল তিনি তিলে তিলে পাচ্ছেন। ভুল করেছেন বুঝতে পেরে আবার দিদিকে ফিরিয়ে পেতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে,—এসব বিষ উদ্গার করে তোমাদের শান্তির নীড় ধ্বসিয়ে দিতে চাচ্ছেন। ভাবতেই অবাক হই এরা এই পরিবারেরই ছেলে। এঁদেরই সন্তান এরা।"

"ওখানেই ভুল করছ চণ্ডী। এ পরিবারের ছেলে বলেই এতটা সাহস পাচ্ছে অত্যধিক স্নেহের প্রশ্রয় পেয়েছিল বলে। যদি অন্য বাড়ী হোত, তবে এই অপরাধে উত্তম মধ্যম এই বয়সেও তাদের পেতে হোত।

বড়দা নিজের অযোগ্যতার গ্লানি বৌদির উপর দিয়ে চালাতে চাচ্ছেন। যাক্, ওসব আজে বাজে কথা নিয়ে মন খারাপ করো না

বৌদি। এদের অপরাধের শাস্তি এরা পাচ্ছে এবং পাবে। মনে করো এরা আমাদের কাছে মৃত।

এসব নোংরা কথায় তুমি মন খারাপ করো না বৌদি। তোমার বিবেক ও ভগবানের কাছে তোমার নির্মলতা ও পবিত্রতার সাক্ষ্য আছে—এটাই তোমার সান্ত্বনা। স্বার্থান্বেষী লোকের কথার কোন মূল্য দিও না।

চল কাকাবাবুর কাছে বসে একটু গল্প করি সবাই। আর কটা দিনই বা তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ওখানেই আজ আমরা চা খাবো, এতে কাকাবাবুও খুসী হবেন। তাড়াতাড়ি খাবার পাঠিযে দাও। আমার কিন্তু ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে বৌদি।”

৩৪

কয়েক দিন পর।

শীতের সকাল। ঘন কুয়াসার আবরণ ভেদ করে পূর্বাকাশে সবে লালের আভা দেখা দিয়েছে। হিমেল হাওয়ার সঙ্গে এই আলো আঁধারী মিশানো রোদের ঝিলিকটা সকলের মন হরণ করে। সর্বাঙ্গ গরম আচ্ছাদনে আবৃত করে সমরবাবু পায়চারী করছিলেন নিজের বাড়ীর ছাদে।

আগামীকাল তাঁর জন্মের শতবর্ষ। তাঁর পুরাণ অনেক অভ্যাস এখনও আছে। রোদ উঠবার আগে উঠে, তিনি নিজের হাতে বাগানের পরিচর্যা করতেন। এখন আর সে শক্তি নেই। তাই তাঁর ঘরের সাম্‌নে খোলা যে ছাদ রয়েছে তা'তে রং বেরং-এর ফুলের কেয়ারি রয়েছে,—সেখানেই তিনি ভোরে কিছুক্ষণ পায়চারী করেন।

সুতারা ফুল ভালবাসতেন। তাই নিজের হাতে তিনি ফুলের গাছের যত্ন করতেন। সন্তানদের মতই—এ গাছগুলোও যেন তাঁর বড় স্নেহের বস্তু ছিল। এসব ফুল দিয়ে খাবার ঘর, ড্রইং রুমের ফ্লাওয়ার ভাস্‌গুলি সাজিয়ে রাখতেন। রোজ সব চেয়ে সুন্দর এক গুচ্ছ ফুল সুতারা নিজের হাতে সমরবাবুর শোবার ঘরে বিছানার পাশে সাইড্ টেবিলের উপর ফ্লাওয়ার ভাসে রেখে দিতেন। চন্দ্রিকা আজও এ নিয়ম চালু রেখেছে। অবশ্য সময়াভাবে বাগানের পরিচর্য্যা সে করতে পারে না। সেটা মাইনে করা মালির উপর ছেড়ে দিতে হয়েছে।

চন্দ্রিকা এসেছিল সমরবাবুর শয়নকক্ষের জন্য ফুলের স্তবক নিতে। এমন সময় সমরবাবুকে ছাদের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে

বল্লে "বাবা, আপনার অনুমতি নেওয়ার দরকার—একটা ব্যাপারে। আপনি আমাদের অনুরোধ রাখবেন আশা করি।"

"অমন কুণ্ঠিত ভাবে বলছ কেন মা? এই বৃদ্ধের কাছে তোমাদের অদেয় তো কিছু নেই। তোমার ও হিমুর ঋণ যে জন্ম জন্মান্তরেও আমি শোধ করতে পারবো না। বল তোমাদের কি দাবী আছে?"

"আমার অপরাধ বাড়াবেন না। আপনি আমাকে যে স্নেহ, যে ঋণে জড়িয়ে রেখেছেন—এ অভাগী যে কোন দিনও তা শোধ করবার সুযোগ পায়নি। আপনাদের দয়া ও স্নেহের আশ্রয় না পেলে আজ আমার কি দুর্গতি হোত-মাঝে মাঝে তা চিন্তা করে শঙ্কিত হয়ে উঠি।

আগামীকাল আপনার শতবার্ষিকী পালন করবার আমাদের ইচ্ছে আছে, যদি আপনার অনুমতি পাই।"

শঙ্কিত মুখে সমরবাবু ক্ষীণ স্বরে বল্লেন "না, না, অমন কাজ কখনও কর না। অভিশপ্ত এই জীবনকে সবার সামনে টেনে এনো না। সবার চোখের সামনে আমাকে আর হাস্যাস্পদ কর না। দীর্ঘ জীবনের মত অভিশাপ আর কিছু নেই। তাই জীবনের এতগুলি প্রতারিত পৃষ্ঠা আর জনসাধারণের সামনে তুলে ধর না। গত জীবনে না জানি কত পাপ করেছিলাম। তাই দীর্ঘ শতবর্ষ কেবল দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে চলেছি।" তাঁর ঘুমন্ত দৈহিক ও মানসিক সত্ত্বাগুলি যেন জেগে উঠলো।

তিনি আবেদনের সুরে বল্লেন "এটা তোমাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ। আমায় এ শাস্তি দিও না।

শতবর্ষ জীবন লাভ করে আমার কি হোল? একটি সন্তান আমার মানুষ হলো না। একটি সন্তানও নিজের ইচ্ছামত বিয়ে করেও বৈবাহিক জীবনে সুখ শান্তি পায়নি। আমাদের প্রতি কর্তব্য বোধ তো তাদের নেই। পরন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য—তাদের পিতা হয়ে ঘৃণায় লজ্জায় আমি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি।

সুতারা ভাগ্যবতী তাই এত দূর্ভাগ্য চোখের সামনে দেখে যেতে হোল না। তথা কথিত উপকৃত আত্মীয়দের রূঢ় বিদ্রূপও সইতে হলো না। জীবনের সুরুতে অনেক আশা ছিল। কিন্তু আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বার বার কেবল এই কথাই মনে হচ্ছে—একটি ফুলও ফোটাতে পারিনি। সব কয়টি ফুলই কোরকেই নষ্ট হয়ে গেল।"

সহানুভূতির সুরে চন্দ্রিকা বল্লে "তা কেন বল্‌ছেন? হিমাংশু ঠাকুরপো, রবি ঠাকুরপো— এরা তো আপনারই বাগিচার ফুল। এদের দিকে তাকিয়ে তো আপনি সান্ত্বনা পেতে পারেন।

তাছাড়া এটা শুধু আমার ও ঠাকুরপোর আব্দার নয়। এ যে বাইরের লোকেরই আকাঙ্ক্ষা। তাঁরা নিজেরাই এর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু আপনার অনুমতি না নিয়ে তাঁদের কোন রকম মতামত আমরা দিতে পারিনি।

স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনার অবদানও তো কম নয়। সরকারী পদস্থ অফিসার হয়ে সেই যুগে চাকরী ছেড়েছেন। সংগ্রামী যুব সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার যথেষ্ট সহানুভূতি ছি.........।"

চন্দ্রিকাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে কম্পিত স্বরে বল্লেন "আমার থেকেও স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের অবদান অনেক বেশী – তাঁদের কথা জনসাধারণ ভুলে গিয়ে আমাকে নিয়ে কেন টানাটানি করছে?

আমায় সর্বসমক্ষে এভাবে তোমরা অপদস্থ কর না। আমার অযোগ্যতা আর প্রকাশ কর না। ছেলে, নাতি এক এক করে সবাই বিপথে গেছে। আজ আমাকে তোমরা নির্জ্জনে একলা থাকতে দাও। আমায় জন-কোলাহলের মধ্যে টেনে বার করো না।" বলতে বলতে তিনি আপন ঘরের দিকে মন্থর গতিতে চলে গেলেন।

৩৫

বৃদ্ধ সমরবাবুর গমন পথের দিকে চন্দ্রিকা ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই বৃদ্ধ আজ দেহ মনে জরাগ্রস্ত ও ভারাক্রান্ত। এ যেন কাল বৈশাখীব প্রচণ্ড ঝড়ে বিক্ষিপ্ত পত্রচ্যুত শাখা প্রশাখা মুণ্ডিত ছিন্নমূল জটাজুটধারী এক মহীরুহ প্রকৃতির নির্মম আঘাতেব স্বাক্ষর বহন করে নুইয়ে আছে।

কিন্তু একদিন এই জেলা শাসক সমরবাবুকে সরকারী, বেসরকাবী, বিপ্লবী সকলেই সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান করতো। বহু রাজপুরুষ বা পদস্থ সরকারী ব্যক্তি বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়েছে। কিন্তু আই, সি, এস সমরবাবুর নামে সবার মাথা আপনা হতেই হেঁট হয়ে আসতো।

সমরবাবু সুজন, সুবিচারক। তাঁর কর্মদক্ষতায় সকলেই প্রীত, ভদ্র আচবণে সকলেই মুগ্ধ। তাঁর প্রত্যেক পদক্ষেপের যৌক্তিকতা, তাঁর মনের বলিষ্ঠতার সামনে অনেক ক্ষেত্রেই বৃটিশ রাজপুরুষদেরও মাথা নত করতে হয়েছে।

হয়ত অন্য কোন জেলা শাসকের পুত্র বা পুত্র স্থানীয় ভাগ্নে বা ভাই-পো বৃটিশ সরকারে শাসনের উচ্ছেদ কাজে লিপ্ত থাকলে,—সেই জেলা শাসকের উপর বৃটিশ সরকারের শ্যেন দৃষ্টি পড়বার ফলে তার চাকরাই কেবল যেতো না—নানা প্রকার নির্য্যাতনও সেই পরিবারকে সহ্য করতে হোত।

রবির প্রবোধ রায়কে হত্যার পর সমরবাবুর স্বেচ্ছায় পদত্যাগের মধ্যেও তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পদত্যাগ দ্বারা তিনি যেমন বিদেশী শাসকের দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে চুরচুর্ করলেন, তেমনি দেশ ও সমাজে তাঁর স্বাধীন মনের পরিচয়ও রাখলেন।

চন্দ্রিকা ভাবে সমরবাবু ও সুতারার কত আশা—ছেলেরা মানুষ হবে। যে দেশকে জীবনপণ করে তারা সেবা করেছে, সেই দেশ-মাতার উপযুক্ত নাগরিক হবে। বিদেশে পাঠালে বিদেশিনী কুহ-কিনীদের মায়া জালে এ দেশের ভাল ভাল ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায়,—এইজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কোন সন্তানকে বিদেশী ডিগ্রীর মোহে বিদেশে পাঠাননি। কিন্তু তাঁদের এই দূরদর্শিতার মূল্য কেউ দিলে না। পরন্তু বিদেশে না পাঠাবার কদর্থ করে মৃন্ময়েব বড়মাসী সন্তানদের পিতামাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার প্ররোচনা দিয়েছেন। পরিণামে কি হল? সমববাবুর, সুতারার শান্তি, সুখই কেবল নষ্ট হয়নি। যাবা তাঁদের দুঃখ দিয়েছে—তারাও বিধিব বিধানে চরম দণ্ড পেয়েছে। কারো জীবনেই শান্তির ছোঁয়া উপভোগ করতে পারেনি।

কুয়াশাব অন্তরালে তাঁদের একটানা দিনগুলি গড়িমসি কবে বয়ে যাচ্ছিল। হয়ত এমনি ভাবেই বাকী দিনগুলি বয়ে যেতো—যাবজ্জীবন দণ্ডিত কয়েদীর জীবন যেমন কেটে যায় জেলের অভ্যন্তরে। কিন্তু হঠাৎ উঠ্‌লো দম্‌কা বাতাস। কুয়াশা গেল কেটে। জেলের প্রাচীর পড়ল ভেঙ্গে। মৃণালের কুকীর্তির সঙ্গে সঙ্গে সমরবাবুর নামও পত্রিকায় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সমরবাবুর নির্জ্জনতার আব্রুকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিল। নিজেকে আর তিনি আড়াল করে রাখতে পাবলেন না।

চন্দ্রিকা আপন মনে ভাবে হায়, এরাই কি সমরবাবুর সেই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী যারা ছিল দেশের সবার আদর্শ স্থানীয়।

শঙ্করদার পথের সঙ্গে আজ মৃন্ময়ের পথের কত ব্যবধান! শঙ্করদা ধনী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল সত্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা, আদর্শপরায়ণতা, নির্মল দেশপ্রেম। অতি সাধারণ লোক। তবু যাঁর কথা স্মরণ করে লোকে আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে। তাঁর কাছে দেশ প্রেমের দীক্ষা নিয়ে মৃন্ময় আজ কোন অতলে ডুবছে? মৃন্ময়ের কথা

প্রসঙ্গে লোকে নানা শ্লেষোক্তি, নানা ইঙ্গিত করে, তাকে লোকে দেশের শত্রু বা দেশদ্রোহী বলে। দেশ প্রেমের নামাবলী পরে—সে দেশের বুকে কৃতঘ্নতার শাণিত ছুরি হানছে—তার সহায়তায় বিদেশী গুপ্তচর মাকড়সার মত জাল বিছিয়ে চলেছে।

কেবল কি শঙ্করদার আদর্শ? মা, বাবা, রবি সবার আদর্শ এমন করে ম্লান কি করে হোল মৃন্ময়ের জীবনে? যে মৃন্ময় একদিন অন্যায় দেখলে রুখে দাঁড়াতো,—এই কারণে কংগ্রেস নেতাজীর প্রতি অবিচার করার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে কংগ্রেস সমর্থক হিমাংশুকে কত না লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল মৃন্ময়ের কাছে।

কি এক আদর্শের নেশায় তখন মৃন্ময় আচ্ছন্ন ছিল। তাই দেশের কাজে ডাক পড়লেই সে ছুটে যেতো নিজের জীবন বিপন্ন করে যেমন আগুন দেখে পতঙ্গ ছুটে যায়। কত দুর্গম বিপদ সঙ্কুল স্থানে গিয়ে দেশদ্রোহী যুব সম্প্রদায়ের হাতে মৃন্ময় পৌঁছিয়ে দিতে আসত আগ্নেয়াস্ত্র। এইসব ব্যাপারে মাঝে মাঝে মৃন্ময় চন্দ্রিকার সাহায্যও নিয়েছে। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। বিদেশী শাসককুলকে ভারত হতে বিতাড়িত করতে হবে। এই বীজ মন্ত্র যেন মৃন্ময়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শোণিতের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাই তার মধ্যে তখন দেখা গিয়েছিল এক তেজ দীপ্ত বীরপুরুষ। নির্ভীক ভাবে দেশের জন্য আত্মাহুতি দিতেও দ্বিধা বোধ করত না। যার ব্যবহারে, কাজে ও কথায় ছিল না কোন ব্যতিক্রম। তার কাজ যেন তার মনেরই প্রতিধ্বনি। অতীতের সুন্দর দিনগুলো মনে পড়ে চন্দ্রিকার মন ব্যথায় জর্জ্জরিত হলো।

চন্দ্রিকা তার মার আবাল্যের দুঃখাকীর্ণ জীবন কাহিনী জানতো। মার দুঃখের কাহিনী দিনের পর দিন শুনে সে স্থির করেছিল সে কুমারী থেকেই দেশের কাজ করবে। মার মত নিজেকে আর সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি দেবে না। তাই ছোটবেলা হতে সব রকম কৃচ্ছতা সহ্য করতে সে শিখেছিল। ধৈর্য্য, অধ্যবসায় অনুশীলন

করেছিল। সামাজিক নোংরামীকে সে যেমন প্রশ্রয় দিত না, তেমনি একদল মেয়ের মত পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে পরের হাঁড়ির খবর নিয়ে পরনিন্দা, পরচর্চা করতেও ঘৃণা করতো। অবসর সময় সে নানা বই পত্রিকা পড়ে নানা জ্ঞান লাভ করতে ও নানা দেশের খবরাখবর জেনে আনন্দ পেতো।

কিন্তু বিধির বিধানে চন্দ্রিকা তার সঙ্কল্পে স্থির থাকতে পারেনি। মৃন্ময়ের প্রেমের আকর্ষণে তাকে ধরা দিতে হয়েছিল। তাছাড়া উভয়ের মাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থেই উভয়ের বিয়ে হয়েছিল। মৃন্ময়ের মত যোগ্য স্বামী পেয়ে সে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। ভেবেছিল আদর্শ শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী ও দেওরদের নিয়ে যথার্থই একটি আদর্শ পরিবার গড়তে পারবে। বিবাহ উত্তর জীবনের মধুর স্মৃতি যেন আজও জীবন্ত হয়ে রয়েছে। তার অদৃষ্টে এমন লিখনও ছিল—এ যেন কল্পনাতীত। কিন্তু অসম্ভাব্যও সম্ভব হল।

দিন রাতের মত, আলো অন্ধকারের মতই মৃন্ময়ের চরিত্র বদলে গেল। মৃন্ময়ের চরিত্রের এমন আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছে যা দেখে কেউ আর সেদিনের মৃন্ময়কে আজকের মৃন্ময়ের মধ্যে খুঁজে পাবে না। দেশের প্রতিই সে কেবল বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, মা বাবার প্রতি সে কৃতঘ্নতা প্রকাশ করেছে—স্ত্রী চন্দ্রিকার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে। বিনা অপরাধে তাকে সে পরিত্যাগ করেছে। ধর্মনিষ্ঠ বিদগ্ধ পিতার সে কুপুত্র। মৃন্ময়ের জন্যই তার বিকাশোন্মুখ সুকোমল কিশোর পুত্রের এই হৃদয় বিদারক পরিণাম।

মৃন্ময়ের নিষ্ঠুর ব্যবহারে চন্দ্রিকার হৃদয় ভেঙ্গে গেলেও তবু সে দাঁড়িয়ে আছে। (আঘাত যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে আসে,—তখন তার ব্যথা যেমন তীব্র হয়, আবার তা যদি ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করা যায়, তবে মনের সব দুর্বলতা উত্তীর্ণ করে দাঁড়ানোও সম্ভব। তাই আজ মাঝে মাঝে ভেসে যাওয়া মেঘের মত মৃন্ময়ের স্মৃতি

চন্দ্রিকার মনে উদয় হলেও—আগের মত গভীর দাগ কেটে তার হৃদয়কে ক্ষত করতে পারে না। যে যেন তার মার মতই নিজের মনকে শক্ত করেছে, মনোবল ফিরিয়ে পেয়েছে। তাই মৃন্ময়ের দেয় সব রকম অপমান, অসন্মানকে সে অবজ্ঞা ভরেই মন হতে ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারে।

কর্মজীবন পথও তার সবুজ কোমল পুষ্প বিছানো নয়। সমর বাবুর সতর্ক বাণী তার মনে ছিল। তাই ভদ্র পোষাকের আবরণের অন্তরালে যে পশুর মুখোস মাঝে মাঝে তার সামনে খুলে পড়েছে—তাতে সে কেবলমাত্র শঙ্কিত, ভীতই হয়নি, পরন্তু খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছে। কিন্তু মনের এই ভয়ার্ত্ত ছবি সে মুখে ফুটে উঠতে দেয়নি। মনের সব রকম দূর্বলতা মনের কোণে জাতার মত পিষিয়ে নির্ভীক সৈনিকের মতই এইসব ভদ্রবেশী পশুদের থেকে দূরে সরে গেছে। সমজিয়ে দিয়েছে তাদের যে সব—মেয়ে-ই এক নয়। কর্মজীবনের কণ্টকপূর্ণ পথ অনেক হোচট খেয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে জীবনে সে অনেক অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছে—যা হয়ত অনেক জ্ঞানবৃদ্ধের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। কিন্তু পদস্খলন ঘটতে সে দেয়নি।

যেদিন এমন কোন পশুর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে,—সেদিন বাসায় ফিরে আপন ঘরে রাত্রে দরজা বন্ধ করে,—সে আকুল হয়ে কেঁদে তার রুদ্ধ বেদনার ভার লাঘব করেছে। তাঁর চরণে প্রার্থনা জানিয়েছে—আর ভিক্ষা করেছে শক্তি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা।

কিন্তু এই দুনিয়ার খেলনায় অলক্ষ্যে যে চাবিওয়ালা চাবি ঘুড়ান,—সেই খেয়ালী পুরুষ বোধ হয় চন্দ্রিকার চোখের জল দেখে হাসেন। তাই তাঁর চাবিতে মৃন্ময়ের জীবন খেলা বিচিত্র রূপ নিয়ে ঘুড়ছে। ফিরে আসছে না সে চন্দ্রিকার কাছে।

অপমানাহত চন্দ্রিকার হৃদয় সাময়িক দৌর্ব্বল্যে কখনো কখনো ভেঙ্গে চৌচির হয়েছে। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে হয়েছে ছুটে গিয়ে মৃন্ময়কে তার ক্লেদ জর্জ্জরিত জীবন হতে টেনে তুলে তার জীবনের

সব কালিমা সে তার নিজের মাধুর্য্যে, সেবা যত্নে মুছিয়ে দিয়ে সুন্দর করে আবার ফুটিয়ে তুলে। সার্থক করে ফুটিয়ে তুলবে কীটক্ষত পুষ্প মৃণালকে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে যে পশুদের ভয়ে সে ভীত মৃন্ময় তো আজ তাদেরই দলে ভিড়েছে। চন্দ্রিকা আজ তাকে উদ্ধার করতে যেয়ে অপটু সাতারুর মত হয়ত নিজেই ডুবে যাবে। মৃন্ময়কে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। কারণ টাকার সম্মোহনী শক্তি মৃন্ময়কে এমন অন্ধ করে দিয়েছে যে—হয়'ত সে তারই প্রলোভনে সে-ই চন্দ্রিকাকে বিকিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না।

অথচ কর্মজীবনের এই অপমানের জ্বালা চন্দ্রিকা মুখ ফুটে কারো কাছেই প্রকাশ করতে পারেনি। কারণ তবে তার স্বাবলম্বী হবার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই কারণে হিমাংশু বা চণ্ডীর সামনে পর্যন্ত সে তার মনের অর্গল খুলতে পারে না। কেবল কাটা পাঁঠার মত মরণ যন্ত্রণায় নিশুতি রাতে উষ্ণ বিছানায় ছট্‌ফট্ করে ও অশ্রু-বারিতে তা সিক্ত করে। ধিক্কার দেয় নিজের অভিশপ্ত জীবনকে।

চন্দ্রিকা ভাবে যে আশঙ্কা সে তার জীবনের প্রারম্ভে করেছিল—তাই-ই ঘটলো তার জীবন সন্ধিক্ষণে। ধনী গৃহের পুত্রবধূ হয়েও তাকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে এবং সময়ে সময়ে নানা অপমানজনক প্রস্তাবও তাকে শুনতে হচ্ছে। সমাজে তার স্থান সম্মানের নয়। কারণ সে স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রী।

বিনা অপারধে যে দুঃসহ অপমান, লজ্জা, অসন্মান তাকে সমাজে পেতে হচ্ছে, সমরবাবুর জীবনেও তো সেই একই অবস্থা হয়েছে। অপরাধী জানে না -কি অপরাধ সে করেছে! কিন্তু সমাজের নিষ্ঠুর নির্দ্দয় শ্লোষোক্তি, নির্মম সমালোচনা তাদের সহ্য করতে হচ্ছে। প্রকৃত অপরাধী দিগ্-বিজয়ী সৈনিকের মত বীর বিক্রমে সমাজের বুকে অনাচারের ঢেউ তুলে মহানন্দে দিনাতিপাত করছে। পরন্তু তার টাকার মুঠো মুঠো হরিলুটে সমাজ তার জয়গান গাইছে।

এমনি বোধ হয় ঘটে। যে সাধু সজ্জন বা ধর্ম পথকে আঁকড়ে

থাকে—জীবন ব্যাপী দুঃখের দণ্ডী তাকেই কাটতে হয়। তার বিধির লিখনে। শান্তি নেই, সোয়াস্তি নেই, সুখ নেই তার জীবনে। হয়ত ভগবান এমনি কঠোর দণ্ড দিয়েই তার ভক্তদের যাচাই করে নেন।

তাই আজ এই বৃদ্ধের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে চন্দ্রিকার কিছুমাত্র বেগ পেতে হচ্ছে না। উভয়েই যে ভুক্তভোগী। অন্যের অপরাধে দণ্ড ভোগ করছে উভয়ে। নিষ্ঠুর বিধির বিধান অখণ্ডনীয়।

৩৬

পরের দিন।

ক্ষিপ্রপদে উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে মৃন্ময় ডাক দিল "নীতা" "নীতা"।

নীতা নিজের ড্রেসিং রুম হতে যথাসম্ভব "মেক্‌ আপ" সেরে বেড়িয়ে এসে বল্ল "কি ব্যাপার ?"

হাতে মস্ত একটা বিল দেখিয়ে মৃন্ময় বল্লে "আবার তুমি আমার নামে এত মোটা টাকার লোনে এত জিনিষ কিনেছো ? রোজ এত টাকা নিচ্ছ। তবু কেন "ক্রেডিটে" জিনিষ কেনো ? আর এত মোটা এমাউন্টই বা আসে কেন ?"

"আমি কারো ম্যারেড ওয়াইফ নই। সুতরাং কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই।"

"কিন্তু আমার টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আমি কোন রকমে এলাউ করবো না।"

"টাকা আমার খুসীমত না পেলে আমি চলে যাবো। এবং আমার মাধ্যমে যে কনট্রাক্ট করা হয়েছে—সে সব টাকা পুরো আমি নেবো।"

"না, সে রকম হ'তে পারে না। কারণ, বহু টাকা তুমি অপচয় করেছো। সুতরাং সেই টাকা ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তোমার এখান হতে যাওয়াও চলবে না।"

"আমাকে জোর করে ধরে রাখবার রাইট কারও নেই। আমি কোন রকম বাইণ্ডিংসের মধ্যে নেই। এবং তেমন ভাবে কিছু করতে গেলে সমূহ বিপদ আছে জানবে। কারণ আমাদেরও গ্যাংগ আছে এবং তাও কম শক্তিশালী নয়।"

"ওঃ, আমার টাকায় তবে তুমি তোমার গ্যাংগকে পোষণ করেছো এই কয়মাস।"

"কোন কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই—তা আগেই বলেছি। আমার টাকা যাকে খুসী দেবার আমার অধিকার আছে বা এই টাকায় যেখানে যাকে খুসী পোষণ করবার রাইট আমার আছে।"

"ওঃ, তাই বুঝি গ্যাংগএর সঙ্গে মিলতে যাবাব সময় আমার 'কার' এব প্রয়োজন নেই বল্লা হো৩।"

"আমাকেও তো সাবধানে থাকতে হবে। কারণ, আমাদের শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি চলেছে। আমি যেমন তোমার অপকীর্ত্তির নাড়ী নক্ষত্রর সব কিছু জানি-প্রয়োজনে তা ফাঁস করে দিয়ে তোমার বিপদ ডেকে আনতে পারি। তেমনি আমার সব কিছু যদি তোমার জানা থাকে—সে সুযোগ গ্রহণ কবতে তুমি কখনও বিলম্ব করবে না। এসব জানি বলেই আমার সম্বন্ধে আমাকে যথেষ্ট সতর্ক ভাবে চলতে হয়েছে।"

ব্যঙ্গের হাসি হেসে নীতা আরও বলেছিল—"তোমার স্ত্রী চন্দ্রিকা আমার গুণাগুণ তোমার চেয়েও বেশী জানে বলে, এখনও পথে ঘাটে দেখা হলেও—সে আমাকে এড়িয়ে যায়। কারণ আমরা একই স্কুলের ছাত্রী ছিলাম।

যে পথের কানাগলি হতে সুরু করে সমস্ত পথঘাটই আমার নখ-দর্পণে—সে পথে তোমার নূতন পদক্ষেপ। সুতরাং তুমি আমার কি করতে পারবে? আমরা হ'লাম জন্মগত ক্রিমিন্যাল। আর তুমি হোচ্ছ সবে এ্যামেচার।

আমার কাছে তুমি একেবারেই নবীশ। সুতরাং আমাকে ভয় দেখিয়ে বা ধমক দিয়ে তোমার আখেরে সুবিধা হবে না।"

বেশ কিছুদিন হতে নীতার সঙ্গে মৃন্ময়ের বনিবনা হচ্ছিল না। নীতা যেন তাকে শুষবার জন্যই এসেছে। তার গতিবিধিও কেমন সন্দেহজনক। নীতার রুচির সঙ্গে মৃন্ময়ের রুচির মিল নেই। তবু সে নীতাকে 'ফলস্ লাইফ পার্টনার' করে তার মাধ্যমে অনেক নোংরা কাজ করিয়ে 'সিয়ার' থেকে টাকা রোজগার কবতো।

নীতা যে এতটা ধূর্ত্ত ও নোংরা চরিত্রের মেয়ে তা সে জানতো না। যতই সে তা জানছে—ততই নীতার সঙ্গ যেন তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছে।

মৃন্ময় শিক্ষিত ভদ্র সন্তান। তার একটা রুচিবোধ আছে। সে নীচে নাবতে চাইলেও --হয়ত নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর নীচে সে যেতে পারবে না। কারণ, তার কৃষ্টি, সাংস্কৃতি, বংশ মর্য্যাদা তাকে বাধা দেবে। কিন্তু নীতার সে সবের কোন বাছ বিচার নেই। সে যে নর্দ্দমার জীব। তাই স্বচ্ছন্দে তাতে নাবতে তার কোন দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই। কারণ তার কৃষ্টি, বংশ মর্য্যাদা নেই।

নীতা যতই তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছিল—ততই তার মন চন্দ্রিকার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছিল। টাকা সে অনেক রোজগার করেছে। এখন যেন এই রোজগারে তার ক্লান্তি এসে গেছে। সে যেন এখন এ জীবন পরিত্যাগ করে ফিরে যেতে চায়—আগের সেই শান্তিকুঞ্জে। হয়ত চন্দ্রিকার স্নেহস্পর্শে মৃণাল অপরাধ মুক্ত হবে। কিন্তু তার আগে এসেছিল সে নীতার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। নিজের জীবনের অশুচি অংশটাকে বাদ দিয়ে বা ধুয়ে মুছে শুচিশুদ্ধ হয়ে সে আবার চন্দ্রিকার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চায়। স্মৃতির পাতা হতে গ্লানিময় পৃষ্ঠাগুলি ছিঁড়ে ফেলে মৃন্ময়ের মন ছুটে গিয়ে পিতার পদমূলে বসে বিগত কর্মের জন্য তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করতে চায়।

নীতার বিদ্রূপ, টিট্‌কারিতে মৃন্ময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কি এক পশু প্রবৃত্তি তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌লো। সে ছুটে গিয়ে নীতার গলা টিপে ধরে। এমন অতর্কিত আক্রমণের জন্য নীতা প্রস্তুত ছিল না। তাই সে সরে যাবার সময় পায়নি।

নিমেষের মধ্যে কি যে ঘটে গেল মৃন্ময়ও যেন বুঝে উঠতে পারলো না। যখন তার সম্বিত ফিরে এসেছে—ততক্ষণে নীতার নশ্বর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। প্রাণহীন নীতার দেহের উপর চোখ পড়তেই

মৃন্ময় যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ল। উস্কখুস্ক চুল, চোখে মুখে আতঙ্কের চিহ্ন, চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। সামনে বিরাট লাইফ সাইজ আয়না—তার মধ্যে অপাঙ্গে দৃষ্টি পড়তেই মৃন্ময় যেন আরও ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়লো।

নিজেকে এই দোষমুক্ত করতেই হবে। যে করেই হোক্ লাশ সরিয়ে ফেল্‌তেই হবে। যত টাকা দরকার সে ব্যয় করবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল লোক জানাজানিতে টাকা ঢেলে সে কুলিয়ে উঠ্‌তে পারবে না। তার চেয়ে বরং নিজেই এই লাশ কোন জঙ্গলে পাচার করে আসবে। তাই নিজেই সবার অলক্ষ্যে নীতার লাশ নিয়ে—নিজের কারে ছুটে চলেছে—কোন গহন জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। মন তার উদ্‌ভ্রান্ত। নিজের অধঃপতনের পরিণাম কল্পনা করে আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা জাগ্‌ছে। আবার মৃত্যুতে ভয়ও হচ্ছে। চারিদিকে সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার নেবে এসেছে।

৩৭

সমরবাবুর অনিচ্ছার দরুণ সমারোহ করে শতবার্ষিকী পালন করা হয়ে উঠেনি। তবে এই দিনে প্রতি বছর চন্দ্র ও চণ্ডী এসে তাঁকে প্রণাম করে যায় ফুল দিয়ে এবং একসঙ্গে সবাই খাওয়া দাওয়া করে থাকে।

এ বছর তাই চন্দ্রিকা চণ্ডীকে মনে করিয়ে দিয়েছে সেই দিনটি। প্রতি বছর পারিবারিক উৎসব হিসাবে যেমন এই দিনটি সুতারা বরাবর উদ্‌যাপন করে এসেছেন, চন্দ্রিকাও তা পালন করে আস্‌ছে এবং এ যাবৎ তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

আজ সেই শুভদিন। আজ সারাদিন চন্দ্রিকা ও হিমাংশু কাজে বের হয়নি। প্রতি বছরে ভোরে চন্দ্রিকা নূতন ধুতি, চাদর, পাঞ্জাবী ও ফুলের মালা দিয়ে সমরবাবুকে প্রণাম করে,—যেদিন হতে সে এ বাড়ীতে বধূ হয়ে ঢুকেছে।

হিমাংশুও ফুলের স্তবক, ধুতি ও তাঁর রুচি মত তাঁর প্রিয় কোন লেখকের বই দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে।

স্নানের পর চন্দ্রিকা তাঁকে দই ও চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেয়। সেদিন সমরবাবু নূতন ধুতি জামা পরে সবার সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসেন। এই চিরদিনের ব্যতিক্রম কখনই চন্দ্রিকা ঘটতে দেয়নি। সেদিন কোন ঠাকুর চাকর নয়—নিজের হাতে সে সমরবাবুর প্রিয় খাদ্য রান্না করে খাওয়ায়—যেমন করতেন সুতারা।

সমরবাবুকে খাইয়ে নিজেরা খাওয়া দাওয়া করে, সমরবাবু ঘুমাচ্ছেন দেখে— চন্দ্রিকা "নিউ মার্কেট" হতে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনবার জন্য বের হয়েছে। রাতে চণ্ডীরা আসবে খেতে। এজন্য তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবার জন্য তার মন একটু অস্থির ছিল।

কিন্তু ভিড়ের জন্য ট্রামে, বাসে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। বাড়ীর 'কার'ও খারাপ হয়ে গ্যারেজে মেরামত হতে গেছে। ট্যাক্সির জন্যই চন্দ্রিকা তার চঞ্চল দৃষ্টি চারিদিকে ফেলছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তবু ট্যাক্সি একটি পাওয়া যাচ্ছে না।

এমনি সময় একটা খালি ট্যাক্সি আসতে দেখে চন্দ্রিকা দ্রুত পদে সেই ট্যাক্সি ধরতে যেতেই—উল্টা দিক দিয়ে একটা প্রাইভেট কার "রং সাইড" দিয়ে দ্রুত এসে চন্দ্রিকাকে চাপা দিয়ে চলে গেল। চন্দ্রিকা ছিট্‌কে পড়ল। তার হাতের ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিষপত্র ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। একটা হৈ চৈ ও জনতার ভিড় জমে গেল।

কিছু লোক চলন্ত প্রাইভেট 'কার'কে অনুসরণ করলো। কিন্তু বিদ্যুতের মত কারটা নানা অলি গলি দিয়ে আত্মগোপন করলো।

মুখে মুখে শোনা গেল "কার'এর নম্বর তো ব্যারিষ্টার মৃন্ময়ের কারের। কিন্তু ইনি কে ? একেবারে যে শেষ হয়ে গেছেন !"

এই সেই দিন। যেদিন মৃন্ময় নাতার লাশ সরিয়ে ফেলবার জন্য দিক বিদিক জ্ঞান হারিয়ে লাশ নিয়ে ছুটে চলেছে। সে জানে না তারই 'কার' এসে তারই প্রিয়জনকে শেষ করে দিয়ে গেল—একটি শুভদিনে।

চন্দ্রিকার রক্তাপ্লুত প্রাণহীন দেহ সনাক্ত করলো হিমাংশুর বন্ধু কিরীটি। কাল বিলম্ব না করে সে চন্দ্রিকার দেহটি সমরবাবুর বাসায় নিয়ে এলো। চন্দ্র, চণ্ডী, হিমাংশু ও সমরবাবু সকলেই সমরবাবুর ঘরের সামনের খোলা ছাদে চন্দ্রিকার প্রতীক্ষায় বসে। এমন সময় নীচে হৈ চৈ, গোলমালে হিমাংশু ও চন্দ্র ঝুঁকে পড়ে দেখলো দারোয়ান ও কয়েকজন মিলে চন্দ্রিকার রক্তাপ্লুত দেহ ধরাধরি করে নিয়ে ঢুক্‌ছে।

হিমাংশুর অজ্ঞাতে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো—"বৌদি আহত !" বলেই সে কারও প্রতি দৃকপাত না করে ছুটে নেবে এল। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র চালিতের মত চন্দ্র ও চণ্ডীও ছুটে এল নীচে।

সমরবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে চুপ করে ব'সে ছিলেন অল্পক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে তাঁর জরাজীর্ণ দেহটাকে নাবিয়ে নিয়ে এলেন নীচে। চন্দ্রিকার বিপদের খবরে তাঁর মধ্যে যেন বার্দ্ধ্যকের জড়তা দূর হয়ে গেছে। সবার অলক্ষ্যে তিনি এসে সবার পিছনে দাঁড়িয়ে পোর্টিকোতে চন্দ্রিকার প্রাণহীন নিশ্চল দেহটির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

কিরীটি ও আগন্তুকবৃন্দদের মুখে মৃন্ময়ের কারের চাপে চন্দ্রিকার মৃত্যু সংবাদ শুনে চণ্ডী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলে উঠলো "দিদি, এ তুই কি কর্‌লি? প্রাণ দিয়ে তুই তোর মান রক্ষা করলি! তবু অমন পশুর কাছে আত্মসমর্পণ কর্‌লি না।"

পিছন হতে বাষ্পরুদ্ধ ভারীকণ্ঠে শোনা গেল "কেঁদো না মা। ও যে এ যুগের সাধ্বী মেয়ে। তাই প্রাণ দিয়েও নিজের মান রক্ষা করে গেছে। ও যে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে—প্রাণ থাকতে সে কখনও অপমান মাথা পেতে নেবে না। সেই প্রতিশ্রুতিই সে রক্ষা করে গেছে।

চন্দ্রিকা আমার পুত্রবধূ নয়—আমার সতীসাধ্বী মেয়ে ছিল। তাই জীবন দিয়ে সে আমার আদর্শের মান রেখে গেল।"